শিক্ষাগুরু আশুতোষ

বঙ্গেষূচ্চবিদগ্ধমুখ্যকুলজো বাগ্দেবতাত্মা ক্ষিতৌ,
বিক্রান্ত্যা নরসিংহ এব নয়বিদ্ধর্মাধিকারাগ্রণীঃ ॥
যঃ স্বাতন্ত্র্যশুভব্রতী ভরতভূস্বাধীনতাপাদনে,
স্বং দেশং সমজীবয়ৎ স জয়তাৎ স্যারাশুতোষঃ কৃতী ॥

শ্রীহরিপদকাব্যস্মৃতিমীমাংসাতীর্থশাস্ত্রিণা বিরচিতম্

'জীবনী-জিজ্ঞাসা' পর্যায়ের গ্রন্থসমূহ

মণি বাগচি প্রণীত

রামমোহন : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ : মাইকেল : কেশবচন্দ্র
রমেশচন্দ্র : রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র
সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ : শিক্ষাগুরু আশুতোষ

॥ এই পর্যায়ের দশম ও একাদশ গ্রন্থ ॥

নমিতা চক্রবর্তী ॥ বিদ্যাসাগর

ও

মণি বাগচি ॥ বঙ্কিমচন্দ্র

শিক্ষাগুরু আশুতোষ

Freedom First.
Freedom second.
Freedom always.

মণি বাগচি

জিজ্ঞাসা ॥ কলিকাতা

Sikshaguru Asutosh, A Bengali biography of Sir Asutosh Mookerjee *By* : Moni Bagchee

প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৫৪

প্রচ্ছদ : সুবীর সেন
আখ্যাপত্র : বারীন্দ্র সরকার

প্রকাশক : শ্রী শ্রীশকুমার কুণ্ড
জিজ্ঞাসা
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। কলিকাতা ২৯
৩৩ কলেজ রো। কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর : শ্রীইন্দ্রজিৎ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট। কলিকাতা ৪

বাংলার গৌরব

স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পূণ্য স্মৃতিতে

স্বদেশ ও সমাজের কল্যাণসাধনব্রতী স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রগাঢ় জীবনের তাৎপর্য, তাঁর বহুমুখী কর্ম ও চিন্তার ধারা অনুধাবন করে আমি বুঝেছি যে, এই বরেণ্য বাঙালী সন্তান তাঁর কর্মের দ্বারা, চরিত্রের দ্বারা দেশের ও জাতির ইতিহাসকে যথেষ্ট উপাদান দিয়ে গেছেন। কালের বিচারে সেইসব উপাদানের বহুলাংশই স্থায়িত্ব অর্জন করেছে। এই গ্রন্থে তারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছি।

গ্রন্থের প্রারম্ভে সন্নিবেশিত অপূর্ব শ্লোকটি রচনা করে দিয়েছেন সংস্কৃত কলেজের খ্যাতনামা প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীহরিপদ কাব্য-স্মৃতি-মীমাংসা-তীর্থশাস্ত্রী মহাশয়।

৯০ বাগুইআটি রোড
দমদম, কলিকাতা ২৮

মণি বাগচি

ভূমিকা

স্যর আশুতোষের জন্মশতবার্ষিকী আগত প্রায়। শুধু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, ভারতীয় শিক্ষাজগৎ তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ। কারণ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বীজমন্ত্রকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন, Advancement of Learning—জ্ঞানের গণ্ডীর যাহাতে প্রসার বড়, আরও বড হয়, তাহার জন্য উৎকৃষ্ট পরিকল্পনা ও কার্যে তাহা রূপান্তরিত করিবার সাধনা আমাদের ও ভবিষ্যৎবংশীয়দের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন। বাংলা ভাষার জন্য তাঁহার দরদ, ভারতীয় ভাষার প্রতি তাঁহার অনুরাগ, প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলনের জন্য তাঁহার বিপুল আয়োজন, দর্শনে ইতিহাসে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পঠন-পাঠন গবেষণার পথ উন্মুক্ত করিয়া উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র সংগঠন, ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার মাধ্যমে ও পরস্পরের সহযোগিতায় এক জাতীয় সাহিত্যের নির্মাণ ও পরিপুষ্টির ব্যবস্থা তিনিই করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালীকে তথা ভারতবাসীকে তাহা জানিতে হইবে। যে সকল প্রতিকূলতার মধ্যে তিনি কাজ করিয়া গিয়াছেন জীবনীকারকে তো তাহার বিবরণী দিতেই হইবে। আমরা শুধু জানিতাম, তাঁহার গুণগ্রাহী লোকেরও অভাব হয় নাই, দেশে-বিদেশে সরকারি-বেসরকারি মহলে তিনি শ্রদ্ধা সম্মান সহযোগিতাও পাইয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার স্নাতকোত্তর শিক্ষাবিভাগ দেশ-বিদেশ হইতে সুনির্বাচিত উপযুক্ত কর্মীদের সমবেত ও সংহত সাধনায় সমৃদ্ধ হইয়াছিল। আজও সমগ্র ভারতের চিন্তানায়ক ও কর্মনায়কদের মধ্যে সে সমৃদ্ধির চিহ্ন রহিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বড় করিব, তাহা দেখিয়া অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ও পথ খুঁজিয়া পাইবে, ইহাই ছিল তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। নিত্য নূতন বিষয় অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিয়া সেদিন আশুতোষ আমাদের সকলের মনোজগতের সম্মুখে যে অনন্ত জ্ঞানের আভাষটুকু দিলেন, তাহা বর্তমানে অবর্ণনীয়।

শ্রীমণি বাগচি বাংলা সাহিত্যের একটা বিশেষ দিক বাছিয়া লইয়াছেন ;—জীবনীসাহিত্য। বাঙ্গালী জীবনের উন্নতিসাধনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ মানবদের, বিশেষ করিয়া যাঁহারা বাংলার মাটিতে জন্মিয়া অথবা বাংলার কর্মক্ষেত্রে আসিয়া লোকোত্তর প্রতিভা বা কর্মশক্তি দেখাইয়াছেন তাঁহাদের জীবনী রচনার দ্বারা ভবিষ্যৎ যুগের বাঙ্গালীকে কর্মে জ্ঞানে তপস্যায় প্রবুদ্ধ করিতে পারা যাইবে, এই বিশ্বাসে মণিবাবু পর পর কয়েকটি জীবনী লিখিয়া আমাদের যুবশক্তিকে যেন আহ্বান করিয়া বলিতেছেন, "দেখ, আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় কর্মীদের ও জ্ঞানীদের কথা একবার মনে করিয়া দেখ, ইঁহাদের পথে বিচরণ করিবার শক্তি ও সাহস পাইবে। জাতিকে বলিষ্ঠ করিয়া তোল।" তাঁহার চেষ্টা সফল হউক, সার্থক হউক।

চল্লিশ বৎসর হইল স্যর আশুতোষ তাঁহার প্রিয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়া দিব্যধামে গিয়াছেন। দুঃখের সহিত বলিতেছি, এ পর্যন্ত তাঁহার জীবনী রচিত হয় নাই। আর শুধু তাঁহারই বা বলি কেন, আমাদের সাহিত্যে এইদিকে কাজ করিবার প্রচুর অবকাশ আছে। লোকেও জীবনী পড়িতে আগ্রহশীল। বহুলোকের চেষ্টা ভিন্ন এ কাজ হইতে পারিবে না। একদিক দিয়া বলিতে গেলে, এখনও জীবনীকারের সম্মুখে যে সকল উপাদান আছে, তাহা চিরকাল এতটা সুলভও থাকিবে না ; প্রত্যক্ষ পরিচিতের সংখ্যা কমিয়া যাইবে এবং যে সকল পত্র-পত্রিকা উনবিংশ শতাব্দীর ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এখনও জীবনীর উপাদান ধরিয়া রাখিয়াছে, বর্তমানের জরুরি তাগিদের চাপে তাহারাও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিবে, আমরা দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতে বাস করিতেছি, এ কথা আমাদের নিত্য নূতন করিয়া জানিতে হইতেছে। সুতরাং মণিবাবুর সময়োচিত পুস্তক 'শিক্ষাগুরু আশুতোষ' এখনকার পাঠকেরা যত্ন করিয়া পড়িবেন, এরূপ আশা করা যায়। এই গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায় কৃতী লেখকের সযত্ন তথ্যানুসন্ধান, নিরাসক্ত বিচার-বিশ্লেষণ আর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় বিদ্যমান।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন
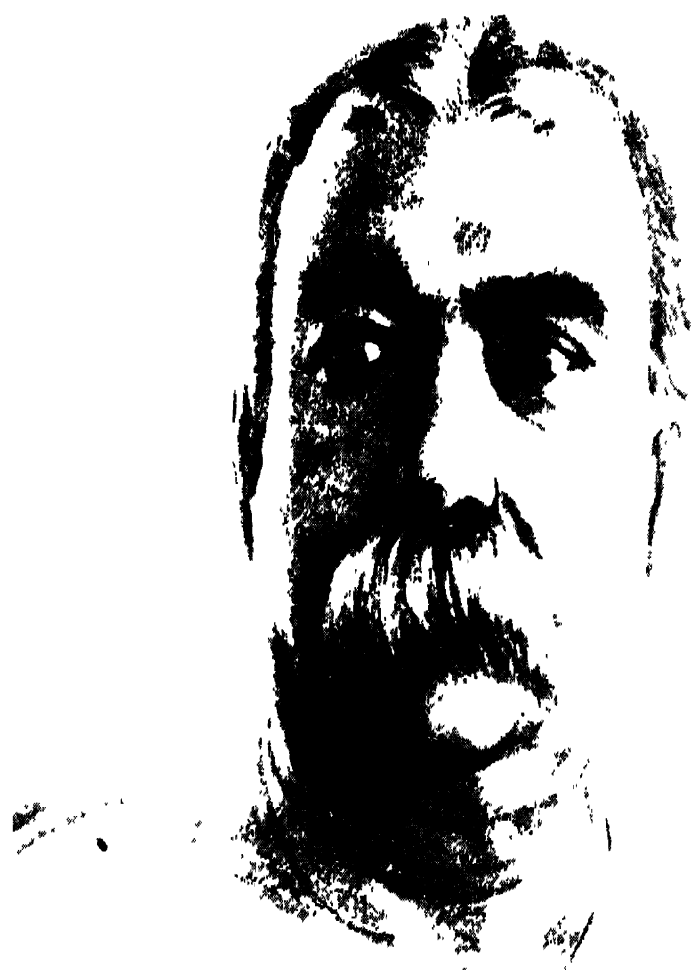
॥ এক ॥

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন : মানুষ যায়, নাম থাকে। কথাটি সত্য। কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে, পৃথিবীতে সেই মানুষেরই নাম থাকে যার মধ্যে আমরা পাই চরিত্রের উজ্জ্বল প্রকাশ। কারণ চরিত্রের ঐশ্বর্যই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ এ সম্পদ অনেক কষ্টে অর্জন করতে হয়, এবং রক্ষা করতে হয়। চরিত্রের প্রভাব মৃত্যু হরণ করতে পারে না, বরং মৃত্যুতে তা আরো গভীরভাবে বিস্তৃত হয়।

লব্ধকীর্তি স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চরিতালোচনা করতে বসে এই কথাটাই সকলের আগে মনে পড়ছে। নানা দিক দিয়ে নানা ভাবে মানুষ মানুষকে দেখে, মানুষ মানুষকে বিচার করে। অনুরাগীর বিচার এক রকম, আবার সত্যসন্ধ সমালোচকের বিচার আর-এক রকম। কিন্তু আশুতোষের চরিত্র এমনই বিশাল যে, প্রচলিত কোনো মাপকাঠিতে তা সঠিক ধরা পড়ে না। বস্তুত মুখ্যবংশোদ্ভব, বৃহস্পতিতুল্য বিদ্বান এবং সকল দিক দিয়ে আদিত্য-প্রভ আশুতোষ-চরিত্রের প্রধান বিশেষত্বই হোল 'vastness' বা বিশালতা। এই জলধিপ্রতিম বিশালতা, তাঁর আহারে বিহারে, আচারে ব্যবহারে, দৈনন্দিন নিত্য কার্যে ফুটে উঠতো। এ বিশালতা মানুষের ভাগ্যে সহজে ঘটে না। মিলটন বা ব্লেকের নভোস্পর্শী কল্পনায় যেসব নিবিড় ও অতীন্দ্রিয় চিত্র ফুটে উঠতো, এ ঠিক সেই রকম—চিন্তা করা যায়, অথচ ঠিক ধারণা করা যায় না।

কাজেই আশুতোষের চরিত্র বিচার করা বড়ো সহজ কাজ নয়। মহাকবি গ্যেটের একটি কথা মনে পড়ে : "Truth is a torch, but it is a huge one. This is why all of us try to steal past it with blinking eyes, and afraid lest we may be burnt." আশুতোষের প্রতি এই উক্তিটি সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। তিনি যে সত্যের আলোকদণ্ডে সমগ্র দেশ-বাসীকে দীর্ঘ ত্রিশবছরকাল চালিত করেছিলেন, সেই দণ্ড হাতে দিয়েই বুঝি

বিধাতা তাঁকে এই বাংলাদেশে পাঠিয়েছিলেন। আমরা জানি, তাঁর জীবিত-কালে দেশের লোক মুখ তুলে সাহস করে এঁর দিকে চাইতে পারেনি—এঁর অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্লেখা আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে রেখেছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে দীর্ঘ চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হোল, আজ বোধ হয় আমরা আশুতোষের চরিতালেখ্য আঁকতে পারি।

আশুতোষের মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথ এই পুরুষসিংহের প্রতি তাঁর যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন তাঁর একস্থানে তিনি বলেছেন: "তিনি যে সকল স্বপ্ন দেখিতেন, তাহা সংস্কারক্ষেত্রে যুঝিয়া তিনি সফল করিতে পারিতেন। তাঁহার স্বক্ষমতার উপর একটা প্রত্যয় ছিল যে তিনি বিজয়ী হইবেন—ইহা জানিয়াই তিনি কর্মের পরিকল্পনা করিতেন, তাঁহার সংকল্পগুলি কৃতকার্যতার পথ-স্বরূপ ছিল।"* রবীন্দ্রনাথের এই রচনাটি যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, আশুতোষ-প্রতিভার বৈশিষ্ট্যকে কত স্বল্প কথায় কবি কত সুন্দরভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আশুতোষ একদিকে ছিলেন প্রচণ্ড কর্মবীর, অন্যদিকে ভাব-প্রবণ ও স্বাপ্নিক। কর্ম আর কল্পনা—এই দুই মিলিয়েই তো আশুতোষ। এই দুটি বিপরীতধর্মী গুণের সমাবেশ আশ্চর্যভাবে সার্থক হয়েছিল তাঁর জীবনে। একদিকে তিনি যেমন ছিলেন অফুরন্ত কর্ম-শক্তির আধার, অন্যদিকে তিনি ছিলেন একজন সুমহান্ স্বপ্নদ্রষ্টা। তাঁরই নেতৃত্বে বজ্রদগ্ধ এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একদা কী উজ্জ্বল শ্রী ধারণ করেছিল, শুধু সেই ইতিহাস একবার স্মরণ করলেই আশুতোষের যুগপৎ কর্মশক্তি ও কল্পনাশক্তির পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হোতে হয়।

আশুতোষকে স্মরণ করবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। আজ এই কথা বলবার দিন এসেছে যে, বাংলামায়ের এই স্বর্ণজন্মা সন্তান আধুনিক যুগের একজন পুরুষশ্রেষ্ঠ ছিলেন। বিদ্যায়, বিদ্যোৎসাহে, কর্মশক্তিতে, গুণগ্রাহিতায়, আত্মসম্মানজ্ঞানে, দেশাত্মবোধে, স্বদেশপ্রীতিতে—সব বিষয়েই তিনি নিঃসন্দেহে একজন যুগন্ধর পুরুষ ছিলেন। বিদ্যাসাগর ও স্যর গুরুদাসের জন্মভূমিতে আশুতোষের ন্যায় ব্যক্তির আবির্ভাব সেদিন অপ্রত্যাশিত ছিল না। গীতায় আমরা পড়েছি, অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন: "ঐশ্বর্যসমন্বিত, শ্রী-যুক্ত ও প্রভাব-

* বিশ্বভারতী কোয়াটার্লি। জুলাই ১৯২৪

বলাদি দ্বারা অতিশয়িত যে কোনো বস্তু তার সবই আমার তেজের অংশসম্ভূত জানবে।” বিরাট থেকেই বিরাটের উদ্ভব। গীতার এই উক্তিটি, সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস যাঁরা আলোচনা করবেন, তাঁরা যেন স্মরণে রাখেন। বাংলার সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস যদি সেই অদৃশ্য বিরাট পুরুষেরই প্রতিচ্ছায়া না হবে, তবে এর নানা পর্বে এতগুলি বিরাট পুরুষের আবির্ভাব কেমন করে সম্ভব হয়েছিল? এমন আলোর মিছিল কোথা থেকে এলো? এ বাসন্তী ফসল কি এমনিতে ফলেছিল? বিগত শতাব্দীর খ্যাতনামা প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্র ও জীবন আলোচনা করলে গীতার এই উক্তিটির যাথার্থ্য সম্বন্ধে আর কোনো সংশয় থাকে না। আমাদের বর্তমান আলোচনার নায়ক, আশুতোষের কথাই ধরা যাক। এমন সর্বগুণসম্পন্নতা, এমন ঐশ্বর্য, তেজ ও জ্যোতির একত্র সমাবেশ ও প্রোজ্জ্বল প্রকাশ কি ভগবানের বিশেষ কৃপা ভিন্ন সম্ভবপর? এমন তেজোদৃপ্ত বিক্রান্ত মূর্তি, এমন সর্বতোমুখী প্রতিভার বিকাশ, এমন সর্বজনীন সমদর্শিতা, যা ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে আমরা খুব বেশি প্রত্যক্ষ করিনি।

আশুতোষ ধনীর সন্তান ছিলেন, কিন্তু তাঁর পিতা সেরূপ ছিলেন না। কাজেই আশুতোষের জীবনানুশীলন করতে হোলে যে বংশে তাঁর জন্ম, সেই বংশের—জীরেট-বলাগড়ের মুখোপাধ্যায় বংশের ইতিবৃত্তটা একটু জানতে হয়।

“খন্যান স্টেশন হইতে অনুমান ৩।৪ ক্রোশ দূরবর্তী দিগসুই নামে একটি পল্লী আছে। সেইখানে এক ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করিতেন, তাঁহাদের মুখোপাধ্যায় উপাধি। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সংস্কৃতে পণ্ডিত বলিয়া ন্যায়ালঙ্কার, বিদ্যালঙ্কার, ন্যায়রত্ন প্রভৃতি সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। এই পরিবারে বলরাম ন্যায়ালঙ্কার (শ্রীহর্ষ হইতে ২৮ পর্যায়) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার তিন পুত্র—হরেকৃষ্ণ, রামজয় ও রামচন্দ্র। ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর রামজয়ের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই পুত্রের নাম বিশ্বনাথ। পুত্রের জন্মের অল্পদিন পরেই রামজয় একমাত্র শিশুপুত্র ও পত্নী রাখিয়া অকালে কাল-কবলে পতিত হন। রামজয়ের পিতা-মাতা তৎকালে বিদ্যমান ছিলেন,

তাঁহার সহোদর ভ্রাতারাও সেখানে ছিলেন না। রামজয়ের পত্নী একে শোকাভিভূতা, তার উপর জ্ঞাতি ভাশুর ও যাতৃগণের (জা) কুব্যবহারে মর্মাহতা হইয়া পড়িলেন। কিছুদিন এইরূপে গেলে অতিষ্ঠ হইয়া তিনি তাঁহার পিত্রালয় জীরাট গ্রামে শিশুটিকে লইয়া চলিয়া গেলেন। তদবধি তিনি সেইখানেই ছিলেন, দিগসুয়ে আর আসেন নাই। জ্ঞাতিরা তাঁহাকে আনিতে চেষ্টা করেন নাই; কোনো খোঁজও লন নাই। রামজয়ের পুত্র এইরূপে পিতৃ-সম্পত্তি হইতে একেবারে বঞ্চিত ও পিতৃ-পিতামহের দেশ হইতে নির্বাসিতপ্রায় হইয়া মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার এক মাতুল ও মাতামহী ছিলেন; তাঁহারা দরিদ্র, সুতরাং বিশ্বনাথের বাল্যজীবন সুখে অতিবাহিত হয় নাই তবে এখানে তাঁর স্নেহ যত্ন আদরের অভাব ছিল না। এইরূপে বিশ্বনাথ মা-দিদিমার স্নেহের কোলে মানুষ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মামা তাঁহাকে পাঠশালায় পড়িতে দিয়াছিলেন, তিনিও বাংলায় অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতি যাহা তখন পড়া হইত তাহা শিখিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কৃত বা তৎকালে প্রচলিত আরবি উর্দু কিছুই শিখিবার সুযোগ হয় নাই। তিনি স্বভাবতঃ বুদ্ধিমান সরল উদারপ্রকৃতি ছিলেন। অল্পবয়সেই ভগবৎ-কৃপায় উপার্জনক্ষম হইয়া মাতার দুঃখ-মোচন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন। (স্যর আশুতোষের মাতৃভক্তিও পুরুষানুক্রমে অর্জিত একটি গুণ)। মা যাহাতে সুখী ও তৃপ্ত হন, বিশ্বনাথ তাহাই করিতেন।

"লবণের কুঠির সাহেবদিগকে প্রসন্ন করিয়া তিনি নিমকমহালের দারোগা হইয়াছিলেন। জীরাট গঙ্গাতীরস্থ অতি সুন্দর গণ্ডগ্রাম; স্বভাব শোভার নিকেতন। তখন এখানে ম্যালেরিয়া ছিল না; গ্রামবাসীরা সুস্থ ছিল এবং এখানে বহু ভদ্রলোকের বাস ছিল। এখানে গোপীনাথ বিগ্রহের সেবায়েৎ ছিলেন গোঁসাইরা। তাঁহারা ধর্মপরায়ণ ছিলেন। পিতৃহীন বিশ্বনাথ গোঁসাই-কর্তার নিকট হইতে কিছু জমি পাইয়া জীরাটেই নিজ বাসভবন প্রস্তুত করেন। এই সময়েই মাতা সরস্বতী দেবী পুত্রের বিবাহের জন্য ব্যগ্র হইয়া পাত্রী অনুসন্ধান করিতেছিলেন। কিছুকালের মধ্যে মনোমত সুন্দরী সুলক্ষণা কন্যা পাইয়া পুত্রের বিবাহ দিয়া অপার আনন্দলাভ করিলেন। পাত্রী বর্ধমান রাজসভার সভাপণ্ডিত সার্বভৌম চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্র রামমোহন

বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা। বিশ্বনাথের পত্নী ব্রহ্মময়ী দেবী অতি শান্তস্বভাবা গুণবতী রমণী ছিলেন। বিশ্বনাথের মাতা সৎকর্মে অনুরাগিণী ও দানশীলা ছিলেন।

"বিশ্বনাথ ও ব্রহ্মময়ীর চার পুত্র ও এক কন্যা। দুর্গাপ্রসাদ, হরিপ্রসাদ, গঙ্গাপ্রসাদ ও রাধিকাপ্রসাদ। গঙ্গাপ্রসাদের জন্ম ১৮৩৯, ৬ই মার্চ। গঙ্গাপ্রসাদ যখন শিশু তখনই বিশ্বনাথের নিমকমহালের চাকরী গেল। চারিটি শিশুসন্তান কি উপায়ে প্রতিপালন করিবেন, এই চিন্তায় তিনি অস্থির হইলেন। বহু চেষ্টা করিয়াও চাকরী আর হইল না। অনুপায় ব্রাহ্মণ-দম্পতি সন্তান চারিটি লইয়া অকূল পাথারে পড়িলেন। এইসময়ে জ্যেষ্ঠপুত্রের উপনয়নের কাল উপস্থিত হইল। ছেলের বয়স এগারো, ইহার চেয়ে বেশি বয়সে ব্রাহ্মণের ছেলের পৈতা দিবার নিয়ম নাই। পুত্রের শৈশবকালে মানত ছিল কালীঘাটে পৈতা দেওয়া হইবে। বিশ্বনাথ উপনয়নের শুভদিন দেখিয়া দুই-চারিটি প্রতিবাসীসহ পুত্রকে লইয়া নৌকাযোগে কলিকাতা আসিলেন। বিনাড়ম্বরে কালীঘাটে দুর্গাপ্রসাদের পৈতা হইয়া গেল। উপনয়নের ব্যয় এক প্রতিবাসী পুণ্য লাভার্থে বহন করিয়াছিলেন। তখন এ রকম প্রথা ছিল। পাঠশালায় পাঠ শেষ করিয়া দুর্গাপ্রসাদ তখন পার্শ্ববর্তী বলাগড় গ্রামে মিশনারি সাহেবদের স্থাপিত ইংরাজি স্কুলে পড়িতেন। পুত্রের পৈতা হইবার দুই-তিন মাস পরে ব্রহ্মময়ীদেবী গ্রামস্থ কয়েকজন পুরীযাত্রী মহিলার সঙ্গে পুরী যাত্রা করেন এবং সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

"বিশ্বনাথ জ্যেষ্ঠপুত্রকে পড়ার ও থাকার সুবিধা হইবে মনে করিয়া কাল্‌নায় তাঁহার মাতুল ভ্রাতাদের বাড়িতে রাখিয়া আসিলেন। মাতৃবিয়োগে দুর্গাপ্রসাদ অতিশয় কাতর হইলেন। বিশ্বনাথ সহধর্মিণীর শোকে মর্মাহত হইলেও ধৈর্য অবলম্বন করিয়া পুত্রকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। শ্রাদ্ধে কিছুই করিবার সামর্থ্য তখন ছিল না। অতএব কাল্‌নার গঙ্গাতীরে তিল-কাঞ্চন করিয়া দুর্গাপ্রসাদ মাতৃশ্রাদ্ধ সমাধা করিলেন। বিশ্বনাথ তখন তাঁহার তিনটি বালক-পুত্রের জন্য বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। দারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে যতটুকু যত্ন হইতে পারে, বাড়ির পুরাতন পরিচারিকা প্রভুভক্তিপরায়ণা স্নেহশীলা জাহ্নবী বালকদিগকে তাহা করিতেছে দেখিয়া তৃপ্ত হইলেন। জাহ্নবী বহুদিন

হইতে বেতন পাওয়া দূরে থাক প্রত্যহ পর্যাপ্ত আহারও পাইত না। তথাপি মুখোপাধ্যায়-গৃহ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার কথা তাহার মনেও আসিত না, কারণ ব্রহ্মময়ীর নিকট সে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল যে, তাঁহার অবর্তমানে সে তাঁহার নাবালক পুত্র-কন্যাদিগের দেখাশুনা করিবে।

"দুর্গাপ্রসাদ কাল্‌নাতে থাকিয়াই পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন; স্কুলের শিক্ষক ও সহপাঠীগণ সকলেই তাহার স্বভাবগুণে তাহাকে ভালোবাসিতেন। বাড়িতেও সকলে সুখ্যাতি করিত। কিন্তু যত্ন কাহারো নিকট তেমন পাইতেন না। কাল্‌নার পাঠ শেষ হইলে দুর্গাপ্রসাদ কলিকাতায় আসিলেন। প্রতিবাসী গোলকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া করিতে থাকেন। এই সময়ে বিশ্বনাথের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে প্রতিবাসী রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে তিনি বলিয়া যান, "রামদাদা, আমি তো চল্‌লাম, অনাথ বালকেরা রইলো, দেখবেন।" দুর্গাপ্রসাদের বয়স তখন ১৫ বৎসর। মৃত্যুপথযাত্রী পিতাকে সান্ত্বনা দিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'বাবা, আপনি কিছু ভেবে মনে কষ্ট পাবেন না। আপনার যে ঋণ আছে তা এখন থেকে আমার হোল, আপনি অঋণী হয়ে যাচ্ছেন। আর ভাইদের জন্যও কোনো চিন্তা করবেন না— আমি তাদের মানুষ করব।" এই বলিয়া তিনি পিতৃপদধূলি মাথায় তুলিয়া লইলেন। পুত্রপ্রাণ বিশ্বনাথ পুত্রের কোলে মাথা রাখিয়া, উপবীত জড়িতহস্ত বক্ষঃস্থলে রাখিয়া ইষ্টদেবতাকে চিন্তা করিতে করিতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ইহা ১৮৪৯, ১৫ই অক্টোবর তারিখের ঘটনা।

"পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপন হইবার পর দুর্গাপ্রসাদ সংবাদ পাইলেন তিনি আট টাকা স্কলারশিপ পাইয়াছেন। এই আট টাকা পাওয়া তখন ভগবানের দান ও পিতৃদেবের আশীর্বাদের ফল বলিয়া মনে হইল। তাহার পর স্নেহশীলা ঝি, বৃদ্ধা জাহ্নবীর হাতে ভাইদের ভার দিয়া ও তাহাদের সময়োচিত আশ্বাস ও উপদেশ দিয়া দুর্গাপ্রসাদ কলিকাতায় গোলক গঙ্গোপাধ্যায়ের বাসায় ফিরিয়া আসিলেন এবং মনোনিবেশ সহকারে পাঠাভ্যাসে রত হইলেন। দুইটি টাকা নিজের হাতে রাখিয়া তিনি ছয়টি টাকা নিয়মিতরূপে বাড়ীতে পাঠাইতেন। ইহার পর বহু কষ্টে বহু অসুবিধা ভোগ করিয়া আরো তিন বৎসর পড়িলেন। মনোযোগী সচ্চরিত্র ছাত্র বলিয়া স্কুলের শিক্ষকগণ সকলেই দুর্গাপ্রসাদকে যথেষ্ট

স্নেহ ও অনুগ্রহ করিতেন। প্রধান শিক্ষক ওগেল্‌বি সাহেবও তাঁহাকে বড়োই ভালোবাসিতেন। কিন্তু সংসারের দায়, কনিষ্ঠদের দায় তখন তাঁহার উপর। তাই ইচ্ছা থাকিলেও আর বেশি পড়িতে পারিলেন না। প্রধান শিক্ষক স্বয়ং দুর্গাপ্রসাদের ভার লইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কনিষ্ঠদের স্বার্থ তখন জ্যেষ্ঠের নিকট বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। ওগেল্‌বি সাহেব তখন দরিদ্র বাঙালী ব্রাহ্মণ যুবকের মহাপ্রাণ দেখিতে পাইলেন ও অনেক প্রশংসা করিয়া বিদায় দিলেন।

"স্কুল ছাড়িয়া আন্দুলে একটি স্কুল-মাস্টারী যোগাড় করিলেন এবং ভাই তিনজনকে সঙ্গে লইয়া আন্দুলে গেলেন। এখন হইতে ভাইদের শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার জীবনের ব্রত হইল। স্কুলে তিনজনকেই ভর্তি করিয়া দিলেন, প্রাতে ও সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত পড়াইতেন। তিনিও যেমন ভাইদের শিক্ষায় প্রাণপণ করিয়াছিলেন, ভাইরাও তেমনি অগ্রজের আজ্ঞাবহ হইয়া মনোযোগ ও পরিশ্রম সহকারে পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পরস্পর প্রত্যেক কার্যে পরস্পরকে সাহায্য করিতেন। স্বহস্তে রন্ধন করিয়া চারি ভাই একসঙ্গে পরম তৃপ্তির সঙ্গে আহার করিতেন। সামান্য শয্যায় চারিজনে একত্রে শয়ন করিয়া শ্রমের পর পরম সুখে নিদ্রিত হইতেন। এতদিন পর্যন্ত ভাইদের বিশেষ পড়াশুনা হয়নি বলিয়া জ্যেষ্ঠ যেমন চিন্তিত ছিলেন, তেমনি তাহাদের দ্রুত উন্নতি হইতেছে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। দুর্গাপ্রসাদ একটি সোনার মেডেল পাইয়াছিলেন; সেটি তাঁহার বড়ো আদরের বস্তু ছিল। ভাইদের বলিতেন, "তোরা এইরকম মেডেল পেলে আমি আরো কত বেশি আনন্দিত হবো।" দুর্গাপ্রসাদ অতিশয় মাতৃ-পিতৃভক্ত ছিলেন। পিতা-মাতার স্মৃতিতে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া ছিল।

"আন্দুলের স্কুলে ভাইদের যতদূর পড়া হইতে পারে তাহা শেষ হইলে দুর্গাপ্রসাদ তৃতীয় ও কনিষ্ঠ ভাইকে কলিকাতায় রাখিয়া পড়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। হরিপ্রসাদকে তিনি কাছেই রাখিলেন, কারণ সে কানে একেবারেই শুনিতে পাইত না। তারপর তিনি Overseer হইয়া তমলুক চলিয়া যান, হরিপ্রসাদকেও সঙ্গে লইলেন। ভাই দুইটিকে নিয়মিতরূপে খরচপত্র দিয়া ও কিঞ্চিৎ সঞ্চিত রাখিয়া দুই ভায়ে গ্রাসাচ্ছাদন সামান্যরূপে নির্বাহ করিতেন। দেশে বৃদ্ধা ঝি জাহ্নবীকেও কিছু অর্থসাহায্য করিতেন।

দুর্গাপ্রসাদ কিছুকাল চাকরী করিয়া কিছু টাকা জমাইয়া জীরাটে আসিলেন। যাঁহারা বিশ্বনাথের দুঃসময়ে ঋণদান করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে ডাকিয়া ঋণশোধ করিতে চাহিলেন। সকলেই তাঁহার কর্তব্যবুদ্ধির প্রশংসা করিলেন এবং সুদ ছাড়িয়া দিলেন। নিজের বিবাহের পর দুর্গাপ্রসাদ এইবার তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের বিবাহ দিলেন। কলিকাতায় সিমলা কাঁসারীপাড়ার হরিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা জগত্তারিণীদেবীর সহিত গঙ্গাপ্রসাদের বিবাহ হয়। ইহার পর দুর্গাপ্রসাদ সম্বলপুরে বদলী হন। বহুকাল পরে মুখুয্যেদের নষ্টশ্রী গৃহ আবার গৃহলক্ষ্মীগণের সমাগমে শ্রী-সম্পন্ন হইয়া উঠিল।

"গঙ্গাপ্রসাদ ডাক্তারি পড়িতেন, রাধিকাপ্রসাদ ইঞ্জিনিয়ারিং। তাঁহাদের অগ্রজই সমস্ত খরচ দিতেন। বহুবাজারে মালাঙ্গা লেনে একটি বাড়ি ভাড়া করিয়া দুই ভায়ে সেখানে থাকিতেন, বধূরাও থাকিতেন। রাধিকাপ্রসাদ যথাসময়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নূতন কর্মে প্রবৃত্ত হন। গঙ্গাপ্রসাদের মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষা হইতে একবৎসর মাত্র বাকী ছিল। এইসময়ে ১৮৬৪, ২৯শে জুন, সোমবার শেষরাত্রি পাঁচটার সময় বহুবাজারের ঐ বাসায় সেজবধূ জগত্তারিণী দেবী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। বংশে প্রথম পুত্র হওয়াতে সকলেই আনন্দিত হইলেন। দুর্গাপ্রসাদের আনন্দের সীমা নাই। পিতা বিশ্বনাথ পরম শিবভক্ত ছিলেন বলিয়া প্রথম সন্তানের শিবের নামে নাম রাখিলেন 'আশুতোষ'।"*

বৌবাজারের অখ্যাত মালাঙ্গা লেনের ততোধিক অখ্যাত একটি ব্রাহ্মণ পরিবারে প্রথম সন্তান হোয়ে যিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, সেদিন কেউ কি কল্পনা করতে পেরেছিল যে, শুধু মুখোপাধ্যায় বংশে নয়, এই বাংলা দেশের শ্যামল মৃত্তিকায় সেদিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক ক্ষণজন্মা পুরুষ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার সাত বছরের মধ্যেই আবির্ভূত হয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধাতাপুরুষ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

কিন্তু আশুতোষের কথা বলবার আগে গঙ্গাপ্রসাদের কথা বলতে হয়।

---

* বিনোদবাসিনী দেবী। বঙ্গবাণী ১৩৩১। ইনি আশুতোষের পিতৃব্য দুর্গাপ্রসাদের কন্যা।

উনিশ শতকের বাংলায় তিনজন ক্ষণজন্মা মনীষীর জীবনে আমরা দেখতে পাই যে তাঁরা পিতৃ-সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবান হয়েছিলেন। এঁরা হোলেন বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ও আশুতোষ। ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—এই তিনজনই আদর্শ পিতা ছিলেন। পুত্রকে কি ভাবে মানুষ করতে হয়, তার দৃষ্টান্ত এই তিনজনই বিশেষভাবে দেখিয়ে গেছেন। স্মরণীয় বাঙালী-সন্তানদের মধ্যে একমাত্র স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন মাতৃ-সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবান। বাল্যে পিতৃহীন গুরুদাসকে তাঁর জননী সোনামণিদেবী কি ভাবে মানুষ করেছিলেন, সে-ইতিহাস প্রত্যেক বাঙালী মায়ের শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করা উচিত। বস্তুত, পিতা-মাতার স্নেহ ও শাসন ব্যতীত সন্তানদের চরিত্রগঠনের পক্ষে যে জিনিসটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সেটি হোল পিতামাতার উন্নত চরিত্র এবং দূরদর্শিতা। বালক ঈশ্বরচন্দ্র, বালক গুরুদাস, বালক রবীন্দ্রনাথ ও বালক আশুতোষ যে উত্তরকালে স্বনামধন্য হোতে পেরেছিলেন তার মূলে ছিল ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সোনামণিদেবী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উন্নত চরিত্র। অবশ্য সাধারণভাবে ইহা সত্য যে, উনিশ শতকের প্রায় প্রত্যেকটি বরণীয় বাঙালী-সন্তানের জীবন ও চরিত্রগঠনে তাঁদের পিতা-মাতার প্রভাব প্রতক্ষ্যভাবে অথবা পরোক্ষভাবে সহায়ক হয়েছিল, কিন্তু এখানে আমরা বিশেষভাবে যে চারজনের নাম উল্লেখ করলাম এঁদের প্রথম তিনজনের ক্ষেত্রে পিতার প্রভাব এবং চতুর্থজনের ক্ষেত্রে মায়ের প্রভাব শুধু প্রবল নয়—একেবারে সম্পূর্ণ। আজকের দিনের বাঙালী-সন্তানদের চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রেখে আমরা এই কথাটার উল্লেখ করছি এই জন্য যে, বর্তমানে বাংলা দেশের প্রায় পরিবারে সন্তানদের জীবনে তাদের পিতামাতার প্রভাব ক্রমেই যেন গৌণ ও অতীতের বস্তু হোয়ে দাঁড়াচ্ছে। বাংলার সমাজজীবন তাই এমন শিথিল ও বিশৃঙ্খল রূপ ধারণ করেছে। আমাদের উত্তরপুরুষের পক্ষে এটা আদৌ শুভ লক্ষণ নয়।

গঙ্গাপ্রসাদের কথা বলি এইবার।

স্বগ্রামে পাঠ শেষ করবার পর বালক গঙ্গাপ্রসাদ কলিকাতায় এলেন। শতবর্ষ পূর্বের কলিকাতার তখন না ছিল এখনকার শোভা, না ছিল কোনো সম্পদ। ছিল সব রকমের অসুবিধা—এখানে ওখানে জঙ্গল, বাসের অযোগ্য

ঘর-বাড়ি, অপরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধময় রাস্তাঘাট। তখনকার শহর কলিকাতা ছিল সবরকম ব্যাধির লীলাক্ষেত্র। তার ওপর ছিল নিজে রেঁধে খাওয়া। তখন যাঁরা মফঃস্বল থেকে এখানে পড়তে আসতেন, এই সব অসুবিধার কথা জেনেই আসতেন। বালক গঙ্গাপ্রসাদ অগ্রজের কাছে এসব যে কিছু না শুনেছিলেন তা নয়, কিন্তু এইসব অসুবিধার কথা শুনেও তিনি নিরুৎসাহ হন নি কিছু-মাত্র। যাঁরা বড়ো হন, তাঁদের চরিত্রের এই একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য যে কিছুতেই তাঁরা দমেন না। বিদ্যাসাগর, গঙ্গাপ্রসাদ প্রভৃতির জীবনই এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কষ্ট করে লেখাপড়া শিখে মানুষ হওয়া, বর্তমানে এ জিনিস বিরল বললেই হয়।

সেকালে আর একটা অসুবিধা এই ছিল যে, সমস্ত শহরে দু-তিনটির বেশি ভালো স্কুল ছিল না। কলিকাতায় এসে গঙ্গাপ্রসাদ বহু চেষ্টার পর হেয়ার স্কুলে ভর্তি হোলেন এবং ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার বছরেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কলেজে প্রবেশ করেন। কথিত আছে, যেদিন তিনি পরীক্ষার 'ফি' জমা দিতে যাবেন সেদিন তাঁকে একটি দারুণ বিপদের সম্মুখীন হোতে হয়—'ফি'-এর টাকা ক'টি খোয়া যায়। স্বীয় পিতামহের জীবনের এই ঘটনাটি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের কাছে বলেছিলেন। তাঁর কাছে শুনে দীনেশচন্দ্র যা লিপিবদ্ধ করেছেন তার থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হোল : "তৎকালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষার 'ফি' ১০৲ টাকা ছিল। জ্যেষ্ঠভ্রাতা দুর্গাপ্রসাদ বহুকষ্টে এই ১০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলেন; 'ফি' দাখিল করিবার সেই সর্বশেষ দিন। তাড়াতাড়ি গঙ্গাপ্রসাদ উহা জমা দেওয়ার জন্য রাস্তায় যাইতেছিলেন, পথে পকেট-কাটা চোর সেই টাকা লইয়া অদৃশ্য হইল। গঙ্গাপ্রসাদ পৃথিবী অন্ধকার দেখিলেন, আত্মীয়-স্বজন অনেকের বাড়ি বাড়ি ঘুরিলেন, একটি পয়সাও জুটিল না। শেষ মুহূর্তে এক সহৃদয় সাহেব অধ্যাপকের (ইনি একজন খ্রীস্টান মিশনারি ছিলেন) কৃপায় গঙ্গাপ্রসাদ সেই দিনকার অবস্থা-সংকট উত্তীর্ণ হইয়া-ছিলেন।"

শোনা যায়, আশুতোষ যখন পিতার জীবনের এই দুর্দৈবের কথা উল্লেখ করতেন, তখন তাঁর চোখদুটি জলে ভরে উঠত। বলতেন, "কোথায় থাকতো আজ আশুতোষ মুখুয্যে যদি সেদিন ঐ সহৃদয় মিশনারি সাহেব বাবার ফি-এর

টাকা না দিতেন।" উত্তরকালে তিনি যে অমন ছাত্রদরদী হয়েছিলেন তার কারণটা এইখানে খুঁজে পাওয়া যায়। "এই অনুভূতি ও সহৃদয়তা তাঁহার পিতৃ-জীবনের সেই অধ্যায়ের স্মৃতি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছিল। গঙ্গাপ্রসাদের অবস্থা ভালো হইলে তিনিও দুঃস্থ ছাত্রদের যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন—" লিখেছেন দীনেশচন্দ্র। বিদ্যাসাগরের মতন গঙ্গাপ্রসাদও ছাত্রজীবনে অনেক দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়ে দিনাতিপাত করেছিলেন। কথিত আছে, তিনি রাস্তায় লাইট-পোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে পড়া মুখস্থ করতেন। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে তিনি বি এ. পাস করেন এবং এর পাঁচ বছর পরে এম বি পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ডাক্তারী পাস করার পর তিনি দক্ষিণ কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে স্বাধীনভাবে চিকিৎসাব্যবসায় আরম্ভ করেন। চিকিৎসক হিসাবে তাঁর খ্যাতি অল্পদিনেই ছড়িয়ে পড়ে। চিকিৎসাব্যবসায়ে তাঁর প্রচুর অর্থাগম হয়। সেইসময়ে তিনি বাংলাভাষায় 'শারীর বিদ্যা', 'চিকিৎসা-প্রকরণ' ও 'মাতৃশিক্ষা'—এই তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই বইগুলিও তখন বেশ বিক্রি হোত। বিক্রি হবার কারণ, তখন মেডিক্যাল কলেজে ইংরেজি ও বাংলা দুই বিভাগ ছিল। বাংলা বিভাগের ছাত্রদের জন্য বাংলা ভাষায় কোনো ডাক্তারী বই ছিল না। গঙ্গাপ্রসাদের বই এই অভাব পূর্ণ করেছিল। তাঁর 'মাতৃশিক্ষা' একখানি মূল্যবান গ্রন্থ—এই বইটি তিনি বিশেষভাবে পুরমহিলাদের জন্য লিখেছিলেন। কিছুকাল পরে স্বোপার্জিত অর্থে গঙ্গাপ্রসাদ রসা-রোডের উপর বর্তমান বাড়িটি তৈরি করালেন এবং ১৮৭২ সালের বৈশাখ মাসে নব-নির্মিত গৃহে প্রবেশ করেন। আশুতোষ তখন আট বৎসরের বালক।

দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন: "গঙ্গাপ্রসাদ অতি উন্নতমনা ছিলেন। তিনি অর্থোপার্জন করিয়াছিলেন যথেষ্ট কিন্তু অর্থলোভ তাঁহার চরিত্রে ছিল না। পিতার একটি অসাধারণ গুণ আশুতোষ পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সর্বতো-মুখী মনস্বিতা।··· হিন্দুধর্মের প্রতি তিনি প্রগাঢ় বিশ্বাসপরায়ণ ছিলেন। তিনি পোশাক-পরিচ্ছদের আড়ম্বর পছন্দ করিতেন না. অধ্যয়ননিরত ও সতত কর্মশীল ছিলেন। ইঁহার চরিত্রে যেসকল গুণ কুঁড়ির মতো দেখা গিয়াছিল, সেই গুণাবলী আশুতোষে পূর্ণ শতদল হইয়া বিকাশ পাইয়াছিল।"

॥ দুই ॥

প্রকৃতিদত্ত প্রতিভা নিয়েই আশুতোষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে গড়ে তুলেছিলেন গঙ্গাপ্রসাদ। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক জীবনচরিতকার যথার্থই মন্তব্য করেছেন: "পিতামাতা ও বংশের অনেক পুণ্য না থাকিলে আশুতোষের মতো পুত্র জন্মে না; অনেক তপস্যায় ও বহু পুণ্যের জোরে ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ আশুতোষ হেন পুত্র পাইয়াছিলেন। পুত্রকে তিনি অপরাপর পিতার ন্যায় শুধু বাৎসল্যের সহিত লালন-পালন করিয়া কর্তব্য শেষ হইল, মনে করেন নাই। নিপুণ মালী যেমন উৎকৃষ্ট ফুলের গাছটিকে রোপণপূর্বক রক্ষা করিয়া তাহার কুসুম উদ্গমের সময় হইতে যত্ন ও অধ্যবসায়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে, গঙ্গাপ্রসাদও তদ্রূপ শিশু আশুতোষের প্রতিভা প্রতি মুহূর্তে লক্ষ্য করিয়া তাহার বিকাশের সহায়তা করিয়াছিলেন।" বস্তুত "সন্তানের প্রতি পিতার কর্তব্য-বোধ এবং তাহার চরিত্র-গঠনের দায়িত্বজ্ঞান"—এরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

শুধু তাই নয়। "পিতা ও পুত্রের এমন ঘনিষ্ঠ সাহচর্য এবং পিতা-কর্তৃক পুত্রের জ্ঞান-উন্মেষের এরূপ অবিশ্রান্ত চেষ্টার" দৃষ্টান্তও বাংলাদেশে বিরল। পিতা ও পুত্রের মধ্যে মনোরাজ্যের অন্তরঙ্গতা, ইংরেজিতে যাকে বলে mental affinity, এর বড়ো দৃষ্টান্ত বোধহয় ইংলণ্ডের জেমস্ মিল ও তাঁর পুত্র জন স্টুয়ার্ট মিলের জীবনে আমরা দেখতে পাই। উত্তরকালে আশুতোষের চরিত্র যে বহুলাংশে পিতা গঙ্গাপ্রসাদের উন্নত চরিত্রের প্রতিচ্ছবি হোয়ে ফুটে উঠেছিল, তার মূলে ছিল পিতা ও পুত্রের মধ্যে এই অন্তরঙ্গতা। বর্তমানে বাংলার পারিবারিক জীবনে এই জিনিসটি যতই দুর্লভ হোয়ে আসছে ততই আমাদের সমাজজীবন শিথিল হোয়ে উঠছে।

আশুতোষের মৃত্যুর পরে বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছিলেন: "আশুতোষের

জীবনালেখ্য আঁকিবার সময় এখনও আসে নাই।" আজ চল্লিশ বছর পরে, মনে হয় সেই সময় এসেছে। আশুতোষের জীবনচরিত অবশ্য তিনখানি আছে—একখানি ইংরেজিতে ও অপর দুখানি বাংলায়। কিন্তু সেগুলি ঠিক জীবনচরিত হোয়ে ওঠেনি, যদিও এর একখানির লেখক আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন। আশুতোষ-সম্পর্কে বাংলাভাষায় সর্বপ্রথম আলোচনা করেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তিনিই আশুতোষের প্রথম জীবনীকার। রামানন্দবাবু আশুতোষের অনুজ হেমন্তকুমারের বন্ধু ছিলেন। আশুতোষের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিতর্পণ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন: "আমার সম্পাদিত 'প্রদীপ' নামক মাসিক পত্রে আমি আশুতোষের সচিত্র জীবনচরিত সংক্ষেপে লিখিয়াছিলাম। ইহাই আশুতোষের প্রথম জীবনচরিত। আমার মনে পড়ে, ইহার জন্য আমি তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম এবং ঐ জীবন-চরিতখানি প্রকাশিত হইবার পর বহুকাল পর্যন্ত তাঁহার নিকট কেহ তাঁহার জীবনসম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিলে তিনি 'প্রদীপ' কাগজ দেখিতে বলিতেন।"*

তারপর অতুলচন্দ্র ঘটক আশুতোষের নিজের মুখে শুনে তাঁর ছাত্রজীবনের অনেক কথা 'নোট' করে নিয়েছিলেন। লেখক এই বিবরণ সংগ্রহ করেন ১৯০৮ সালে—আশুতোষ তখন সবেমাত্র ভাইস-চ্যান্সেলারের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ঘটক মহাশয় তাঁর গ্রন্থের মুখবন্ধে নিবেদন করেছেন: "এই পুস্তক-বর্ণিত সমুদয় ঘটনা, ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা প্রভৃতি সমস্তই আমি স্বর্গীয় স্যর আশুতোষের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। একটি কথাও জানিবার নিমিত্ত আমাকে অন্য চেষ্টা করিতে হয় নাই।" কিন্তু ১৯০৮ সালের লেখা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সালে, আশুতোষের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে। এই দীর্ঘকাল গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আশুতোষের নিকট ছিল; তিনি তাঁর জীবিত-কালে বইখানি প্রকাশের অনুমতি দেন নি। কেন, তা অনুমান করা কঠিন। একটা কারণ এই হোতে পারে যে, তিনি নিজের ঢাক নিজে পেটাতে পছন্দ করতেন না কোনোদিন। প্রকৃত কর্মীপুরুষের রীতি ইহাই।

আদর্শ ছাত্র আশুতোষের ছাত্রজীবনের অপূর্ব ও অদ্ভুত ঘটনাবলী-সম্বলিত 'আশুতোষের ছাত্রজীবন' নিঃসন্দেহে আশুতোষের জীবনচরিত আলোচনা

---

* প্রবাসী। আষাঢ় ১৩৩১

করবার পক্ষে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ। এই পুস্তকের ভূমিকায় দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন: "পুস্তকখানির পাণ্ডুলিপি আশুতোষ স্বয়ং লইয়া গিয়া তাঁহার সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, যে পর্যন্ত জানা গিয়াছে তাহাতে আদত পাণ্ডুলিপিখানির এখনও উদ্ধার হয় নাই। পুস্তকের একখানি খসড়া গ্রন্থকারের নিকটে ছিল, তাহাই অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক প্রকাশিত হইল। এই জীবনী আদর্শ ছাত্রজীবনী।" আশুতোষের ছাত্রজীবনের ইতিহাস তাঁর সমগ্র জীবনের একটি দেদীপ্যমান অধ্যায়। সেই ইতিহাস ঘটক মহাশয় বিশ্বস্ততার সঙ্গেই লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি যদি আশুতোষের জীবনের পরবর্তী ইতিহাস ঠিক এইভাবে লিপিবদ্ধ করতে পারতেন তা হোলে বসওয়েল-রচিত জনসনের জীবনীর ন্যায় বাংলাভাষায় আমরা একখানি সত্যকার জীবন-চরিত পেতাম।

আশুতোষের একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত লিখতে পারতেন আর একজন। তিনি দীনেশচন্দ্র সেন। তিনি নিজেই বলেছেন: "এই বহু কর্মচঞ্চল, অবিচ্ছিন্ন আদর্শমূলক জীবন তো আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। যেরূপ দেখিয়াছি, এরূপ তো আর দ্বিতীয়টি দেখিব না।" কিন্তু স্বচক্ষে দেখলেও এবং সুদীর্ঘকাল যাবৎ তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এলেও, দীনেশচন্দ্র আমাদের প্রত্যাশাকে পূর্ণ করেননি। তাঁর সুলিখিত 'আশুতোষ-স্মৃতিকথা' সুবিন্যস্ত বা সুগ্রথিত জীবনচরিত হোয়ে ওঠেনি—ইহা চরিতাখ্যান মাত্র। জীবনচরিতকারের যে নিরাসক্ত দৃষ্টি ও বিচারবোধ থাকা প্রয়োজন, 'আশুতোষ-স্মৃতিকথা' লেখকের মধ্যে তার পরিচয় অনুপস্থিত। দীনেশচন্দ্র আশুতোষের একজন অনুরাগী ভক্ত ছিলেন; অনুরাগীর দৃষ্টিতেই তিনি আশুতোষকে দেখেছেন এবং ভক্তের মতন স্তুতি-নিবেদন করেছেন। তবে নানা সূত্র থেকে প্রাপ্ত অনেক উপাদানের সমাবেশ তিনি করতে সমর্থ হয়েছেন তাঁর এই স্মৃতিকথার মধ্যে।

ইংরেজিতে আশুতোষের জীবনচরিত রচনা করেছেন প্রবোধচন্দ্র সিংহ। বইটির নাম: *Sir Ashutosh Mookerjee: A Study*; আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও স্যর সি. ভি. রমণ-লিখিত দুটি ভূমিকা এই বইতে সংযোজিত হয়েছে। ১৯২৮ সালে ইহা প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের মুখবন্ধে লেখক লিখেছেন: "The present work is really a study of the various aspects

of the life and character of Sir Ashutosh Mookerjee who was universally regarded as the most powerful personality and the greatest reformer in the realm of higher studies and researches in the India of today. It is neither an ideal biography, nor has it any pretension to completeness." লেখকের এই অকপট স্বীকৃতি লক্ষণীয়। এই বইখানি বিপুলায়তন; উনিশটি অধ্যায়ে ও একটি সুদীর্ঘ পরিশিষ্টের মধ্যে তিনি বহু শ্রম স্বীকার করে আশুতোষের ঘটনাবহুল কর্মজীবনের একটি চিত্র আঁকবার প্রয়াস পেয়েছেন। স্থানে স্থানে এই পুরুষসিংহের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে তাঁর এই প্রয়াস সার্থক হয়েছে। তবে উচ্ছ্বাস ও আবেগের আতিশয্য বইখানির প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় পরিলক্ষিত হয় এবং এইজন্যই ইহা একখানি আদর্শ জীবনচরিত হয়ে উঠতে পারেনি।

পুত্র শ্যামাপ্রসাদ তাঁর পিতার কথা আলোচনা করেছেন তাঁর *Representative Indians* নামক একখানি পুস্তকে। আশুতোষ-চরিত্র আলোচনার পক্ষে এই রচনাটি বিশেষ মূল্যবান। আমরা যথাস্থানে এর উল্লেখ করব। ইতিহাসে যাঁরা তাঁদের কর্ম, প্রতিভা এবং চরিত্রগৌরবে একটা স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে যান, তাঁদের জীবনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে হোলে তাঁদের নিজস্ব রচনার উপর নির্ভর করাই উচিত। এইদিক থেকে বিবেচনা করলে আমরা দুইটি গ্রন্থের উল্লেখ করতে পারি, যথা: *Addresses: Literary and Academic* এবং 'জাতীয় সাহিত্য'। আশুতোষের শিক্ষা-সংক্রান্ত ভাষণগুলির মধ্যে বেশির ভাগই প্রথম বইখানির মধ্যে সংগৃহীত হয়েছে আর দ্বিতীয় বইখানিতে আছে বাংলাভাষা ও সাহিত্যসম্পর্কে তাঁর পাঁচটি মূল্যবান ভাষণ। আশুতোষ মুখ্যত একজন শিক্ষা-সংস্কারক; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি ভেঙে নূতন করে গড়েছিলেন। তাঁর জীবনের সর্বাধিক সময় নিয়োজিত হয়েছিল এই দেশে উচ্চশিক্ষা প্রবর্তনের কাজে। ১৯০৬ সাল থেকে ১৯১৪ সাল—এই আটবছর কাল তিনি একাদিক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই আটবছর কাল উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর বহুমুখী চিন্তাভাবনা অনুধাবনের পক্ষে, *Addresses* গ্রন্থে সন্নিবেশিত বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত

তাঁর কনভোকেশন বক্তৃতাগুলি তাঁর চরিতালোচনার পক্ষেও বিশেষ সহায়ক। তাঁর বাৎসরিক কনভোকেশন বক্তৃতাগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মপদ্ধতি এবং অভাব-অভিযোগের কথা তাঁর নিজের মুখে বিবৃত হয়েছে। তেমনি বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি বিধানে তিনি কী পরিমাণ চিন্তা করেছিলেন এবং মাতৃভাষাকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে কিজন্য স্থান দিয়েছিলেন তা 'জাতীয় সাহিত্য' পাঠে আমরা জানতে পারি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত *Hundred Years of the University of Calcutta* বইখানিও আশুতোষের জীবন-চরিত আলোচনার পক্ষে অপরিহার্য। তাঁর জীবনের অধিক সময় এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংগঠনে ও সংস্কারে অতিবাহিত হয়েছিল; সুতরাং এই ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভা কী অসাধ্য-সাধন করেছিল তার পরিচয় ভিন্ন আশুতোষের জীবনের পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এ ছাড়া স্যাড্‌লার কমিশনের রিপোর্টখানিও উল্লেখ্য। এই রিপোর্টে শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ, উদার মত যেমন প্রকাশিত হয়েছে, এমন আর কোথাও নয়। বিচারপতি আশুতোষকে জানবার জন্য আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে কলিকাতা হাইকোর্টে, যেখানে তিনি ১৯০৪ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯২০ সালে কয়েক মাসের জন্য তিনি প্রধান বিচারপতির পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন। কলিকাতার *Law Report*-এ তাঁর দু' হাজারের বেশি 'রায়' (Judgment) পাওয়া যায়। বিশিষ্ট ব্যবহারজীবীদের মতে আশুতোষের কতগুলি রায় স্মৃতিশাস্ত্রের সম্পদ-স্বরূপ। তাঁর বিচার-পদ্ধতি ও বিচার-সিদ্ধান্ত বহু ক্ষেত্রেই পৃথিবীর ব্যবহারশাস্ত্রের উপর নূতন আলোক-সম্পাত করে গিয়েছে। তাঁর প্রতিভার এই দিকটি বিশেষভাবেই গবেষণার বিষয়।

আশুতোষের মৃত্যুর পর সমকালীন বাংলার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর জীবনকথা, তাঁর চরিত্রের নানাদিক নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। বাংলাদেশে ১৯২৪ সালে এই পুরুষসিংহের আকস্মিক মৃত্যুতে যে আলোড়ন দেখা গিয়েছিল, যে সর্বজনীন শোকের বন্যা বয়ে গিয়েছিল, সমসাময়িক ইতিহাসে তেমন আলোড়ন, তেমন স্বতঃস্ফূর্ত শোকপ্রকাশ আর দেখা যায়নি। সেইসময়ে

মুখোপাধ্যায় পরিবারের 'বঙ্গবাণী' নামে একখানি নিজস্ব মাসিক পত্রিকা ছিল। একালে বাংলা মাসিকপত্রের ইতিহাসে 'বঙ্গবাণী' একটি অবিস্মরণীয় নাম—নানা দিক দিয়ে এর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সেদিন বিদগ্ধজনকে মুগ্ধ করেছিল। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাস ও ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস'—কেবলমাত্র এই দুটি রচনা প্রকাশ করে এই পত্রিকা-সেদিন বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিল। বিজয়চন্দ্র মজুমদার এর সম্পাদক ছিলেন। দীনেশচন্দ্র সেনও কিছুকাল 'বঙ্গবাণী'র সম্পাদনা কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। আশুতোষের মৃত্যুতে এই পত্রিকার উপর্যুপরি কয়েকটি সংখ্যায় তাঁর সম্পর্কে বহু প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, হেমেন্দ্রনাথ সেন, রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন, যাদবেশ্বর তর্করত্ন, মানকুমারী বসু, ডক্টর শিশিরকুমার মিত্র প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সেইসময়ে আশুতোষের চরিত্র ও প্রতিভা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। এই রচনাগুলির মধ্যেও তাঁর চরিত্রের, তাঁর জীবনেতিহাসের বহু উপাদান পাওয়া যায়।

মাতাপিতার অতন্দ্রিত যত্ন ও সতর্কতার মধ্যে আশুতোষের বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়েছিল। একটা জীবনের সু-পরিণতি হয় অনেক কষ্টে, অনেক সাধনায়। কিন্তু যেখানে হয় সেখানে সে তার সৌরভে শুধু যে নিজেই সার্থক হোয়ে ওঠে তা নয়, অপর পাঁচজনকেও স্নিগ্ধ করে। এই সার্থকতার মহিমোজ্জ্বল দীপ্তি আশুতোষের চরিত্রের নানা পর্বেই উদ্ভাসিত হোয়ে উঠেছিল। তাঁর ছাত্রজীবনের শুরু থেকে কর্মজীবনের শেষ দিনটি পযন্ত আশুতোষকে আমাদের সম্মুখে সার্থকতার একটি বিগ্রহরূপেই দেখতে পাই। মেধাবী পিতার মেধাবী পুত্র ছিলেন তিনি। গঙ্গাপ্রসাদের জীবনচরিত পাঠে জানা যায় যে, মেডিক্যাল কলেজের প্রায় প্রত্যেকটি বাৎসরিক পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ধাত্রীবিদ্যায় তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য তিনি একটি স্বর্ণপদক পুরস্কার পেয়েছিলেন। কথিত আছে, পুত্র আশুতোষের শৈশবে কত সময় গঙ্গাপ্রসাদ ছাত্রজীবনে প্রাপ্ত তাঁর সেই মেডেলটি দেখিয়ে বলতেন, "ভালো করে পড়বি,

তাহলে তুই-ও এরকম একখানা মেডেল পাবি।” এমনি করেই তিনি পুত্রের হৃদয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষার বীজ রোপণ করতেন। বাংলাদেশে কৃতবিদ্য ও মহৎপ্রাণ পিতা এবং সেইরূপ কৃতবিদ্য ও উন্নতচরিত্রের পুত্র—এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বোধহয় গঙ্গাপ্রসাদ আর আশুতোষ। পুত্রের যখন বিদ্যাভ্যাস করবার সময় উপস্থিত হোল, তখন থেকে গঙ্গাপ্রসাদ সত্যই “আশুতোষের মানসিক উন্নতির প্রতি বদ্ধলক্ষ্য, আগ্রহশীল ও মনোযোগী ছিলেন।”

‘আশুতোষের ছাত্রজীবন’ গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে, গঙ্গাপ্রসাদ প্রতিদিন প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করে পুত্র আশুতোষকে নিয়ে ভ্রমণে বেরুতেন। এই সময়টা তিনি বৃথা যেতে দিতেন না। উৎসাহী পুত্রকে নানা বিষয়ের জ্ঞান মুখে মুখে শিক্ষা দিতেন এবং সবরকম সুশিক্ষার বীজ ছেলের মনের মধ্যে অঙ্কুরিত করতে প্রয়াস পেতেন। মাত্র দু’ বছরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে আশুতোষ যখন সাউথ সুবার্বন স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন, তখন তিনি মিলটনের ‘প্যারাডাইজ লস্ট’ কাব্যের প্রথম ক্যাণ্টোর সবটাই মুখস্থ বলতে পারতেন। গঙ্গাপ্রসাদ স্বয়ং পুত্রকে পড়াতেন, তাছাড়া যোগ্য গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করে তাঁর শিক্ষার সকল বন্দোবস্তই করে দিয়েছিলেন। পিতার অধ্যবসায়ের সঙ্গে পুত্রের অধ্যবসায় মিলিত হোয়ে এদেশে চিরকালের জন্য একটি আশ্চর্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছে। আশুতোষ যখন সাউথ সুবার্বন স্কুলে ভর্তি হন, তখন এই স্কুলের প্রধানশিক্ষক ছিলেন স্বনামধন্য শিবনাথ শাস্ত্রী। শাস্ত্রী মহাশয় ১৮৭২ সালে এম. এ. পাস করে শিক্ষকতা কার্যে ব্রতী হন এবং কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত মহিলা বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতার কার্য গ্রহণ করেন। পরে তিনি সাউথ সুবার্বন স্কুলে যোগদান করেন। কিন্তু এখানে বেশি দিন ছিলেন না। ১৮৭৬ সালের প্রারম্ভে তিনি হেয়ার স্কুলে হেড-পণ্ডিতরূপে যোগদান করেন।

আশুতোষের ছাত্রজীবনের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবার প্রয়োজন নেই। অনুসন্ধিৎসু পাঠক যদি সর্বকালের সেই আদর্শ ছাত্রজীবনের পরিচয় পেতে চান তবে তিনি যেন অতুলচন্দ্র ঘটকের বইখানি অবশ্যই পাঠ করেন। দৈবদত্ত প্রতিভা নিয়ে আশুতোষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন সত্য, কিন্তু শৈশবকাল থেকেই বড়ো হবার জন্য একটি উচ্চ আকাঙ্ক্ষা তিনি মনের মধ্যে

পোষণ করতেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভিন্ন মানুষ বড়ো হয় না। বিদ্যানুরাগ তাঁর সহজাত ছিল সত্য, কিন্তু সেই অনুরাগের পিছনে যে উদ্যম, যে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা থাকলে অনুরাগ যথার্থ ফলপ্রসূ হয়, বালক আশুতোষের মধ্যে তা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। পিতার সতর্ক দৃষ্টি শুধু যে পুত্রের অধ্যয়নের উপর নিবদ্ধ থাকত, এ কথা মনে করলে ভুল হবে। গঙ্গাপ্রসাদ একদিকে যেমন অনুচিকীর্ষু বালকের মনে আশা ও আগ্রহ জাগিয়ে তুলতেন, অন্যদিকে তেমনি তিনি পুত্রের অন্তঃকরণে সৎপ্রবৃত্তির বীজ বপন করতে সতত প্রয়াস পেতেন। এ ছাড়া, গঙ্গাপ্রসাদের ভবনে বহু স্বনামধন্য ব্যক্তির আসা-যাওয়া ছিল। বালক আশুতোষ তাঁদের দেখে মুগ্ধ হোতেন। চরিত্রে, বিদ্যাবত্তায় এঁরা সব কত বড়ো; আমিও কি এঁদের মতো হোতে পারব?—এই আকাঙ্ক্ষা জাগত বালকের মনে। বিচারপতি সুবিদ্বান দ্বারকানাথ মিত্র গঙ্গাপ্রসাদের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। প্রতিদিন সকালে কিছুক্ষণের জন্য মুখুয্যে-বাড়ি আসা দ্বারকানাথের বাঁধা ছিল। তাঁকে দেখে বালক আশুতোষের হৃদয়ে উচ্চাভিলাষ জেগে উঠতো। কথিত আছে, হাইকোর্টের জজ হবার ইচ্ছাটা তখন থেকেই তাঁর মনে জেগে উঠতে থাকে। একদিকে যেমন পিতার আদর্শ, অন্যদিকে তেমনি সমকালীন বাংলার বহু বরেণ্য সন্তানের জীবন্ত আদর্শ বালকের সম্মুখে ছিল। সকলের উপর ছিল বিদ্যাসাগরের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের সঙ্গে শৈশবে আশুতোষের প্রথম পরিচয়ের ঘটনাটি এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য।

আশুতোষের বয়স যখন দশ-এগারো বছর তখন তাঁর এক কঠিন অসুখ হয়। বুকের অসুখ। পুত্রগতপ্রাণ "ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রের চিকিৎসার ভার স্বহস্তে না লইয়া, তাঁহাকে মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক সুবিখ্যাত ডাক্তার চার্লসের নিকট লইয়া গেলেন। ডাক্তার সাহেব কিছুদিনের জন্য সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিতে পরামর্শ দিলেন। ···গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রের জন্য চিন্তাকুল হইলেন। বায়ু পরিবর্তনে উপকার হইবে মনে করিয়া আশুতোষকে তাঁহার মাতা ও কনিষ্ঠা ভগিনীর সহিত, মথুরায় প্রেরণ করিলেন।" প্রায় পাঁচমাস কাল বালক আশুতোষ এইসময়ে বাংলার বাইরে মথুরায় ছিলেন। মথুরার জলবায়ুতে তিনি তাঁর নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন এবং রীতিমতো হৃষ্টপুষ্ট হোয়ে উঠলেন।

বালক বয়সের কৃশকায় আশুতোষ পরবর্তীকালে স্থূলকায় আশুতোষে পরিণত হন। সেই নর-শার্দুল আকৃতিই বাঙালীর স্মৃতিতে চিরজাগ্রত রয়েছে। মথুরা থেকে কলিকাতায় ফিরছেন আশুতোষ। পথিমধ্যে মোগলসরাই স্টেশনে থামলো মথুরা এক্সপ্রেস। তখন সবেমাত্র সকাল হয়েছে। গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বালক আশুতোষ দেখতে পেলেন যে, ধুতি-চাদর ও পায়ে তালতলার চটি-পরিহিত এক ব্যক্তি প্ল্যাটফর্মে একমনে পায়চারি করছেন। এ মূর্তি তাঁর পরিচিত। পিতার কাছে ও পিতৃবন্ধুদের কাছে তিনি তাঁর কথা বহুবার শুনেছেন। মুহূর্তমধ্যে কৌতূহলী বালক গাড়ির কামরা থেকে নামলেন; ছুটে এসে প্রণাম করলেন পাদচারণারত সেই ব্যক্তিকে। তিনি বিদ্যাসাগর।

—কে তুমি? জিজ্ঞাসা করলেন বিদ্যাসাগর।

—আমি ভবানীপুরের ডাক্তার শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছেলে। নাম—শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

—গঙ্গাপ্রসাদের ছেলে! তা এখানে কোথা থেকে এলে তুমি?

—আজ্ঞে মথুরায় গিয়েছিলাম বায়ু-পরিবর্তনের জন্য। সেখান থেকে কলকাতায় ফিরছি।

—বেশ, বেশ। কি পড়ো?

—এইবার হাই-স্কুলে ভর্তি হব। এতদিন বাবার কাছে পড়াশুনা করেছি।

বালকের প্রতিভাব্যঞ্জক মুখ, প্রশস্ত ললাট আর শিষ্টাচারসম্মত কথাবার্তায় বিদ্যাসাগর মুগ্ধ হোলেন। মুগ্ধ হোলেন বালকের বিনয়-নম্র ব্যবহারে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তিনি আশুতোষের দিকে। কি দেখলেন, তিনিই বুঝলেন। উনিশ শতকের বাংলার অদ্বিতীয় শিক্ষাগুরু সেদিন এই কিশোরের মধ্যে কি বাংলার ভাবী শিক্ষাগুরুকে দেখতে পেয়েছিলেন? ট্রেনের হুইসিল বেজে উঠলো। আশুতোষ আবার বিদ্যাসাগরের পদধূলি নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। এর কিছুদিন পরের ঘটনা। আশুতোষ তখন সাউথ সুবার্বন স্কুলের ছাত্র। বই কেনার বাতিক তাঁর ছেলেবেলা থেকেই। সেদিন তিনি এসেছেন 'থ্যাকার স্পিঙ্কে'র বইয়ের দোকানে। এখানেও সেদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হোল বিদ্যাসাগরের সঙ্গে। প্রণাম করলেন তাঁকে। সেদিন
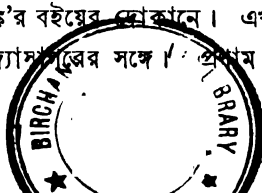
বিদ্যাসাগর একখানি বই কিনে বালকের হাতে উপহার দিয়ে বলেছিলেন—"মন দিয়ে পোড়ো।" বইটির নাম 'রবিনসন ক্রুশো'। পরবর্তীকালে আশুতোষ বলতেন যে, ছাত্রজীবনে তিনি বহু পারিতোষিক ও স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন, কিন্তু বিদ্যাসাগরের স্বহস্তে দেওয়া ও স্বাক্ষর-করা এই 'রবিনসন ক্রুশো' বইখানির চেয়ে মূল্যবান তাঁর কাছে আর কিছু ছিল না। ছাত্রজীবনে এটি তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল, বড়ো হোয়েও এটিকে তিনি পরম সম্পদজ্ঞানে সর্বদা তাঁর পাশে রাখতেন। এরই স্পর্শের ভিতর দিয়ে তিনি কি বিদ্যাসাগরের সান্নিধ্য অনুভব করতেন?

সাউথ সুবার্বন স্কুলে ১৮৭৬ সালে ভর্তি হোলেন আশুতোষ। শিবনাথ শাস্ত্রী তখন এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি লিখেছেন: "আশুতোষকে পাইয়া আমি যেন হাতে আকাশ পাইলাম। জীবনে এমন ছাত্র আর দুইটি দেখি নাই।" এইসময় থেকেই পিতার নির্দেশে তিনি সংস্কৃত-ভাষা শিক্ষা করতে আরম্ভ করেন। এজন্য গঙ্গাপ্রসাদ সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত পঞ্চানন পালধিকে পুত্রের অন্যতম গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। ইংরেজি ও অঙ্কের জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় ও উড়িষ্যার পুরুষশ্রেষ্ঠ মধুসূদন দাস। জ্ঞান-পিপাসু বালকের মন কিন্তু স্কুলের রুটিন-বাঁধা পড়ায় তৃপ্ত হোত না। জ্ঞানার্জনের জন্য একটা বিরাট আগ্রহ জেগেছিল তাঁর মধ্যে। বাড়িতে তিনি তাই নিবিষ্টচিত্তে ইতিহাস, সংস্কৃত, ইংরেজি ও গণিতের চর্চা করতে থাকেন। অবসর সময় বলে কিছু ছিল না তাঁর—সর্বদাই স্তূপীকৃত বইয়ের মধ্যে বালক ডুবে থাকতেন। সাধারণ ছাত্র তো নয়—এ যেন একজন প্রকৃত জ্ঞান-তাপস। এইভাবে "অধ্যবসায়শীল পুত্র পিতার নিকট অধ্যবসায়ের যে প্রেরণা পাইলেন, তাহা উর্বরক্ষেত্রে শস্যের বীজের ন্যায় তাঁহার শিক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ণ ফসল আনয়ন করিয়াছিল।"

আশুতোষের বাল্যকাল থেকে গঙ্গাপ্রসাদ সংকল্প করেছিলেন যে একটা 'মানুষ' গড়ে তুলবেন—মেধায় ও মনীষায় অতুলনীয় মানুষ। এই 'মানুষ' করার ইতিহাসটা জানবার মতন। রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন:

"আশুতোষ বলিয়াছেন, একবার ব্লকম্যানের জিওগ্রাফি তিনি পিতার নিকট চাহিলেন। অমনি গঙ্গাপ্রসাদ ইংরাজি বাংলায় তখন যতগুলি জিওগ্রাফি প্রচলিত ছিল, যতরকম মানচিত্র ছিল একদিন বিকালে আনিয়া হাজির করিলেন। সেকালে মজুমদার কোম্পানির ছোটো একখানা বাংলা অভিধান ছিল। চক্রবেড়ের যে বাংলা বিদ্যালয়ে বাল্যে আশুতোষ পড়িতেন, তাহার শিক্ষক মহাশয় সেই অভিধানখানার কথা বলায়, গঙ্গাপ্রসাদ তখন সব কয়খানা বাংলা অভিধান কিনিয়া আশুতোষের জন্য মনের মতো করিয়া পুস্তকালয় সাজাইয়া দিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে আশুতোষ স্বয়ং চার-পাচ লক্ষ টাকার বই কিনিয়াছিলেন। বলিতেন, "এই বইগুলি আমার সর্বস্ব, জীবনের প্রধান সম্পদ।"

১৮৭৯। আশুতোষ এনট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে কুড়ি টাকার বৃত্তি পেলেন। তিনি যখন প্রথম শ্রেণীর ছাত্র, তখন কঠিন অসুখে তাঁকে পুরো তিনমাস কাল শয্যাগত থাকতে হয়েছিল। অতিরিক্ত পরিমাণে পড়াশুনা করা, তার উপর এই কঠিন অসুখ—এরই ফলে পরীক্ষায় এই ভাগ্য-বিপর্যয়। আশুতোষ একটু মনঃক্ষুণ্ণ হোলেন। সে বছর পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন, হিন্দু স্কুলের বিখ্যাত ছাত্র প্রসন্নকুমার কারফরমা। ইনিও অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী ও মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং আশুতোষের চেয়ে বয়সে কিছু বড়োও ছিলেন। পরবর্তীকালে এই প্রসঙ্গে আশুতোষ বলতেন যে, ইতিহাস, গণিত, ইংরেজি-সাহিত্য প্রভৃতি সব বিষয়েই তিনি অন্যান্য পরীক্ষার্থীর চেয়ে অগ্রগামী (advanced) থাকলেও, একটি বিষয়ে স্কুলে তিনি শিক্ষা পান নি। সেটি হোল—কেমন করে প্রশ্নপত্রের উত্তর করতে হয়। হেয়ার ও হিন্দু স্কুলের ছাত্রদের এ বিষয়ে যথাযথ শিক্ষা দেওয়া হোত।

কিন্তু তাই কি? সাধারণ ছাত্রদের মতো আশুতোষ কি স্কুলে, কি কলেজে কোনোদিনই নোট-মুখস্থ-করা ছাত্র ছিলেন না। আবার নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম অনুসারে পাঠ করেও তিনি নিরস্ত হোতেন না। তাঁর ছিল বিশ্বগ্রাসী প্রতিভা—ছিল অদম্য পাঠস্পৃহা। পাঠ্যপুস্তকের প্রথম থেকে শেষ পৃষ্ঠাটি পর্যন্ত পড়তেন তিনি। অধীত-বিদ্যা স্মৃতির স্বর্ণপাত্রে সঞ্চিত থাকত। থার্ড ক্লাসের ছাত্র মেকলের *Hastings* ও *Clive* নামক প্রবন্ধ দুটি কণ্ঠস্থ করেছিলেন। এত

পাঠ নয়, এ যেন গণ্ডূষে পান করা। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়তে পড়তেই এফ. এ. পরীক্ষার গণিত প্রায় সবই শেষ করে ফেলেছিলেন। 'ইউক্লিডে'র জ্যামিতি পর্যন্ত। এ হেন যে অগ্রগামী ছাত্র, তাঁর পক্ষে প্রশ্নপত্রের বাঁধা-ধরা উত্তর লেখা কিছুতেই সম্ভব নয়; কিংবা এমনও হোতে পারে যে আশুতোষ-প্রদত্ত উত্তর পরীক্ষকের পরিমিত জ্ঞান ও বুদ্ধির অতীত ছিল, কাজেই প্রচলিত মাপকাঠি দিয়ে সেই উত্তর-পত্র পরীক্ষা করা পরীক্ষকদের সাধ্যে কুলোয় নি। ভাগ্য-বিপর্যয় সম্ভবত এই কারণেই ঘটে থাকবে। তথাপি তাঁর স্বভাবদত্ত মেধা ও প্রতিভা প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান লাভের জন্য কিছুমাত্র পরিম্লান হয়নি। বরং দেখা গেল যে কলেজে এসে সেই মেধা ও প্রতিভা যেন বিপুল বিভায় বিকশিত হোয়ে উঠলো।

মহত্ত্বের বীজ যাঁর মধ্যে থাকে, তিনি এ জগতে যে পথই গ্রহণ করুন, উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে তাঁর স্থান সুনিশ্চিত। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ছাত্রজীবনে এবং কর্মজীবনে এটি একটি পরীক্ষিত সত্য। পারিবারিক পরিবেশ, পিতা-মাতার উন্নত চরিত্র আর বাংলার নবজাগরণ, এইসব বিভিন্ন পথ দিয়েই আশু-তোষ-চরিত্রের উর্বর ক্ষেত্রে বিধিদত্ত মহত্ত্বের যে বীজ রোপিত হয়েছিল, কাল-ক্রমে সেই বীজ কী বিরাট মহীরুহে পরিণত হোয়ে একটা উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করল, সে ইতিহাস তো আমরা আমাদের কালেই প্রত্যক্ষ করলাম। বাংলার এক সংকটের দিনে আবির্ভূত হোয়ে দেশকে তিনি সজীব করে গিয়েছেন কেবলমাত্র প্রতিভার বলে নয়, অন্তর্নিহিত মহত্ত্বের গুণে। আমার মনে হয়, ছাত্রজীবন থেকেই তিনি একটা উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখেছিলেন, দেখেছিলেন উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতের একটা গৌরবজনক ভবিষ্যৎ। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একটা নূতন জীবনবোধ জাগিয়ে তুলবেন তাঁর দেশবাসীর মনে, সম্ভবত এই প্রকার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা তিনি তাঁর অন্তরে পোষণ করতেন। তিনি তাঁর স্বজাতির জন্য একটা নূতন শিক্ষাজীবন গড়ে তুলবেন—এই শুভ সংকল্প আহিতাগ্নির মতো তাঁর অন্তরে সদা জাগ্রত ছিল বলেই কি ছাত্রজীবনে আশুতোষ অনন্যমনা হোয়ে অধ্যয়নকে তপস্যার তুল্য জ্ঞান করতেন? মহত্ত্বের বীজ থেকেই এইরকম

শুভ সংকল্প, এই প্রকার উচ্চ আকাঙ্ক্ষার উদ্ভব হোয়ে থাকে। ইহা ইতিহাসের সত্য। আশুতোষের জীবনে, তাঁর সকল কর্মপ্রয়াসের মধ্যে আমরা এই সত্যকেই মূর্ত হোতে দেখেছি।

তাঁর ছাত্রজীবনের কাহিনী আমরা আরো একটু অনুসরণ করব। ১৮৮০। আশুতোষ প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হোলেন। অত্যুজ্জ্বল তাঁর এই সময়কার ইতিহাস। জ্যোতিষ্কতুল্য এক-একজন অধ্যাপক তখন এই বিদ্যায়তনে এক-এক বিষয়ের অধ্যাপনা করতেন। বিদ্যায় ও চরিত্রে প্রত্যেকেই আদর্শ শিক্ষক। সি. এইচ. টনি তখন এই কলেজের অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করতেন। রো সাহেব ইংরেজি আর বৃদ্ধ বুথ সাহেব গণিতের অধ্যাপক। দেশীয় অধ্যাপকগণের মধ্যে খ্যাতনামা ছিলেন দুইজন—প্যারীচরণ সরকার ও প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী। এঁরা সকলেই যেমন পণ্ডিত তেমনি ছাত্রহিতৈষী ছিলেন। আশুতোষ যে বছরে ভর্তি হন, সেই বছরেই পার্সিভ্যাল সাহেব বিলাত থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে আসেন। পরবর্তী কালে ইনি অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। সেকালে পার্সিভ্যালের মতন জনপ্রিয় শিক্ষক এদেশে খুব কম ছিলেন।

তাঁর এক জীবনীকার আশুতোষের কলেজ-জীবনের একটি সুন্দর চিত্র দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন: "কলিকাতার ছাত্রগণ অনেকেই নিত্য নব সাজে সজ্জিত হইয়া কলেজে আগমন করিতেন। সুনিপুণ ভৃত্যকরকুঞ্চিত যূথিকা-শুভ্রবস্ত্র ও উত্তরীয় ইহাদের অঙ্গশোভা বর্ধন করিত। ইহাদের চকচকে ঝকঝকে নানা বর্ণের পাদুকা হর্ম্যতলে সর্বক্ষণ পরিদৃষ্ট হইত। যুবকগণের পরিহাসবহুল সহাস্য আলাপে সর্বদাই বিদ্যামন্দির প্রতিধ্বনিত হইত। আশুতোষ দেখিয়া শুনিয়া নীরবে আপনার স্থানে উপবেশন করিয়া স্বকার্য করিয়া যাইতেন। তিনি সাধারণ ধুতি-চাদর পরিয়া কলেজে গমন করিতেন। তাঁহার পিতার আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট সচ্ছল হইলেও আশুতোষ কখনো উত্তম উত্তম বসন-ভূষণ পরিধান করিয়া আপন ঐশ্বর্য দেখাইতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার এই সাদাসিধা পোশাক অধ্যাপক বুথ সাহেবের বড়ো ভালো লাগিত, তাহাতে আবার তিনি গণিতশাস্ত্রে অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। অল্পদিনেই আশুতোষ গণিতাচার্য বুথের প্রিয় ছাত্র হইলেন। তিনি আশুতোষের সরল

ব্যবহারে তাঁহার উপর অত্যন্ত প্রীত ছিলেন। অধ্যাপক তাঁহাকে 'Simple man' বলিয়া ডাকিতেন। তিনি ভবানীপুর রসা রোড হইতে প্রতিদিন কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিতে আসিতেন। দূরত্ব নিবন্ধন আট দশজন ছাত্র একখানি বড়ো গাড়িতে যাতায়াত করিতেন।"

উপরি উক্ত বর্ণনার মধ্যে বলা হয়েছে যে, আশুতোষ কলেজে যেতেন ধুতি-চাদর পরিধান করে। কিন্তু এই গ্রন্থের লেখক বিশেষ অনুসন্ধানের পর এই সম্পর্কে একটি নূতন তথ্য অবগত হয়েছেন। তখনকার ছাত্রগণ উড়ানী চাদর নিয়ে স্কুল-কলেজে যেতেন—ইহাই ছিল প্রচলিত প্রথা। এই প্রথায় প্রথম পরিবর্তন নিয়ে আসেন আশুতোষ। তিনি চায়না কোট গায়ে দিয়ে কলেজে যেতেন। ক্রমে এই চায়না কোটের প্রচলন ছাত্রদের মধ্যে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে আশুতোষের নেতৃত্বে একদল ছাত্র চায়না কোট গায়ে দিয়ে কলেজ আসত। অনেকে এই দলের নামকরণ করেছিলেন 'চাদর-নিবারণী সভা'। উত্তরকালে আশুতোষ বলতেন, "আমাদের সময় থেকেই উড়ানী চাদর পরা উঠে যায় আর চায়না কোটের প্রচলন হয়।"

কলেজে প্রবিষ্ট হোয়ে 'মুখচোরা' আশুতোষের একটা অসুবিধা এই হোল যে তিনি কারো সঙ্গে মিশতে পারলেন না। এর আর একটা কারণ ছিল। গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রকে কখনো বাইরের ছেলেদের সঙ্গে মিশতে দিতেন না। এমন অবস্থায় কলিকাতার ছাত্রদের রীতিনীতি, আদব-কায়দা, বাবুগিরি ও বিলাস-প্রিয়তা এবং চপলতা আশুতোষের কাছে বিসদৃশ মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল। তাঁর গম্ভীরপ্রকৃতি ও অনাড়ম্বর সাজসজ্জা তাঁর ও তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম ব্যবধান রচনা করেছিল। এসব সত্ত্বেও একজন মেধাবী ছাত্র হিসাবে তিনি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, আশুতোষ চৌধুরী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, হেরম্ব-চন্দ্র মৈত্র, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী, আবদুর রহিম, সামসুল হুদা প্রভৃতি। উত্তরকালে এঁরা সকলেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে দেশের মুখোজ্জ্বল করেছিলেন।

আশুতোষ বলেছেন, প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হওয়াই তাঁর জীবনের উন্নতির মূল। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ বাংলার অন্যান্য

বহু মনীষী সম্পর্কেই (এঁরা সবাই এখানকার ছাত্র ছিলেন) এই কথাটি প্রযোজ্য। তবে আশুতোষের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এখানে তিনি যে শুধু আদর্শ-চরিত্র ও সুপণ্ডিত অধ্যাপকগণের নিবিড় সান্নিধ্যে এসেছিলেন তা নয়, কলেজের বিশাল গ্রন্থাগারটি ছিল তাঁর কাছে পরম আকর্ষণের বিষয়। রাশি রাশি গ্রন্থ দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হোয়ে তিনি ভাবতেন—এই বিশাল গ্রন্থসমুদ্র কি একজনের জীবনে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব? যে তীব্র অধ্যয়নস্পৃহা বাল্যকালে তাঁর মধ্যে দেখা গিয়েছিল, কলেজে প্রবিষ্ট হবার পর তা যেন তীব্রতর হোয়ে উঠলো। কলেজের অবসর সময়টা তিনি বৃথা যেতে দিতেন না। বস্তুত আশুতোষের সমগ্র জীবনের দিকে তাকিয়ে এই কথা নিঃসংকোচে বলা চলে যে, জীবনের কোনো পর্বেই তিনি বোধ হয় একটি মুহূর্ত বৃথা অতিবাহিত হোতে দেননি। সেই যে তিনি শৈশবে প্রাতঃকালে সূর্যোদয়ের পূর্বে শয্যাত্যাগের উপদেশ তাঁর পিতার কাছ থেকে লাভ করেছিলেন, সেই উপদেশ প্রতিপালনে আশুতোষের মধ্যে একদিনের জন্যও শিথিলতা দেখা যায়নি। এম. এ ক্লাস পর্যন্ত এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। আদর্শ ছাত্র তিনি এমনিতে হননি—রীতিমতো সাধনা করেই হয়েছিলেন। কিন্তু যে কথা বলছিলাম। কলেজের অবসর সময় তিনি বৃথা যেতে দিতেন না, কিংবা অন্যান্য ছাত্রদের মতোন বৃথা গল্প বা আমোদে অতিবাহিত করতেন না। সেই সময়টা তিনি গ্রন্থাগারে কাটাতে ভালোবাসতেন। একখানি প্রয়োজনীয় বই বা পত্রিকা নিয়ে নিভৃতে বসে একান্ত মনে পড়তেন। গণিতের বই বা পত্রিকাই পড়তেন আগ্রহের সঙ্গে।

কলেজে ভর্তি হোয়ে অবধি গণিতের উপর আশুতোষ অধিক মনোযোগ দিতে থাকেন। "গণিতে আমি যে আনন্দ পেতাম এমন আনন্দ বুঝি অন্য কোনো বিষয়ে পেতাম না, আজো একখানা Mathematics-এর নতুন বই পেলে আগ্রহের সঙ্গে পড়ি, এই কথা স্যর আশুতোষকে তাঁর শেষ বয়স পর্যন্ত বলতে শোনা গিয়েছে"—লিখেছেন ডক্টর শিশিরকুমার মিত্র। প্রেসিডেন্সী কলেজের লাইব্রেরিতে বিলেত থেকে গণিতের বিবিধ মাসিক পত্রিকা আসত; বেশির ভাগ পত্রিকাতেই থাকত দেশ-বিদেশের প্রসিদ্ধ গাণিতিকদের মৌলিক গবেষণা-সম্বলিত প্রবন্ধ। সাধারণ ছাত্রের কাছে তা দুর্বোধ্য, কিন্তু আশুতোষ

তো সাধারণ পর্যায়ের ছাত্র ছিলেন না। তাই দেখা যেত লাইব্রেরিতে বসে একাগ্রচিত্তে তিনি পাঠ করছেন সেই পত্রিকাগুলি। পাঠ করতেন আর মনে মনে ভাবতেন, একদিন হয়তো তাঁরই প্রবন্ধ প্রকাশিত হবে এইসব কাগজে। দুর্বার হোয়ে ওঠে আগ্রহ যুবকের মনে, উচ্চাকাঙ্ক্ষায় স্পন্দিত হয় তাঁর সমগ্র সত্তা। গণিতশাস্ত্র সম্পর্কিত বিলাতি ম্যাগাজিনে তিনি তাঁর মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করতে কৃতসংকল্প হোলেন। আবার পরমুহূর্তে তাঁর মনে সংশয় জাগে, মনের ইচ্ছা হৃদয়ে বিলীন হোয়ে যায় এই ভেবে যে, তাঁর লেখা কি এইসব পত্রিকায় আদৌ গৃহীত হবে? তিনি তো এখন মাত্র ফার্স্ট আর্টস ক্লাসের ছাত্র, গণিতের বিশাল রাজ্যে প্রবেশের পূর্ণ অধিকার তো তিনি এখনো পর্যন্ত আয়ত্ত করতে পারেননি। কিন্তু এই উচ্চাভিলাষী ছাত্র কিছুতেই তাঁর মনের ইচ্ছাকে "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে" হোতে দিলেন না। প্রবন্ধ পাঠাবেন, ঠিক করলেন। বছর কয়েক আগে ইউক্লিডের জ্যামিতির Theorem 25-এর একটি নূতন প্রমাণ তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন। কলেজে বুথ সাহেবকে একদিন সেটা দেখালেন। সেই প্রমাণের মৌলিকতা দেখে বুথের মতো গাণিতিক পর্যন্ত বিস্মিত।

—You have done this ?

—Yes, Sir.

—Then I would say you are a mathematical prodigy, এই বলে অধ্যাপক বুথ তাঁর প্রিয় ছাত্রের করমর্দন করলেন।

তখন আশুতোষ উৎসাহী হোয়ে সেটি প্রকাশের জন্য *Cambridge Messenger of Mathematics* নামক সুবিখ্যাত পত্রিকায় পাঠিয়ে দিলেন। যথাসময়ে সেটি ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আশুতোষের বয়স তখন ষোল বছর। ইহাকেই প্রতিভা বলে। এমন প্রতিভাধর পুরুষ উনিশ শতকের বাংলা দেশে দ্বিতীয় আর কেউ ছিলেন না। গণিতে ছাত্রের অনুরাগ ও প্রতিভা দেখে বুথ সাহেব তাঁকে আরো উৎসাহিত করলেন। বললেন, যদি সত্যকারের গণিতজ্ঞ হোতে চাও, তাহলে ফরাসী ভাষা শিক্ষা করো। কথাটা আশুতোষের মনে লাগলো। সত্যই তো অঙ্ক শাস্ত্র ভালো করে শিখতে হোলে ফরাসী ভাষা জানা দরকার। গণিতের অবতার লাপ্লাস। তাঁর

সুগভীর চিন্তা ও গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থগুলি গণিতশাস্ত্রে নবযুগ এনেছে। কিন্তু তাঁর সব বই-ই ফরাসী ভাষায় লিখিত। এ ছাড়া, গণিতের অন্যান্য অমূল্য গ্রন্থ যা আছে তার অধিকাংশই ঐ ভাষায় রচিত। অতএব এ বিদ্যায় পারঙ্গম হোতে হোলে ফরাসী ভাষা শিখতেই হয়। আশুতোষের প্রতিভার একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, যখন যে জিনিস তিনি করবেন ঠিক করেছেন, সেই সংকল্প সাধিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি নিরস্ত হোতেন না। এ ক্ষেত্রেও তাই হোল। নিজের চেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সুন্দরভাবে ফরাসী ভাষা শিখলেন। এরপর তিনি লাতিন ও জার্মান ভাষা দুটিও স্বীয় চেষ্টায় আয়ত্ত করেছিলেন। বিধিদত্ত সেই প্রতিভার কাছে পৃথিবীর কোনো বিষয়ই বুঝি অনায়ত্ত ছিল না। কথিত আছে, প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠ কালেই আশুতোষ এম. এ. পরীক্ষার গণিত শাস্ত্রের নির্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকগুলির বেশির ভাগ পড়ে ফেলেছিলেন। গণিতে আশুতোষ প্রতিভার স্বাক্ষর আছে তাঁর রচিত 'কণিক্‌সেকৃশন্' বইখানিতে।

গণিত তাঁর প্রিয় ছিল, তাই বলে অন্যান্য বিষয়ের প্রতি আশুতোষ কখনো উদাসীন ছিলেন না। ইংরেজি সাহিত্য, সংস্কৃত, বিজ্ঞান, ইতিহাস সবই তিনি সমান আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করতেন। যেমন তেমন করে পড়া নয়, সে ছিল তাঁর রীতিমতো অধ্যয়ন। প্রগাঢ় এবং একনিষ্ঠ। অধীত বিদ্যা সম্পূর্ণরূপে অধিগত করতেন। আশ্চর্য ছিল তাঁর স্মৃতিশক্তি। এর একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ্য। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে রবসন সাহেব ইতিহাস পড়াতেন। ছেলেবেলা থেকেই আশুতোষ ইতিহাস পাঠ করতে ভালোবাসতেন। রবসনের অধ্যাপনা প্রণালী ছিল স্বতন্ত্র ধরণের। ক্লাসে এসে পাঠ্য পুস্তকখানি টেবিলের উপরে রাখতেন, খুলবার দরকার হোত না। মুখে মুখে গল্প বলে যেতেন। ছেলেরা তা মনোযোগ দিয়ে শুনত। তারপর তিনি ছাত্রদের বলতেন—'Now my dear boys, write it in your own words" একদিন অধ্যাপক রবসন কক্সের বই* থেকে একটা অধ্যায় ছাত্রদের বুঝিয়ে দিলেন এবং তখনই সেটা লিখে দেবার জন্য তাদের বললেন। সাহেব আশুতোষের উত্তর পত্র দেখে বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ।

---

* *Mythology of Ancient Greece* : Cox.

—You have copied it word by word.

—Certainly not Sir.

—I say, you have copied it

—I say, I have not.

সমস্ত ক্লাস সচকিত। ছাত্রেরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। তখন আশুতোষ বুঝিয়ে বললেন যে, বাড়িতে অনেকদিন আগে তিনি কন্সের এই বইখানা পড়েছিলেন আর তিনি যা পড়েন তা-ই তাঁর মনের মধ্যে গাঁথা হোয়ে যায়। তবু সন্দেহ দূর হয় না সাহেবের। তিনি আরো দু-একবার পরীক্ষা করে বিস্মিত হোলেন এবং অবশেষে বললেন: "I have seldom come across such wonderful memory." ঘটনাটি অচিরকাল মধ্যেই কলেজে কানাকানি হয় এবং সেই থেকে অধ্যক্ষ ও সকল অধ্যাপকের দৃষ্টি আশুতোষের উপর বিশেষভাবে নিবদ্ধ হোতে থাকে। এইসময়ে তিনি চসারও (Chaucer) পড়ে শেষ করে ফেলেছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যের আদিমতম লেখক চসারের বই তখন এম. এ. ক্লাসের পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট ছিল। একদিন তাঁরই এক সহপাঠী তাঁকে চসার পড়তে দেখে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেন, "আশু, তুমি চসার পড়ছ কেন? এম. এ. ক্লাসে তো এ বই পড়ান হয়।" উত্তরে আশুতোষ বলেছিলেন, "পড়লে ক্ষতি কি। একদিন তো আমি ইংরাজিতে এম. এ. পড়ব।" এইভাবেই তিনি সকল বিষয়ে তাঁর সহপাঠীদের চেয়ে অগ্রণী ছিলেন।

১৮৮৪। আশুতোষ 'এ' কোর্স নিয়ে বি. এ. পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করলেন। ইংরেজি, অঙ্ক, সংস্কৃত, দর্শন ও ইতিহাস—পাঁচটি বিষয়ের তিনটিতে তিনি প্রথম হয়েছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে একশো নম্বরের মধ্যে ছিয়ানব্বই পেয়ে পরীক্ষককে চমৎকৃত করে দিয়েছিলেন। আজ পর্যন্ত দর্শনে এত বেশি নম্বর আর কেউ লাভ করতে পারেনি। "ঐকান্তিক যত্ন, চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের শুভফল প্রাপ্ত হইয়া তিনি বিমল আনন্দ লাভ করিলেন। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধব সকলেই এতদিনে আশুতোষের গুণের অনুরূপ পুরস্কার হইয়াছে মনে করিয়া সুখী হইলেন।" বি. এ. যখন পড়েন তখন তিনি আর সেই 'মুখচোরা' বা লাজুক-প্রকৃতির ছাত্র নন। কলেজের বিতর্ক সভায় এইসময়ে যোগদান করে তিনি সবাইকে বাগ্মিতায় মুগ্ধ করেন। একজন জনপ্রিয় ইংরেজ অধ্যাপক মারা

গেলে নিজে অগ্রণী হোয়ে চাঁদা তুলে লাইব্রেরি হলে একটি মর্মর ফলক স্থাপন করেন এবং শোকসভায় একটি চমৎকার বক্তৃতা করে সবাইকে বিস্মিত করেন। কিন্তু তাঁর এই সময়কার ছাত্রজীবনের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারামুক্তিতে তাঁকে অভিনন্দিত করবার জন্য ছাত্রদের নিয়ে একটি সভা সংগঠন করা ও তাতে বক্তৃতা দেওয়া।*

১৮৮৫। আশুতোষ এম. এ. পরীক্ষায় সর্বোচ্চস্থান লাভ করলেন। তাঁর বিষয় ছিল গণিত এবং তাঁর অধ্যাপক ছিলেন উইলিয়াম বুথ সাহেব। ১৮৮৬ সালে দ্বিতীয়বার বিশুদ্ধ গণিত, মিশ্র-গণিত ও পদার্থ-বিদ্যা—এই তিন বিষয়ে তিনি এম. এ. পরীক্ষা দিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আশুতোষের সময় থেকেই একাধিক বিষয়ে এম. এ. পরীক্ষা দেবার রীতি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তিত হয়। তিনি P. R. S. (প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার) হবেন, এই উচ্চাভিলাষ আশুতোষ বরাবর পোষণ করতেন। "তিনি যখন বি. এ. ক্লাসের ছাত্র তখন (১৮৮৩) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারশিপের পরীক্ষা তুলিয়া দিয়া ঐ অর্থে বিলাতে ছাত্র পাঠাইবার এক প্রস্তাব হয়। যুবক আশুতোষের মন এই পরীক্ষা তুলিয়া দিবার প্রস্তাবে নিতান্ত পীড়িত হইল। কিন্তু তিনি সহজে দমিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পরীক্ষা-সংস্কার সম্বন্ধে এক পুস্তিকা প্রচার করিলেন। কিন্তু তাহাতে নিজের নাম দিলেন না। সিণ্ডিকেটের সভ্য মহোদয়গণ এই পুস্তক পাঠ করিয়া পরীক্ষা তুলিয়া দিবার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন।" ১৮৮৬ সালেই আশুতোষ প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ স্টুডেন্টশিপ পরীক্ষা দিয়ে বৃত্তিলাভ করলেন। পরীক্ষকেরা আশুতোষের কাগজ দেখে অত্যন্ত প্রীত হন।

স্টুডেন্টশিপ পেয়েই এম.এ. পরীক্ষাতে গণিতের পরীক্ষক নিযুক্ত হবার জন্য তিনি দরখাস্ত করেন। সিনেট তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। তিনি ১৮৮৭ সালে এম.এ. পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হলেন। ভারতবাসীর মধ্যে আশুতোষই সর্বপ্রথম গণিতের মতো কঠিন বিষয়ে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ.র পরীক্ষক নিযুক্ত হন। সেকালে এম. এ. পাস করেই এম.এ.র পরীক্ষক হওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু সিণ্ডিকেটের তদানীন্তন প্রভাবশালী সদস্য স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

---

* লেখকের 'রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ' দ্রষ্টব্য।

আশুতোষের অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পেয়ে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করতে একটুও ইতস্তত করেননি।

তাঁর পরীক্ষক ছিলেন অধ্যাপক ইলিয়ট, গিলিল্যাণ্ড ও বুথ। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মিনিট' বইতে এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে : "The Examiners for the Premchand Roychand Studentship recommend that the Studentship be awarded to Ashutosh Mukerjee, M. A., Presidency College. He took up Pure Mathematics, Mixed Mathematics and Physics. In the first two subjects, he passed a brilliant examination, and in the third he acquitted himself very creditably."* তিনি P. R. S. পরীক্ষা ও দ্বিতীয় বার এম.এ. পরীক্ষা একই সঙ্গে দিয়েছিলেন। যে বছর তিনি বি.এ. পাস করেন সেই বছর থেকেই তিনি সিটি কলেজে আইন (B. L) পড়তে আরম্ভ করেন এবং আইনের ছাত্র হিসাবেও তিনি কি রকম কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তা ১৮৮৫ সালে অনুষ্ঠিত কনভোকেশনে ভাইস-চ্যান্সেলার ইলবার্ট সাহেবের ভাষণ থেকে জানা যায়। ঐ ভাষণে তিনি ছাত্র হিসাবে আশুতোষের প্রশংসা করে যা উল্লেখ করেছিলেন তা অদ্যাবধি স্মরণীয় হোয়ে আছে।

গণিতে তাঁর অসামান্য প্রতিভাই আশুতোষকে ছাত্রজীবনে অমন খ্যাতিমান করে তুলেছিল। তাঁর এই গণিত-প্রীতি সম্পর্কে একটি চমৎকার কাহিনী আছে। সেটি উল্লেখ করেই আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করব। ঘটনাটি ১৮৮৭ সালে ঘটেছিল এবং এই ঘটনা উপলক্ষ করেই তার সঙ্গে হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি মিস্টার জে. ওকেনেলির পরিচয় হয়। এই পরিচয় তাঁর পক্ষে হিতকর হয়েছিল। বিচারপতি ওকেনেলি একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁরও গণিতে অনুরাগ ছিল। সেই সময় একদিন একটি নিলামের সংবাদ আশুতোষ কাগজে পাঠ করলেন। যেমন তেমন নিলাম নয়; একজন বিখ্যাত এবং উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীর বহুযত্নে সংগৃহীত অমূল্য গ্রন্থরাজি নিলামে বিক্রয় হবে। ইনি ছিলেন তখনকার সার্ভেয়ার জেনারেল্। গণিতশাস্ত্রের প্রতি তাঁর অনুরাগের কথা আশুতোষের জানা ছিল। ১৮৮৭ সালে তাঁর

* *Calcutta University Minutes* for 1886-87.

মৃত্যুর পরে তাঁরই লাইব্রেরি নিলামে বিক্রয় হবে শুনে আশুতোষ যারপর নাই উৎসুক হোলেন। নিলামের নোটিস থেকে তিনি জানতে পারলেন যে ঐসব গ্রন্থরাজির মধ্যে ফরাসী ভাষায় লিখিত উচ্চাঙ্গ গণিতের দুইখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থও আছে। যেমন করেই এবং যত টাকা লাগুক, ঐ বই সংগ্রহ করতে হবে—ঠিক করলেন আশুতোষ। কলিকাতায় তখন একটি বিলাতি প্রতিষ্ঠান মারফৎ এইসব নিলামের ক্রয়-বিক্রয় হোত। নিলামের দিন আশুতোষ যথাসময়ে উপস্থিত হোলেন। নিলাম আরম্ভ হয়েছে এমন সময় আশুতোষ দেখলেন এক জন বিশিষ্ট ইংরেজ রাজপুরুষ এসে, যে লোকটি নিলাম ডাকছিল, তাকে দু'একটি কথা বলে চলে গেলেন। সবশেষে ঐ গণিত গ্রন্থ দুখানির পর পর 'ডাক' আরম্ভ হোল। আশুতোষ যত দাম বলেন নিলামকারী তার চেয়ে বেশি দাম বলেন। দাম বেড়েই চলে। আশুতোষ কিছুতেই আর কিনতে পারলেন না। সেই পুরাতন জরাজীর্ণ গণিত গ্রন্থ দুখানি ২৫২৲ টাকায় কিনেছিলেন ঐ ইংরেজ রাজপুরুষ—তিনিই এসে নিলামকারীকে বলে গিয়েছিলেন যে দামেই হোক না কেন, বইদুখানা যেন তাঁর জন্য রাখা হয়। ঐ রাজপুরুষ বিচারপতি ওকেনেলি। তিনি যখন নিলামকারীর কাছ থেকে জানতে পারলেন যে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নামে এক বাঙালী যুবক ঐ বই দুখানির জন্য ২৫০৲ টাকা মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন, তখন তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। তিনি ঐ যুবকের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং তৎকালীন খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষের নিকট তাঁর বিষয়ে অনুসন্ধান করেন। আশুতোষ তখন তাঁরই শিক্ষানবিশ ছিলেন। তারপর দুজনে দুজনের সঙ্গে পরিচিত হোলেন। এই পরিচয় এমন অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়েছিল যে, এই ওকেনেলি সাহেব আশুতোষের একজন অকৃত্রিম সুহৃদ ও পরম হিতৈষী বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন।

সংক্ষেপে, ইহাই আশুতোষের ছাত্রজীবন। ছাত্রজীবনে তিনি যে পরিমাণ বৃত্তি ও পদক লাভ করেছিলেন তা আজ পর্যন্ত যে কোনো ছাত্রের ঈর্ষার বিষয় হোয়ে আছে। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, এমন দেদীপ্যমান ছাত্র বাংলা তথা ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয়টি দেখা যায়নি। পুত্রকে চূড়ান্ত শিক্ষা দেবেন—এই ছিল গঙ্গাপ্রসাদের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা। পুত্রের

জীবনে পিতার আজীবনের প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছিল—গঙ্গাপ্রসাদের পুত্র পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বসভায় উচ্চ আসন লাভ করেছিলেন। আশুতোষের অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা স্মরণ করে বাঙালী জাতির বুক চিরদিন গর্বে ভরে উঠবে—যেমন ভরে ওঠে বিদ্যাসাগরের অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা স্মরণ করে। আটচল্লিশ বছরের ব্যবধানে এই দুই প্রতিভাধরের জন্ম, উনিশ শতকের বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে দুইটি অবিস্মরণীয় ঘটনা হিসাবে গণ্য হবার দাবী রাখে। নিঃসন্দেহে বিদ্যাসাগর ও আশুতোষ দুজনেই প্রকৃত কর্মবীরের ভূমিকা নিয়ে বাংলা দেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

॥ তিন ॥

আশুতোষ ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধাতাপুরুষ।

তাঁর সুমহতী কীর্তি—বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার প্রবর্তন।

বস্তুত এই জ্ঞান-পথিকের জীবনের একটি বড়ো অংশ জুড়ে আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠন ও পরিচালনার ইতিহাস। সেই ইতিহাসের পটভূমিকায় তাঁর প্রতিভার সম্যক পরিচয় পেতে হোলে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মকথা সংক্ষেপে আলোচনা কবতে হয়।

ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষার ইতিহাস সম্পর্কে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁদের কাছে এই তথ্য অজানা নয় যে, বাংলা এবং বাঙালীই সর্বপ্রথম মনে-প্রাণে ইংরেজি শিক্ষাকে গ্রহণ করেছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সম্পর্কে সরকারীভাবে প্রথম পরিকল্পনা গৃহীত হয় ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে। সরকারী বিবরণ থেকে এই বিষয়ে আমরা জানতে পারি যে, ঐ বৎসরে 'কাউন্সিল অব এডুকেশন' সর্বপ্রথম কলিকাতায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তখন কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন এই কয়েকজন, যথা—এফ. মিলেট, জেমস আলেকজাণ্ডার, সি সি. এগার্টন, রসময় দত্ত, প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং ডক্টর এফ জে. মোয়াট। কাউন্সিল এই অভিমত প্রকাশ করলেন:

"On account of the advanced state of education in Bengal it is not only expedient and advisable but a matter of strict justice and necessity that some mark of distinction should be conferred on the students." সকলেই জানেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার আগে এদেশের ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থায় কোনোরকম উপাধিদানের ব্যবস্থা ছিল না। হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভই ছিল বাঙালীর পক্ষে চূড়ান্ত শিক্ষালাভ। কিন্তু সদ্য জাগ্রত বাঙালীর জ্ঞানপিপাসা

যেন হিন্দুকলেজীয় শিক্ষায় আর তৃপ্তিলাভ করতে পারছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর সূচনাতেই বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার অভ্যুদয়। এই আভ্যুদয়িক রচনা করেন সর্বপ্রথম রাজা রামমোহন রায়। ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে লর্ড আমহার্স্ট কে তিনি যদি সেই ঐতিহাসিক পত্রখানি না লিখতেন তাহলে এদেশে যত শীঘ্র পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়েছিল, অত তাড়াতাড়ি সেটা হোত কিনা সন্দেহ। এই প্রসঙ্গে আরো একজন মহাত্মার নাম স্মর্তব্য। তিনি ডেভিড হেয়ার। এই দুই ব্যক্তির চিন্তা-ভাবনারই পরিণতি হিন্দু কলেজ। ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে এই হিন্দু কলেজ স্থাপিত হবার দশ-এগার বছরের মধ্যেই একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা সরকারকে চিন্তা করতে হোল। কেন? হিন্দু কলেজ স্থাপিত হবার আট বছর পরে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক বিলাতের কাউন্সিলে এই মর্মে এক রিপোর্ট পাঠালেন যে, বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষা দ্রুত প্রসার লাভ করছে। মেকলেও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করলেন। এর তিন বছর বাদেই সরকারী ভাবে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হোল যে,"All the funds appropriated for the purposes of education would be best employed on *English education* alone." এই সিদ্ধান্তেরই পরিণতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। অবশ্য ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের এই সিদ্ধান্ত রূপ নিল বাইশ বছর পরে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে।

যাঁরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তি ও বিকাশের সম্পূর্ণ এবং ধারাবাহিক ইতিহাস জানতে ইচ্ছা করেন তাঁরা যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থখানি অবশ্য পাঠ করেন। খ্যাতনামা যে কয়জন বাঙালী এই নবগঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' (fellow) নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, রমাপ্রসাদ রায় ও মৌলভি মহম্মদ ওয়াজী। বিদ্যাসাগর ও মৌলভি ওয়াজী দুজনে যথাক্রমে সংস্কৃত কলেজ ও কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন আর রামগোপাল ছিলেন কাউন্সিল অব এডুকেশনের অন্যতম সদস্য। ১৮৫৭, ২৪শে জানুয়ারি তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় যথারীতি স্থাপিত হয়। মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় দুইটির জন্মকালও এই সময়ে। ১৮৫৭ সালের এণ্ট্রান্স পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৪৪ আর পাঁচ বছর পরে ১৮৬২ সালে দেখা

গেল যে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১,১১৪ জনে দাঁড়িয়েছে। তখনো পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবন তৈরি হয়নি। পরীক্ষা হোত টাউন হলে। ময়দানে তাঁবু খাটিয়েও পরীক্ষা গৃহীত হোত সেই সময়ে। রেজিষ্ট্রারের অফিস ছিল ক্যামাক স্ট্রীটে। সিনেট বা সিণ্ডিকেটের মিটিং বসতো ভাইস-চ্যান্সেলারের নিজস্ব বাড়িতে, কখনো বা টাউন হলে। এই রকম নানা অসুবিধার মধ্য দিয়ে যখন বিশ্ববিদ্যালয় চলছিল তখন এর জন্য একটি নিজস্ব ভবন নির্মাণের কথা সরকার চিন্তা করলেন। অতঃপর হিন্দু কলেজের সন্নিকটবর্তী এবং গোলদিঘির পশ্চিম দিকে বিরাট ভূখণ্ডের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবন নির্মিত হয়। ইহা ১৮৭২ সালের কথা। ছ'বছর লেগেছিল সিনেট হলটি তৈরি করতে আর মোট খরচ পড়েছিল প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা। ১৮৭৮ সালের ১২ মার্চ তারিখ অনুষ্ঠানিকভাবে সিনেট হলের উদ্বোধন হয় এবং ঐ বছরের কনভোকেশন সিনেট হলেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই বিশাল স্তম্ভবিশিষ্ট ও গথিক স্থাপত্যরীতিতে তৈরি সিনেট হলের চিহ্নমাত্র আজ আর অবশিষ্ট নেই। আজ শুধু ছবিতে তাকে দেখা যায়। কালের প্রয়োজনে কালেরই একটি দিক্-চিহ্নকে অবলুপ্তির পথে মিলিয়ে যেতে হয়েছে। আজ তাই তো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মারকগ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে: The year of the Centenary of the University may have to witness its demolition to yield place to a new ." নূতনের দাবী পুরাতনকে এইভাবেই মেনে নিতে হয়। ইহাই ইতিহাসের নিয়ম।

১৮৫৭ থেকে ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দ—এই পঁচিশ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সংগঠনের যুগ বলে চিহ্নিত হয়েছে। এই সময়ে যেসব বিখ্যাত দানবীরের অর্থদানে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল পরিপুষ্ট হয়েছিল তাঁদের মধ্যে পার্শী ধনকুবের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি এককালীন দুই লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-'ফেলো' প্রসন্নকুমার ঠাকুর আইন অধ্যাপনার জন্য প্রচুর অর্থ দান করেন। তাঁর ঐ দানেই বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক'-এর পদ সৃষ্ট হয়েছিল। অন্যান্য দাতাদের

মধ্যে আরো কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য, যথা—ঈশানচন্দ্র বসু, হরিশচন্দ্র চৌধুরী, মহারাজা নীলমণি সিং দেও বাহাদুর, অম্বিকাচরণ চৌধুরী প্রভৃতি। এ ছাড়া, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্মৃতিরক্ষার্থ যে তহবিল সংগৃহীত হয়, যথা আলেকজান্দার ডাফ মেমোরিয়াল ফাণ্ড, দ্বারকানাথ মেমোরিয়াল ফাণ্ড, মোয়াট টেষ্টিমোনিয়াল ফাণ্ড, হার্সেল টেষ্টিমোনিয়াল ফাণ্ড, হেনরি উড্রো মেমোরিয়াল ফাণ্ড—সেইসব তহবিল থেকেও কিছু অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে অর্পণ করা হয়। বাইরের এইসব দান থেকে বোঝা গেল যে, "The University was slowly but steadily creating confidence in the minds of those who cared for higher English education and was attracting private benefactions, big and small, in increasing numbers." বস্তুত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সরকারী অর্থানুকূল্যে যতটা না গড়ে উঠেছে তার সহস্রগুণে বেশি ব্যক্তিগত দানেই এর সম্যক উন্নতি সাধিত হয়েছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স যখন পঁচিশ বছর পূর্ণ হোল তখন এর রূপটা স্পষ্ট হয়ে উঠল এবং এর গঠনতন্ত্র যেন কতকটা অবয়ব বিশিষ্ট হয়ে উঠল। বিভিন্ন পরীক্ষা সম্পর্কে বিধিগুলি ক্রমেই সম্পূর্ণতালাভ করতে লাগল এবং বিভিন্ন বিষয়ে পঠন-পাঠনের জন্য গঠিত ফ্যাকাল্টিগুলি সুপরিচালিত হোতে থাকে। ১৮৬৭ সালে প্রথম প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারশিপ লাভ করেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নামক প্রেসিডেন্সী কলেজের জনৈক মেধাবী ছাত্র; ইনি তিনটি বিষয়ে মোট ৩০০০ নম্বরের মধ্যে পরীক্ষায় ১৬১৫ নম্বর পেয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আর আমাদের আলোচনার পাত্র আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এক ব্যক্তি নন। প্রথম এম এ. পরীক্ষা গৃহীত হয় ১৮৬১ সালে। সে বৎসর মাত্র একজন পরীক্ষার্থী ঐ পরীক্ষা দেন, কিন্তু তিনি উত্তীর্ণ হতে পারেননি। পরবর্তী বৎসরে এম. এ. পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল তিনজন এবং তিনজনেই অকৃতকার্য হন। ১৮৬৩ সালে সাতজন ছাত্র এম এ পরীক্ষা দেন এবং ছয়জন উত্তীর্ণ হন। এই ছয়জনই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বারের এম এ বলে গণ্য হয়ে থাকেন। ঐ বৎসরই বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম এম. ডি. পরীক্ষা গৃহীত হয়। চন্দ্রকুমার দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম. ডি.।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম চ্যান্সেলার লর্ড ক্যানিং আর প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলার স্যর জেমস উইলিয়ম কলভিল। ইনি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন এবং এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতীক-চিহ্নটি গত একশত বৎসরের মধ্যে ছয় বার পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান প্রতীকে পরিণত হয়েছে। তবে প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এর যে আদর্শ বা motto ছিল 'Advancement of Learning'—তার আর কোনো পরিবর্তন হয়নি। ১৯৩৫ সাল সর্বপ্রথম ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সূর্য ও পদ্মাঙ্কিত প্রতীকটি গৃহীত হয়। তখন ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বর্তমানে সেই প্রতীকই কিছুটা পরিবর্তিত ভাবে গৃহীত হয়েছে। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, প্রথম পনর বছর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিজস্ব কোনো ভবন ছিল না, কাজেই তখনো পর্যন্ত এর নিজস্ব গ্রন্থাগার গড়ে ওঠেনি। গ্রন্থাগারের জন্য না ছিল অর্থ, না ছিল উপযুক্ত স্থান। ১৮৭০ সালে উত্তরপাড়ার বদান্য ও বিদ্যোৎসাহী জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের দানে বিশ্ববিদ্যালয়েব এই অভাবটি সর্বপ্রথম মোচন হয়। ঐ বৎসর তিনি বিশেষভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব একটি গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিন হাজার টাকা সিণ্ডিকেটের হস্তে দান কবেন। গ্রন্থাগারের সূচনা এইভাবেই সেদিন হয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দী শেষ হতে যখন মাত্র দুই দশক বাকি তখন দেখা গেল যে, বাংলা তথা ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা দ্রুত প্রসার লাভ করেছে এবং এর ফলে দেশের সমাজ-জীবনে ও রাজনীতিতে কিছুটা পরিবর্তনও দেখা দিতে শুরু করেছে। এই পটভূমিকাতেই তদানীন্তন ভারত সরকার সমগ্র শিক্ষা বিষয়টি একবার অনুধাবন করে দেখতে চাইলেন। "Ripon's Government felt that a broad survey of the entire educational structure in the country was called for." ইহারই পরিণতি, আধুনিক ভারতবর্ষের শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রথম কমিশন। ইতিহাসে ইহাই 'হাণ্টার কমিশন' নামে উল্লিখিত হয়েছে। ১৮৮২, ৩রা ফেব্রুয়ারি, ভারত-সরকার

'ইণ্ডিয়ান এডুকেশন'—এই নামে একটি কমিশন গঠন করেন। উইলিয়াম হাণ্টার ছিলেন এই কমিশনের সভাপতি আর সদস্যদের মধ্যে ছিলেন, বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা এ. ডাব্লিউ. ক্রফট, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং ও সৈয়দ আমেদ। শেষোক্ত ব্যক্তি কমিশনে থাকতে অস্বীকৃত হওয়ায় পরে তার স্থলে যিনি গৃহীত হন তাঁর নাম সৈয়দ মামুদ। হাণ্টার কমিশনের তদন্তের বিষয় ছিল প্রাথমিক শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় নয়। কমিশনের রিপোর্টে উচ্চশিক্ষা প্রসার সম্পর্কে সরকারী ব্যয়সংকোচ নীতিকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই সুপারিশের প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ওপর এসে পড়ল। হাণ্টার কমিশনের রিপোর্ট থেকে একটা তথ্য জানা গেল যে, সমকালীন ভারতবর্ষে অন্যান্য প্রদেশের, বিশেষ করে পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলের তুলনায়, একমাত্র বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার হার খুবই কম।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তখনো পর্যন্ত কেবলমাত্র পরীক্ষাগ্রহণের কেন্দ্র মাত্র ছিল—এখানে উচ্চশিক্ষার পঠন-পাঠন তেমন আশাতীতভাবে হোত না। দেশীয় ভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসাবে স্বীকৃতি দেবার কথা তখনো কর্তৃপক্ষ চিন্তা করেননি। ১৮৯০ সালে স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নির্বাচিত হলেন (ইনিই কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় ভাইস-চ্যান্সেলার) তখন তিনি এই দুটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেন। ১৮৯১ সালের কনভোকেশনে তিনি দেশীয় ভাষা প্রসঙ্গে এই মন্তব্যটি করেন: "I deem it not merely desirable, but necessary, that we should encourage the study of those Indian Vernaculars that have a literature, by making them compulsory subjects of our examinations in conjunction with their kindred classical languages. The Bengali language has now a rich literature that is well worthy of study." গুরুদাসের এই আকাঙ্ক্ষাকে সফল করেছিলেন আশুতোষ। বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশীয় ভাষার পঠন-পাঠনের প্রশ্নটা তুলে স্যর গুরুদাস সেদিন যথেষ্ট দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এটাকে দেশপ্রেম-জাত আবেগ মনে করলে ভুল হবে—

একটা দূরবিসর্পী বাস্তবদৃষ্টির পরিচয় ছিল তাঁর এই চিন্তার মধ্যে। তিনি সেদিন দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছিলেন: "I firmly believe that we cannot have any thorough and extensive culture as a Nation, unless knowledge is desseminated through our own vernacular...the dark depths of ignorance all round will never be illuminated until the light of knowledge reaches the masses through the medium of their own vernaculars"

গুরুদাসের এই অভিমত সমর্থন করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং চন্দ্রনাথ বসু। এর বারো বছর পরে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে যে কমিশন গঠিত হয়, সেই কমিশন এই মর্মে দুঃখ প্রকাশ করেন যে, দেশীয় ভাষার পঠন-পাঠন সম্পর্কে বিশ্ববিদ্য লয়গুলি যথেষ্ট মনোযোগী নন এবং বহু গ্রাজুয়েটকে দেখা যায় যে তাদের মাতৃভাষা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার তেত্রিশ বছর পরে এর নিয়মাবলীর সংশোধনের প্রস্তাব হয়। আবো দশ বছর এই ভাবে কেটে যায় এবং তারপক ১৯০২ সালে 'বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন' গঠিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলাব মিস্টার টমাস র‍্যালে এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন। এই কমিশন তাই 'র‍্যালে কমিশন' নামে ইতিহাসে উল্লিখিত হয়ে থাকে। 'হাণ্টার কমিশন' থেকে এই 'র‍্যালে কমিশন' আকারে ও প্রকারে পৃথক ছিল। এই কমিশনেব পাঁচজন সদস্যেব মধ্যে একজনও হিন্দু শিক্ষাবিদকে নেওয়া হয়নি। এই নিয়ে সংবাদপত্র ও জনসভায় প্রবল আন্দোলন হয়।* তখন লর্ড কার্জনের আমল। তিনি প্রায় শেষ মুহূর্তে জনমতের চাপে পড়ে, স্যর গুরুদাসকে এই কমিশনের অন্যতম সদস্য হিসাবে গ্রহণ করেন। এ ছাড়া, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একজন করে স্থানীয় সদস্য গ্রহণ করা হয়; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আশুতোষকে গ্রহণ করা হয়। তিনি তখন সিণ্ডিকেটের অন্যতম সদস্য ছিলেন। তদন্তের সমগ্র বিষয়টি মাত্র চারমাসে শেষ হয়। এই কমিশনের সর্বপ্রধান সুপারিশ এই ছিল যে, অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কেবলমাত্র পরীক্ষাগ্রহণের কেন্দ্র-স্বরূপ হয়ে থাকলে চলবে না। চ

* লেখকের 'রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ' দ্রষ্টব্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কমিশনের অধিকাংশ সভ্যের সঙ্গে স্যর গুরুদাসের কতকগুলি প্রধান বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় তিনি একটি স্বতন্ত্র মন্তব্য লেখেন। উহা রিপোর্টের সঙ্গেই প্রকাশিত হয়। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্র যাতে সংকীর্ণতর না হয়, সুযুক্তি সহকারে তিনি সেই মন্তব্যই করেছিলেন। এই মন্তব্যটি লর্ড কার্জন পছন্দ করেননি। কথিত আছে, এই জবরদস্ত লাট এক গোপনীয় ডেসপ্যাচে এই কথাটি লেখেন : "I do not cherish respect for Mr. Gooroodas Banerjee and his unworthy client the Calcutta student." গুরুদাস তখনো 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হননি—১৯০৪ সালে তিনি ঐ উপাধি লাভ করেন। বেঙ্গলী পত্রিকায় সুরেন্দ্রনাথ কার্জনের এই অশোভন মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। যাই হোক, গুরুদাসের এই স্বতন্ত্র 'মিনিট' দ্বারা দেশের কিছু উপকার হয়েছিল।

র‍্যালে কমিশনের রিপোর্টে দেশের মধ্যে উচ্চ শিক্ষাপ্রসারের ধারাকে সংকুচিত করবার জন্য বিশেষ কয়েকটি সুপারিশ ছিল। দেশে তখন একটি-দুটি করে অনেকগুলি বেসরকারী কলেজ স্থাপিত হয়েছে এবং দিন দিন ঐসব কলেজে ছাত্রসংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কমিশন এই কলেজগুলি সম্পর্কে আট দফা কঠিন শর্ত আরোপ করতে চাইলেন। এই শর্তগুলির ভালো-মন্দ দুই দিকই ছিল। কমিশনের অন্যতম সদস্য, আলেকজান্দার পেডলার দিল্লীর আইন পরিষদে (তখনকার নাম Imperial Legislative Council) ইউনিভার্সিটি বিলের আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন : "We have had an enormcus growth of colleges and schools without a corresponding growth of what may be called highly educated and trained tutors and professors to carry on the work...unless something is done to raise the conditions of the colleges and those away in the Mofussil, such a thing as high education in Bengal will degenerate almost into a sham." সেদিন এই মন্তব্যের প্রয়োজন ছিল। কমিশনের সুপারিশের বিরুদ্ধে দেশে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল এবং সংবাদপত্র ও জনসভায় সেই বিক্ষুব্ধ মনোভাব কি ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল তার বিবরণ রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের আত্মচরিতে আছে।

কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে ভারতসরকার যথাসময়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অভিমত চেয়ে পাঠালেন। ১৯০৩ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চমাসে অনুষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের এক বিশেষ সভায় এই রিপোর্ট আলোচিত হয় এবং সিনেট প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করেন। কিন্তু কোনো প্রতিকূল সমালোচনার নিকট মাথা নত করবার মতো পাত্র ছিলেন না লর্ড কার্জন। ১৯০৩, ৪ঠা নভেম্বর। ব্যবস্থা পরিষদে ইউনিভার্সিটি বিল উঠল। যথাসময়ে বিল আইনে পরিণত হোল। ইহাই 'দি ইউনিভার্সিটিজ অ্যাক্ট, ১৯০৪।' ১৮৫৭ সালে যে আইনের বলে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল, এইভাবে তিপ্পান্ন বছর পরে সেই আইন সংশোধিত হয়ে এই নূতন আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই নূতন আইনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা যে অনেকখানি ব্যাহত হবে, এমন আশঙ্কা সেদিন যাঁরা প্রকাশ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আশুতোষ। তিনি তখন সিণ্ডিকেটের একজন সভ্য। গোখলেও এই বিলের প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন সেদিন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আশুতোষের প্রত্যক্ষ সংযোগ তাঁর খুল্লতাত রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সময় থেকে। এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন: "রাধিকাপ্রসাদ ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে সিনেটের সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন এবং তদবধি তাঁহার নিকট বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত যে সমস্ত কাগজ-পত্র, পুস্তক ও 'মিনিট' আসিত, তদীয় গৃহে সেই সকলের এক অতীব আগ্রহ-শীল পাঠক জুটিয়াছিলেন, যিনি নীরবে অবসরকালে সেগুলি একরূপ গ্রাস করিয়া ফেলিয়া ভবিষ্যৎ কীর্তি-মঠ গড়িবার পরিকল্পনা করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আশুতোষ।" এর সাত বছর পরে আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সভ্যপদে নিযুক্ত হন। ইহা ১৮৮৯ সালের কথা। তাঁর অন্য এক জীবনচরিতকার এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: "যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন কথা এমন করিয়া পাঠ করিয়াছেন, যাহার সকল কাগজপত্র পড়িতে পড়িতে অন্য সমস্ত কার্য ভুলিয়া যাইতেন, যাহার সভ্য হইয়া কার্য করিবার আকাঙ্ক্ষা কিশোর বয়স হইতে তাঁহার মনকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, আশুতোষ এতদিন পরে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের মেম্বর নিযুক্ত হইলেন।"

সেদিন কে কল্পনা করতে পেরেছিল যে, উত্তরকালে সেই আশুতোষই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধাতাপুরুষরূপে আত্মপ্রকাশ করবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠনে এক আশ্চর্য প্রতিভার পরিচয় প্রদান করে সকলকে বিস্মিত করবেন। ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯০৪, 'ইউনিভার্সিটিজ অ্যাক্ট' প্রবর্তিত হোল। বাংলার শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা তখন আলেকজান্দার পেডলার। নব প্রবর্তিত আইন-নির্দিষ্ট নীতিকে বাস্তবরূপ দেবার জন্য পেডলারকেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠন ব্যাপারে পেডলার বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেননি। দু' বছর পরে, ১৯০৬ সালেব মার্চ মাসে তিনি যখন অবসর গ্রহণ করেন তখনো নূতন বিধিনিয়ম রচনা সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় সংকটের মধ্য দিয়েই চলছিল। সেই সংকটের দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল ধরবার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল এমন একটি মানুষের যাঁর মধ্যে যুগপৎ প্রচণ্ড কর্মশক্তি ও নভোস্পর্শী কল্পনার সমাবেশ ঘটেছিল। সেই মানুষ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

॥ চার ॥

পৃথিবীতে কোনো কোনো মানুষ দুর্লভ নেতৃত্ব নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন। আশুতোষও সেইরূপ নেতৃত্ব নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

তাঁর ব্যক্তিত্ব, জ্ঞান, বিদ্যা, শক্তি, সাহস ও সংগঠন শক্তি সবই ছিল অসাধারণ। স্বাধীনতা ছিল তাঁর জীবনের পরিচালক। তাঁর জীবনের প্রত্যেকটি কাজের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ পেয়েছিল। সবচেয়ে বেশি করে প্রকাশ পেয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে। আশুতোষ গভর্নমেণ্টের বিশ্বস্ত কর্মী ছিলেন সত্য, কিন্তু দেশহিতের জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চেয়েছিলেন—যেমন একদিন চেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে। শিক্ষানীতি সরকার রচনা করতে পারেন। কিন্তু সেই নীতিকে বাস্তবক্ষেত্রে রূপায়িত করবার পক্ষে সিনেটের স্বাধীনতায় সরকারী হস্তক্ষেপ আশুতোষ চিরদিন অন্যায় মনে করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার হিসাবে তিনি কী পরিমাণ স্বাধীন চিত্ততার পরিচয় দিয়েছিলেন, সেটা আমাদের সর্বাগ্রে জানা থাকা দরকার। প্রকৃত কথা এই যে, "গভর্নমেণ্ট চেষ্টা করিয়াও আশুবাবুকে তাঁহাদের অনুগত নিজস্ব ব্যক্তি করিয়া গড়িতে পারিলেন না। ইংরেজের রাজ্যে বাস করিয়াও তিনি কাহারও নিকট মাথা নত করিতে প্রস্তুত ছিলেন না।" এই দুর্নিবার, স্বাধীনচেতা মানুষটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা ব্যপারে যে কতখানি স্বাধীনতা এবং সেইসঙ্গে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন, আজ বোধ হয় আমরা তার কিছুটা হিসাব নিতে পারি। আশুতোষের জীবনের একটা বড়ো অংশ (প্রধান অংশ বললেও অত্যুক্তি হয় না) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। আজ এই কথা বলবার দিন এসেছে যে, "তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করিয়াছিলেন।" সরকারী শিক্ষানীতির সমর্থন করে

তিনি এই দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হননি। আজ আমরা অনুমান করতে পারি যে, ১৯০৬ সালে আশুতোষ যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের পদে নিযুক্ত হন, তখন তিনি একটি মহা হিতকর লক্ষ্যের দিকেই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন—জাতীয় শিক্ষা ও চরিত্র তিনি গড়ে তুলবেন। অতঃপর আমরা তাঁর জীবনের এই অধ্যয়টির বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

স্যর আলফ্রেড ক্রফট তখন শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা। তাঁর সঙ্গে একদিন আশুতোষের সাক্ষাৎ হয়। তিনি আশুতোষকে ডেকে পাঠান ও গভর্নমেণ্টের অধীনে চাকরি নিতে অনুরোধ করেন। তিনি আশুতোষকে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। আশুতোষ ইংরেজ অধ্যাপকদের সমান গ্রেড (Grade) দাবী কবলেন এবং চিরদিন তাঁর প্রিয় প্রেসিডেন্সী কলেজেই অধ্যাপক থাকতে চাইলেন। এই বিষয়ে বাদানুবাদ হয়। শেষে আশুতোষ স্যব আলফ্রেডের প্রস্তাবিত শর্তে চাকরি নিতে অস্বীকার করেন। এব ফলে ক্রফট সাহেব চিরদিন তাঁর উপর বক্র ছিলেন। ক্রফট-ঘটিত ঘটনার কিছু পরে, ১৮৯১ সালে আশুতোষ একদিন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তখন বায়ু-পরিবর্তনের জন্য চন্দননগরে গঙ্গার তীরে একটি বাড়িতে থাকতেন। উপরের একটি ঘরে এসে বিদ্যাসাগরকে প্রণাম করে যুবক আশুতোষ বললেন, "আপনার কলেজে আমি চাকরি করব।" আশুতোষের মতন একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে কলেজের অধ্যাপক হিসাবে পাওয়া কম কথা নয়, এই বিবেচনা করে বিদ্যাসাগর তাঁকে ২০০৲ শত টাকা মাইনের একটা চাকরি দিলেন তাঁর মেট্রোপলিটান কলেজে। এই ঘটনাটির সেদিন সাক্ষ্য ছিলেন পণ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তাঁরই রচিত একটি বিবরণে তিনি এর উল্লেখ করেছেন।*

মেট্রোপলিটান কলেজে আশুতোষ অল্পদিনই ছিলেন। এই সময়ে তিনি একদিন স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং—"বাৎসরিক মাত্র চারি হাজার টাকা পাইলেই অন্য সমস্ত চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া অধ্যাপকতা

* লেখকের 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ও মৌলিক গবেষণা লইয়া জীবন কাটাইবেন”—এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। ক্রফট সাহেব স্বয়ং উপযাচক হয়ে যাঁকে চাকরিতে নেওয়াতে পারেন নি, তিনিই আবার স্বয়ং স্যর গুরুদাসের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কথিত আছে, আশুতোষকে বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক হিসাবে পাবার জন্য তাঁর খুব আগ্রহ ছিল এবং “গুরুদাসবাবু তাঁহার এই প্রস্তাবে প্রীত হইয়া অর্থ সংগ্রহের জন্য ছুটাছুটি আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল—তিনি বৎসরে সেই চারি হাজার টাকা দিবার ব্যবস্থা কিছুতেই করিয়া উঠিতে পারিলেন না।”

এই প্রসঙ্গে ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন লিখেছেন: “বিশ্ববিদ্যালয়ের এতগুলি সম্মানলাভ করিয়াও আশুতোষ জজিয়তিলাভের পথে চলিতে প্রথমে রাজি হন নাই। তিনি স্যর গুরুদাস, মহেন্দ্রলাল সরকার ও বুথ সাহেবের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে বার্ষিক ৪০০০্ টাকা বেতন পাইলেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে আজীবন গণিতের অধ্যাপনা করিবেন। তখনকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাণ্ডারে আশুতোষের ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছাত্রের জন্যও চারিহাজার টাকা জুটে নাই। তাই অনন্যচিত্ত হইয়া গণিত আলোচনার সুযোগও আশুতোষের ভাগ্যে ঘটে নাই। ইহা দেশের সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য বলিতে পারি না। কারণ তাঁহার সেই বাসনা পূর্ণ হয় নাই বলিয়াই তিনি এমন ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে আর তরুণ প্রতিভাবান বাঙালী ছাত্রের গবেষণার পথে অর্থাভাবের কণ্টক নাই। আশুতোষ গণিতের গবেষণায় জীবনপাত করিতে পারেন নাই বলিয়াই বোধ হয় মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির গবেষণার পথ সহজ সরল নিষ্কণ্টক হইয়াছিল।”

ভবিষ্যতে ছাত্রদের প্রতিভার বিকাশের পথ যাতে সুগম হয়, তার জন্য আশুতোষের ন্যায় একজন ব্যক্তির ভাইস-চ্যান্সেলার হওয়া প্রয়োজন ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রার্থিত অধ্যাপকের পদ লাভ করতে না পেরে অগত্যা আশুতোষ কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতিতে প্রবিষ্ট হন। স্বনামধন্য ব্যবহারজীবী স্যর রাসবিহারী ঘোষের অধীনে তিনি আইন ব্যবসায়ের কাজ শিক্ষা করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। আইন-ব্যবসায়ে তিনি এতদূর সফলতা লাভ করেছিলেন যে, ১৯০৪ সালে যখন তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি পদে নিযুক্ত হন, তখন

আশুতোষের মাসিক আয় ছিল দশ হাজার টাকা। ১৯২৭ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিচারপতি আশুতোষের কথা পরে বলব, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধাতাপুরুষ আশুতোষের প্রসঙ্গ এখন আলোচনা করা যাক।

কিন্তু তৎপূর্বে তাঁর কর্মজীবনের গোড়ার কথা কিছু উল্লেখ করতে হয়। যদিও তাঁর বাল্যকালের সংকল্প ছিল যে ভবিষ্যতে তিনি হাইকোর্টের একজন বিচারপতি হবেন, তথাপি বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র যেন তাঁকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করত। আশুতোষ যে বছর বি. এ. পাস করেন (১৮৮৪) সেই বছর সিটি কলেজ বি. এ. পরীক্ষাতে ছাত্র প্রেরণ করবার অধিকার লাভ করে। এই সময়ে সিটি কলেজের পুরস্কার-বিতরণ সভায় স্বনামধন্য বিচারপতি স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র সভাপতিত্ব করেন। তিনি তাঁর অভিভাষণে উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়েব প্রসঙ্গে এই রকম মন্তব্য করেছিলেন . "বাঙালী এখন সব বিষয়েই অগ্রসর হইতেছেন। বাঙালী যদি এমন করিয়া কলেজ চালাইতে সমর্থ হন, তবে গভর্নমেণ্টের বিশেষ কিছু করিবার দরকার নাই। উচ্চশিক্ষার ভার ও দায়িত্ব আমরা স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারি।" এই মন্তব্যটি সেদিন অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ছিল এবং 'বঙ্গবাসী' প্রভৃতি পত্রিকায় এই নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়। সকলেই একবাক্যে রমেশচন্দ্রের এই অভিমত সমর্থন করলেন, কিন্তু এক অখ্যাত যুবকের মনে সেদিন প্রশ্ন জেগেছিল – সত্যই কি আমরা নিজেদের হাতে উচ্চশিক্ষার দায়িত্ব নিতে পারি ? তিনি আশুতোষ।

সমগ্র বিষয়টি তাঁর চিন্তাকে বিশেষভাবে উদ্দীপিত করেছিল সেদিন। কতই বা বয়স তখন তাঁর ? কুড়ি বছর—কিন্তু সেই কুড়ি বছর বয়সে আশুতোষ ভাবতে পেরেছিলেন : "আমরা কি করিয়াছি যে উচ্চশিক্ষার গুরুতর দায়িত্ব আমাদের স্কন্ধে বহন করিতে সমর্থ হইয়াছি ? আমাদের না আছে ইচ্ছা, না আছে সামর্থ্য, না আছে শ্রমশীলতা। আমরা প্রতিজ্ঞা করি পালন করি না, আস্ফালন করি কার্য করি না, বড়ো বড়ো আশার কথা কল্পনা করিয়া নিজেদের দৈন্য দ্বারা পরাভূত হই। আমরা কি সাহসে উচ্চশিক্ষার গুরুভার মাথা পাতিয়া লইব ? ইহার জন্য যে স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন, আমাদের মধ্যে কে তাহা করিতে প্রস্তুত ?" এর বাইশ বছর পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে আশুতোষ দেখিয়ে দিলেন যে উচ্চশিক্ষার গুরুভার দায়িত্ব কি ভাবে বহন

করতে হয়; দেখিয়ে দিলেন, কি বিপুল পরিমাণ স্বার্থত্যাগ এর জন্য প্রয়োজন। কিন্তু সেদিন তিনি এইসব কথা চিন্তা করেই নিরস্ত ছিলেন না—তিনি আরো অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর এক জীবনীকার এই প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"আশুতোষ 'স্টেটসম্যান' কাগজের সম্পাদক মিস্টার নাইটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন ও স্থির করিলেন এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিবেন। দুই-একদিন পরেই A.M. স্বাক্ষরিত বড়ো বড়ো প্রতিবাদ-পত্র 'স্টেটসম্যান' কাগজে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। সহসা এমনভাবে স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের কথার প্রতিবাদ হইতে দেখিয়া দেশবাসী বিস্মিত হইল। পরলোকগত মিস্টার এন. এন ঘোষ মহাশয় আশুতোষের উত্তর প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। এই প্রতিবাদ-পত্রগুলি কাহার লেখা তাহা লইয়া শিক্ষিত সমাজে খুব বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। অনেকেই অনেককে সন্দেহ করিতে লাগিলেন। এমন সুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধের পর প্রবন্ধের অবতারণা একজন যুবকের পক্ষে অসম্ভব, কাজেই আশুতোষ যে লেখক, এ কথা কাহারও মনেই আসিল না। এদিকে স্টেটসম্যান কাগজে অনবরত প্রবন্ধ বাহির হইতে থাকিল। প্রত্যেক প্রবন্ধটির নীচে A. M. এই দুটি অক্ষর থাকিত; উহা দেখিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরাজির অধ্যাপক মিস্টার রো আশুতোষকে ধরিয়া ফেলিলেন।"

ভবিষ্যতের শিক্ষা-সংস্কারক এবং উচ্চশিক্ষার প্রবর্তক আশুতোষকে এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। পিতা গঙ্গাপ্রসাদ পুত্র আশুতোষকে তাঁর শৈশবে একটি সুন্দর শিক্ষা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন : "ভালো করে শেখা চাই।" পরবর্তী কালে আশুতোষ বলতেন, তাঁর পিতার এই শিক্ষাই তাঁর জীবনের উন্নতির মূলমন্ত্র হয়েছিল। কি অসাধারণ ও সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে তিনি তাঁর ছাত্রজীবনে জ্ঞানচর্চা করেছিলেন, 'আশুতোষের ছাত্রজীবন' গ্রন্থে কৌতূহলী পাঠক তার পরিচয় পাবেন। ঐ গ্রন্থের একস্থানে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে, সেটি এখানে উদ্ধৃত হোল। "বহুদিন পূর্বে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন অধ্যাপনার ব্যবস্থা ছিল। মিস্টার ডবলু. এ. মণ্ট্রাইও (Mr. W. A. Montrion) নামে একজন ব্যারিস্টার তদানীন্তন প্রেসিডেন্সী কলেজে আইনের অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে এদেশে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মণ্ট াইও সাহেবের মৃত্যুর পরে তাঁহার লাইব্রেরী নিলামে বিক্রয় হইয়া গেল। তিনি সিনেটের একজন সভ্য ছিলেন এবং বিশ্ববিত্যালয়ের অনেক খবর রাখিতেন। তাঁহার নিকট এক প্রস্থ 'ক্যালেণ্ডার' ও 'মিনিটস্' ছিল। বিশ্ববিত্যালয়ের প্রথম হইতে তিনি এগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। নিলামে আশুতোষ সেই সব 'ক্যালেণ্ডার' ও 'মিনিটস' কিনিয়া ছয় মাসের মধ্যেই সেগুলি পড়িয়া ফেলিলেন। অমন নীরস জিনিস পড়িতেও আশুতোষের কিছুমাত্র ধৈর্যচ্যুতি ঘটিত না। তিনি নীরবে একান্তমনে নির্জন পাঠগৃহে ঐ সকল পুরাতন কথা অতি অপূর্ব সুখপাঠ্য সংবাদের ন্যায় পাঠ করিতেন।" সেই তাঁর নিবিষ্টচিত্তে বিশ্ববিত্যালয়ের 'মিনিটস' অধ্যয়নের মধ্যেই কি আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবী কর্ণধারকে প্রত্যক্ষ করি না? দেখা গেল, তাঁর ছাত্রাবস্থাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুপূর্বিক সব সংবাদ আশুতোষের আয়ত্ত হয়ে গিয়েছিল।

১৮৮৬। আশুতোষ তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতবিদ্য ছাত্র। সেই বয়সেই তিনি এডিনবরা রয়াল সোসাইটির সভ্য এবং F.R.A.S, F.R.S E. হয়েছেন। এর আগে আর কোনো বাঙালী কিম্বা ভারতীয় এই সম্মান লাভ করেন নি। আবার সেই একই সময়ে দেখা যায় যে তিনি আইন পরীক্ষায় (বি.এল.) উত্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি সিটি কলেজে আইন অধ্যয়ন করেছিলেন। তখন এখানে আনন্দমোহন বসু, রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত-প্রবর কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, ডক্টর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (পরবর্তী কালে ইনিই লর্ড এস পি. সিংহ নামে খ্যাত হয়েছিলেন) প্রভৃতি যশস্বী অধ্যাপকগণ আইনের অধ্যাপনা করতেন। লর্ড সিংহের অধ্যাপনা প্রসঙ্গে আশুতোষকে পরবর্তীকালে অনেকবার এই কথাটি বলতে শোনা গিয়েছে: "সিঙ্গি সাহেবের মতো বুঝাইবার শক্তি অন্যত্র বিরল।" ইলবার্ট সাহেব তখন ভাইস-চ্যান্সেলার। তিনি শুধু আশুতোষের গুণমুগ্ধ ছিলেন না, তাঁর উপকার করতেও আগ্রহান্বিত ছিলেন। ১৮৮৬ সালের গোড়ার দিকে একদিন তিনি আশুতোষকে স্বগৃহে আহ্বান করেন।

—What can I do for you? জিজ্ঞাসা করলেন ইলবার্ট।

—You can do for me a lot, Sir, if you wish.—বললেন নম্রভাবে আশুতোষ।

—I shall be only too glad to do for you anything you desire.

—I do not desire anything. Kindly make me a member of the Senate.

—I will make you a Fellow, you need not be anxious for that.

এর থেকেই আমরা বুঝতে পারি আশুতোষের লক্ষ্য কত উঁচুতে ছিল। তাঁর একান্ত অভিলাষ ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবায় আত্মোৎসর্গ করে দেশের শিক্ষা-প্রণালীর তিনি উন্নতিসাধন করবেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক জীবনীকার লিখেছেন: "মিস্টার ইলবার্ট ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন ও তাঁহার অপরিসীম ক্ষমতা ছিল, আশুতোষ ইচ্ছা করিলে গভর্নমেণ্টের অধীনস্থ কোনো বিভাগে বড়ো চাকরি পাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা প্রার্থনা করিলেন না। সাধারণতঃ শিক্ষিত বাঙালী যুবকের নিকট যাহা একান্ত কাম্য, একেবারে আকাশের চাঁদ—আশুতোষ সে দিক দিয়াই গেলেন না। তিনি এমন এক পদ চাহিলেন, যাহার সহিত অর্থের সংশ্রব মাত্রও নাই। মিস্টার ইলবার্টের নিকট তাহা কিছুই নহে। বারবার উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ অযাচিতভাবে তাঁহাকে কর্মগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছিলেন, কিন্তু তিনি নিজের অদম্য শক্তি ও সামর্থ্য অবগত ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।"

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইলবার্ট সাহেব তারপর বেশিদিন এদেশে ছিলেন না। বিলাতের পার্লামেণ্টে উচ্চপদের একটি চাকরি নিয়ে (Parliamentary Counsel) তিনি বিলাত চলে যান। তবু আশুতোষ যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' নির্বাচিত হন সেজন্য ইলবার্ট তাঁর সুপারিশ লিপিবদ্ধ করে যান। মনে হয় তিনি চলে যাবার পর সে সুপারিশ নথীপত্রের তলায় চাপা পড়ে যায়। তাঁর বয়স কম বলে অনেকেই তাঁর প্রতিবাদী হলেন। আশুতোষ কিছুতেই সিনেটের সভ্যপদ লাভ করতে পারলেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবার জন্য আশুতোষ এম.এ. পাস করেই বি.এ. পরীক্ষাতে গণিতের পরীক্ষক নিযুক্ত হবার জন্য আবেদন করেছিলেন। নানা কারণে তাঁর সেই আবেদন

বিশ্ববিদ্যালয় নামঞ্জুর করেন। কিন্তু তাঁর ছিল অদম্য স্বভাব—তিনি যা সংকল্প করতেন তার শেষ পর্যন্ত না দেখে কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হোতেন না। P. R S. পেয়েই তিনি একেবারে এম এ পরীক্ষাতে গণিতের পরীক্ষক নিযুক্ত হবার জন্য আবেদন করলেন। এম এ র পরীক্ষক, তাও আবার গণিতের! যুবক আশুতোষের এই আকাঙ্ক্ষাকে সেদিন অনেকেই প্রগল্‌ভতা বলে মনে করলেন। অনেকের বিদ্রূপভাজনও হোলেন তিনি। কিন্তু সিনেটের দুইজন সদস্য—ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ও প্রাতঃস্মরণীয় স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আশুতোষকে সমর্থন করলেন। ১৮৮৭ সালের মার্চ মাসে তিনি নিয়োগপত্র পেলেন। তাঁর এক জীবনীকার লিখেছেন: "আশুতোষই ভারতবাসীর মধ্যে সর্বপ্রথম গণিতের মতো কঠিন বিষয়ে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ. পরীক্ষাতে পরীক্ষক নিযুক্ত হইলেন। সহকারী পরীক্ষক হইলেন অধ্যাপক বুথ। তখন হইতে বুথ সাহেব প্রায়ই ভবানীপুরে আশুতোষের বাটীতে গমন করিতেন, এবং সেখানে গুরুশিষ্যে গণিতচর্চা হইত। নভেম্বর মাসে যখন পরীক্ষা গৃহীত হইল, প্রশ্নপত্র দেখিয়া সকলেই যুবক পরীক্ষকের বিদ্যা ও বিচার-ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইহার পর হইতে আশুতোষ প্রতি বৎসর বি. এ. এবং এম. এ.র পরীক্ষক নিযুক্ত হইতেন।"

কিন্তু পরীক্ষক নিযুক্ত হয়ে আশুতোষ যেন সুখী হোলেন না—সিনেটের মধ্যে আসবার ইচ্ছা তিনি তখনো ত্যাগ করেননি। তাঁর হিতৈষী ইলবার্ট সাহেবকে তিনি কিছুদিন পরে বিলাতে এক চিঠি লিখে জানালেন, তিনি এখনও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য নিযুক্ত হোতে পারেননি। ইলবার্টের সুপারিশ যে কার্যকরী হয়নি, এমন একটু ইঙ্গিতও ছিল তাঁর ঐ চিঠিতে। যথাসময়ে চিঠির জবাব এলো। ইলবার্ট লিখলেন: "লর্ড ল্যান্সডাউন রাজ-প্রতিনিধি (Viceroy) হয়ে ভারতে যাচ্ছেন। তাঁকে আমি তোমার কথা বলে দিলাম।" লর্ড ল্যান্সডাউন বড়োলাট হোয়ে এলেন ১৮৮৮ সালে। তাঁর শাসনকাল স্মরণীয় হয়ে আছে এদেশের ইতিহাসে। একটা বড়ো রকমের শাসন-তান্ত্রিক পরিবর্তন তাঁরই আমলে সাধিত হয়— এরই পরিণতি ১৮৯২ সালের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট। ল্যান্সডাউন ইলবার্টের অনুরোধ বিস্মৃত হননি। ১৮৮৯, ১৬ই জানুয়ারি। আশুতোষ তথা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে

একটি স্মরণীয় তারিখ। সন্ধ্যাবেলা। আশুতোষ বসে আছেন তাঁদের ভবানীপুরের বাড়িতে। বসে বসে নিবিষ্টচিত্তে তিনি জরাজীর্ণ একখানি পুস্তক পাঠ করছিলেন। তাঁর প্রিয়তম গ্রন্থ—বওডিচ-কৃত লাপ্লাসের ইংরাজি অনুবাদ—যে গ্রন্থ তিনি বহুকষ্টে ছাত্রজীবনে সংগ্রহ করেছিলেন। এমন সময়ে অধ্যাপক বুথ এসে উপস্থিত। "I have brought a good news for you, Ashutosh", বললেন বুথ সাহেব। উৎকণ্ঠিত আশুতোষ জিজ্ঞাসা করেন—কী সংবাদ?

"You have been appointed a Fellow of the University", এইটুকু বলে বুথ সাহেব চুপ করলেন, তারপর তিনি তাঁকে বললেন. "আর দুই মাস পরে সিণ্ডিকেটের মেম্বার নির্বাচনের সময়, তখন সিণ্ডিকেটে প্রবেশ করা চাই।" ছাত্রের কৃতিত্বে অধ্যাপকের এমন আনন্দ ক্বচিৎ দেখা যায়—বিশেষ করে যেখানে ছাত্র একজন ভারতীয় আর অধ্যাপক একজন ইংরেজ। বুথের প্রস্তাবটা আশুতোষের মন্দ লাগল না, কিন্তু পর মুহূর্তেই তিনি হিসাব করে দেখলেন সিণ্ডিকেটের নির্বাচন হোতে আর মাত্র দু'মাস বাকী আছে। তাই তিনি বুথকে বললেন—"We have only two months—it is impossible." "Nothing is impossible for you, Ashutosh. You must contest and become a member of the Syndicate"—প্রবল উৎসাহ দিয়ে বলেন বুথ সাহেব। একটু চুপ করে থেকে, তিনি আশুতোষকে জিজ্ঞাসা করেন—"Tell me, who are your well wishers."

বুথের উৎসাহ আশুতোষকে উৎসাহিত করে। একবার যখন 'ফেলো' নিযুক্ত হয়েছেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশের পথ তাঁর পক্ষে হয়তো কিছুটা উন্মুক্ত হোল, মনে মনে ভাবেন আশুতোষ। তিনি তখন বুথের কাছে মহেন্দ্রলাল সরকার, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিচারপতি ওকেনেলি'র নাম করলেন। আগেই বলেছি, এই তিনজন ব্যক্তিই তাঁর উন্নতির অনেক সহায়তা করেছিলেন। বুথও অবশ্য তাঁর অন্যতম হিতৈষী ছিলেন। এঁদের নাম শুনে, "অধ্যাপক বুথ প্রফুল্ল হইয়া বলিলেন, ইঁহারা চেষ্টা করিলেই হইবে; তুমি ইঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ কর।" এরপর তিনি কিভাবে সিণ্ডিকেটের

সভ্য নির্বাচিত হন, সে রোমাঞ্চকর কাহিনী শ্রীঅতুল ঘটক তাঁর গ্রন্থে সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন, এখানে তার উল্লেখের প্রয়োজন নেই। ১৮৮৯ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত 'ফ্যাকাল্টি অব আর্টস'-এর সভায় তাঁর কল্যাণকামী বন্ধু-বর্গের সহায়তায় আশুতোষ সিণ্ডিকেটের অন্যতম সভ্যরূপে নির্বাচিত হন।

শ্যামাপ্রসাদ লিখেছেন: "Young Ashutosh grew up in this some what grey and subdued domestic circle in which the only touch of colour was added by his great passion for books, a passion which was steadily encouraged by his watchful father." বস্তুত, যে জীবনের একমাত্র তৃপ্তির উৎস ছিল জ্ঞানচর্চা এবং পাঠের প্রতি অনুরাগ এবং যে অনুরাগ পিতা গঙ্গাপ্রসাদের অবিরত উৎসাহে ক্রমশই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল—সেই জীবনের দিকে আজ যখন আমরা সশ্রদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখন আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই যে, ভগবান তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার করে পাঠাবেন বলেই না তাঁকে এমন বিশাল জ্ঞানের অধিকারী করে তুলেছিলেন। যে ঐকান্তিক পাঠানুরক্তি তাঁর ছাত্রজীবনে দেখা গিয়েছিল তার তো কোনোদিনই শেষ হয়নি— তার সাক্ষী আশুতোষের গ্রন্থাগার, যার দাম ছিল পাঁচ লক্ষ টাকা। এমন জ্ঞান-সাধক ব্যক্তির পক্ষেই বিশ্ববিদ্যালয়েব কর্ণধার হওয়া মানায়।

বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে দেশে তিনি উচ্চশিক্ষা বিস্তার করবেন, এই মহৎ সংকল্প আশুতোষ হৃদয়ে পোষণ করতেন এবং এজন্য যে বিপুল পরিমাণ স্বার্থত্যাগ প্রয়োজন, সেটাও তাঁর বুঝতে বিলম্ব হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনে তাঁর এই স্বার্থত্যাগ যে কত বড়ো ছিল তার একটা চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন দীনেশচন্দ্র সেন। তিনি লিখেছেন: "১৯০৪ খৃস্টাব্দ হইতে ১৯২৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত আশুতোষ হাইকোর্টের জজের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন— জজিয়তি গ্রহণের তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের জন্য তিনি অবকাশ পাইবেন। ওকালতিতে তাঁহার পসার প্রতিপত্তির এতটা বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, তিনি উচ্চশিক্ষা-কল্পে আত্মনিয়োগের জন্য ততটা সময় পাইতেন না। সেই

কার্যের জন্ত তিনি ব্রতী ছিলেন এবং এইজন্তই তিনি ওকালতির প্রচুর আর্থিক সম্ভাবনা ত্যাগ করিয়াও জজের পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ই তাঁহাকে আজীবন আকর্ষণ করিয়াছিল এবং ইহারই সেবায় তিনি শুধু রিক্তহস্তে, অবৈতনিকভাবে প্রাণান্ত খাটুনি খাটিয়া এবং ঘোর শত্রুতা সহ্য করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, অধিকন্তু যে ক্ষেত্র হইতে তাঁহার জীবিকা নির্বাহের সংস্থান হইত, তাহাও অনেকটা সঙ্কুচিত করিয়াছিলেন।" বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠনে এবং নির্মাণে আশুতোষের স্বার্থত্যাগটা হৃদয় দিয়ে অনুভব করার জিনিস, বুদ্ধি দিয়ে নয়। এই স্বার্থত্যাগই তাঁর চরিত্রকে একটা স্বতন্ত্র মহিমা প্রদান করেছিল।

১৯০৪ সালের ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিজ অ্যাক্ট' প্রবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে নবযুগের সূচনা পরিলক্ষিত হয়। ভারতে ইংরাজ শাসকের শিক্ষা নীতিতেও একটা পরিবর্তন এই সময় থেকেই দেখা দিতে থাকে। ১৯০৪ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখের কনভোকেশনে চ্যান্সেলার হিসাবে লর্ড কার্জন তাঁর বক্তৃতায় সেই পরিবর্তনের কিছু আভাস দিলেন। তিনি বললেন: "What ought the ideal University to be in India, as elsewhere ? As the name implies, it ought to be a place where all knowledge is taught by the best teachers to all who seek to acquire it, where knowledge so taught is turned to good purposes and where its boundaries are receiving a constant attention.." এই বক্তৃতাতেই কার্জন তাঁর সেই প্রসিদ্ধ উক্তিটি করেছিলেন—"There is no scientific frontier to the domain of knowledge.' অর্থাৎ, জ্ঞানের ক্ষেত্র বিশেষ কোনো সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। এই নূতন ইউনিভার্সিটি আইন বিশেষ তদন্ত ও চিন্তার পর রচিত ও প্রবর্তিত হয়। ১৮৫৭ সালে যে আইনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয়েছিল, ১৯০৪ সালের আইনের সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য এই ছিল: "The University shall be and shall be deemed to have been incorporated for the purpose of making provision for the instruction of students, with

power to appoint University Professors and Lecturers, and to erect and maintain University Libraries, Laboratories and Museums.' দেখা যাচ্ছে, এই নূতন আইন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চ-শিক্ষার একটি যথার্থ কেন্দ্র হিসাবে রূপ দিতে চাইল।

পূর্বেই বলেছি, ১৯০৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বর নূতন আইন চালু হবার পর স্যর আলেকজান্দার পেডলার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন। এই নূতন আইন প্রণয়নে পেডলারের বিশেষ হাত ছিল, সম্ভবত সেই কারণে তাঁর উপর এই গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল। একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল এবং তিনি বিলাতের 'রয়্যাল সোসাইটি'র একজন সদস্যও ছিলেন ; সর্বোপরি বাংলার শিক্ষাবিভাগের তিনিই তখন ছিলেন সর্বময় কর্তা। সুতরাং পেডলারের নিয়োগে কারোই আপত্তি হয়নি। এই নূতন আইন বিশেষ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারসাধন করবার জন্যই প্রবর্তিত হয়েছিল। নবগঠিত সিনেট আইন অনুযায়ী নূতন নিয়ম কানুন রচনা করলেন। কিন্তু যে দুবছরকাল পেডলার ভাইস-চ্যান্সেলারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময়ে দেখা গেল যে, "The Senate could not come to an agreement regarding the new regulations"—এবং এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠন ও সংস্কারসাধনের ব্যাপারে একটা সংকটের উদ্ভব হোল। ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে পেডলার অবসর নিলেন। সেই সংকটের দিনেই সরকার আশুতোষকে আহ্বান করলেন ভাইস-চ্যান্সেলারের দায়িত্ব গ্রহণ করবার জন্য। তিনি সেই দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং ১৯০৬ থেকে ১৯১৪, এই আট বছর কালের মধ্যে তিনি পরপর চারবার উক্ত পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রকৃত নবযুগের আরম্ভ এই সময় থেকেই।

ভাইস-চ্যান্সেলার হবার পর আশুতোষের প্রথম কাজই ছিল নূতন আইন অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার জন্য নূতন নিয়মাবলী রচনা করা। ভারত-সরকারের সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে, ১১ই আগস্টের মধ্যে এই নিয়মকানুনগুলি রচিত হওয়া চাই। আশুতোষ এলেন মার্চ মাসে, তখন আর মাত্র চারমাস সময় আছে। সেই অল্প সময়ের মধ্যে new regulations যাতে রচিত হোতে পারে সেজন্য তিনি অবিলম্বে একটি কমিটি গঠন করলেন। তিনি স্বয়ং সেই

কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। পুনর্গঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটকে অতঃপর এই নূতন নিয়মানুসারে কাজ করতে হোল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থে বলা হয়েছে : "It is needless to add that Asutosh Mookerjee, the new Vice-Chancellor, was the author and architect of these regulatons" সেদিন এই নূতন নিয়মাবলী রচনায় আশুতোষ যে প্রতিভা এবং দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন, তা দেখে সিনেটের বহু প্রবীণ সদস্য বিস্মিত না হোয়ে পারেন নি। এই নিয়মাবলীর কাঠামোর মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তী যতকিছু সংস্কার সাধিত হয়েছিল।

১৯০৬ সালে নূতন নিয়মাবলী প্রবর্তিত হোল বটে, কিন্তু দেশের শিক্ষিত জনসাধারণ ইহা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চক্ষে দেখলেন। জনসভায় ও সংবাদপত্রে তুমুল সমালোচনার ঝড় উঠলো। সকলেই বলতে লাগলো যে, সরকার বিশ্ব-বিদ্যালয়কে officialise করতে উদ্যত এবং এর ফলে বাংলা দেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র বিশেষভাবেই সঙ্কুচিত হবে, এমন আশঙ্কাও অনেকে প্রকাশ করলেন। কিন্তু এই সন্দেহ, অবিশ্বাস ও আশঙ্কা যে সেদিন অমূলক ছিল তা ভাইস-চ্যান্সেলার রূপে আশুতোষের পরবর্তী কার্যাবলীই প্রমাণ করে দিয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনচেতা আশুতোষ শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে নূতন নালন্দা ও বিক্রম-শীলা গড়ে তুলবার স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং এই বিদ্যাকেন্দ্রকে তিনি তাঁর স্বজাতির "intellectual regeneration"-এর যন্ত্র হিসাবে নির্মাণ করতে কৃতসংকল্প ছিলেন। তাই তাঁর পক্ষে সরকারী আইনের কাঠামোর মধ্যে থেকে কিভাবে এই অসাধ্য সাধন করা সম্ভব হয়েছিল তার সাক্ষ্য দিয়েছেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র-নাথ। তিনি তখন নবগঠিত সিনেটের একজন নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। তিনি লিখেছেন : "His long familiarity with the Calcutta University, his wide grasp of educational problems and his extraordinary capacity for dealing with them, made Sir Asutosh the most commanding figure in the University. During the time he was Vice-chancellor he ruled the University with a supreme sway; and it is but right to say

that he enforced the regulations with a measure of discretion, a regard for all interests, that partly allayed the suspicion and anxiety they had created in the minds of the educated community in Bengal. He was a unique figure in the educational world of Bengal."*

উদ্ধৃতি একটু দীর্ঘ হোল, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ এখানে ভাইস-চ্যান্সেলার আশুতোষ সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ দিয়েছেন তার মধ্যে কিছুমাত্র অত্যুক্তি নেই। এই বিশ্লেষণের সূত্র ধরেই আমরা সেই শিক্ষাব্রতীর জীবন-সাধনার ইতিহাস তুলে ধরবার চেষ্টা করব। সত্যই, বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি জ্ঞানমন্দির স্বরূপ মনে করতেন এবং "জ্ঞান-মন্দিরের সেই পুরোহিতকে দেবী-ভারতী স্বহস্তে তিলক পরাইয়া দিয়াছেন"—সেখানে আর কারো কর্তৃত্ব বা প্রাধান্য টিকত না। আগেই বলেছি, ভাইস-চ্যান্সেলাররূপে তাঁর প্রথম কাজ ছিল নূতন নিয়মাবলী রচনা। এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন: "বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়মাবলী সম্বন্ধে আলোচনার সময় যে তুমুল ঝটিকা উত্থিত হইয়াছিল, তাহা মনে পড়িলে কল্পনা হয়—মেঘ, বৃষ্টি, ঝটিকা ও বন্যার মধ্যে যেন স্বর্গাধিপ ইন্দ্র এক প্রলয়ংকর প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিয়ন্ত্রণ কারতেছেন। প্রতিটি নিয়মের সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থিত হইল। সে কি ঘোর আন্দোলন। প্রায় প্রত্যেকটিতেই স্যর গুরুদাস এবং বহু প্রধান প্রধান সদস্য আশুবাবুর প্রতিপক্ষ, সাহেব সদস্যেরাও সেই দলের। কিন্তু সেই উত্তেজিত বক্তৃতাগুলির বিরুদ্ধে আশুতোষ অর্জুনের মতো একাই এক অক্ষৌহিণী পরাজয় করিয়াছেন। অনেক সময় সুদীর্ঘ ৪।৫ ঘণ্টাব্যাপী বিরুদ্ধ সমালোচনার উত্তরে তিনি মাত্র ১৫ মিনিটকাল বক্তৃতা করিয়া প্রতিপক্ষীয়দের যুক্তিতর্কের ভিত চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন। বিরুদ্ধ ব্যক্তিদের যুক্তি-তর্কের অসারতা দেখাইবার পক্ষে তাঁহার সেই স্বল্পকথার উত্তর অমোঘ মুষলের কাজ করিয়াছে। তাঁহারই উত্তর শেষ কথা, তৎপর উত্তর দিবার কিছুই থাকিত না।"

ইহাই আশুতোষ। ভাইস-চ্যান্সেলাররূপে সুদীর্ঘকাল বাঙালী তথা ভারতবাসী তাঁর এই বিক্রান্ত মূর্তিই দেখেছে। সেদিন অনেকেই বলেছিলেন,

* *A Naticn in Making :* S. N. Banerjea.

সিনেটের কার্যাবলী পরিচালনা ব্যাপারে আশুতোষ-রচিত এইসব নিয়মাবলী কার্যকরী হবে না। পরে অবশ্য তাঁর প্রতিপক্ষদল তাঁদের ধারণা যে ভ্রান্ত এবং আশঙ্কা অমূলক—এটা বুঝতে পেরেছিলেন। কথিত আছে, এই নিয়মাবলী রচনাকালে আশুতোষ বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করে সভ্যজগতের আধুনিক সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতির ইতিহাস অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ ছিলেন না। পরবর্তীকালে দেখা গিয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা ব্যাপারে তাঁর বহু-দর্শন ও জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতাই এই বিদ্যাকেন্দ্রকে এশিয়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্রে পরিণত করেছিল। দেশ-বিদেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল, সেসব বিদ্যাপীঠের ইতিহাস তাঁর নখদর্পণে থাকতো, কাজেই তিনি যতকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল ধরেছিলেন, ততদিন এই বিদ্যাকেন্দ্র ধাপে ধাপে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছিল। প্রতি-কূলতার ভিতর দিয়ে সংগ্রাম করেই আশুতোষ তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হয়েছিলেন। এই প্রতিকূলতা এসেছিল দু'দিক থেকে—দেশীয় লোকদের কাছ থেকে এবং গভর্নমেণ্টের পক্ষ থেকেও। কিন্তু কোনো প্রতিকূলাচরণই তাঁকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারেনি। বিরুদ্ধ সমালোচনার কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়েই তাঁকে হাঁটতে হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিসাধনকল্পে তাঁর প্রচেষ্টার সঙ্গে ভারত-সরকার খুব বেশি সহায়তা করতেন না, ইহা সর্বজনবিদিত সত্য। তিনি ক্ষমতালাভের জন্য বা প্রতিষ্ঠালাভের জন্য ভাইস-চ্যান্সেলারি গ্রহণ করেননি, বরং এই কথা বলা চলে যে তিনি তাঁর যৌবনের উদ্যম ও অপরিমিত পরিশ্রম একটি আদর্শের পিছনে নিয়োজিত করেছিলেন। সেই তাঁর জীবনব্যাপী আদর্শসাধনের ইতিহাসই আশুতোষের প্রকৃত জীবনেতিহাস।

নূতন আইনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ একেবারেই পালটিয়ে গেল। পুরাতন আইনে যা ছিল, এখন নূতন আইনে তা রইল না। আগে যার একমাত্র কাজ ছিল শুধু পরীক্ষা গ্রহণ এবং উপাধি বিতরণ, এখন তার কাজ হোল বিদ্যাবিতরণ। স্মারকগ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে : "The University of

Calcutta remained no longer a purley examining body.'' এবং এখন থেকে এর ওপর এই নূতন দায়িত্ব বর্তালো যে, যেসব কলেজে ছাত্ররা শিক্ষালাভ করে, সেই সব কলেজের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের সতর্ক দৃষ্টি থাকবে। স্কুলগুলিও এখন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এলো। এতকাল পর্যন্ত বেশিরভাগ স্কুলই ছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত, কিন্তু ঐগুলির পরিচালনা অথবা তত্ত্বাবধানের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো হাত ছিল না। আশুতোষ ভাইস-চ্যান্সেলাররূপে যে নিয়মাবলী রচনা করেছিলেন, তার ফলে স্কুলগুলির নিয়ন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রভূত অধিকার লাভ করে। সেদিন অনেকেই বিশেষভাবে এই নিয়মটির বিরোধিতা করতে চেয়েছিলেন। আশুতোষ মনে করতেন: "Education in the University is the development, the amplification, of school education, and on some issues, its compliment.'' সেই কারণেই তিনি স্কুলগুলির উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ চেয়েছিলেন।

কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার তিনি অপব্যবহার হোতে দেননি। এর একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। লর্ড মিণ্টো তখন বড়োলাট। লর্ড কার্জন বাংলাদেশকে দু'ভাগ করে দিয়ে বিদায় নিয়েছেন। নবগঠিত পূর্ববঙ্গ প্রদেশের নূতন লাট ব্যামফিল্ড ফুলার। ফুলারী-শাসনের আমলে পূর্ববঙ্গ তখন বারুদস্তূপে পরিণত হয়েছে। সেই সময়ে সিরাজগঞ্জের কয়েকটি স্কুলের ছাত্রদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হোল যে তারা নাকি সিরাজগঞ্জ শহরে উচ্ছৃঙ্খল আচরণের পরিচয় দিয়েছে। দুর্বিনীত ছাত্রদের সংযত করবার জন্যই হোক, কিম্বা স্বীয় ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্যই হোক লাট ফুলার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের কাছে এই মর্মে একখানি পত্র লিখলেন যে, অবিলম্বে যেন ঐ বিদ্যালয়গুলির উপর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। আশুতোষ তখন নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হয়েছেন। স্কুলগুলির নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে সিণ্ডিকেটের হাতে তখন প্রচুর ক্ষমতা। তথাপি আশুতোষ লর্ড মিণ্টোকে (ইনি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার) একখানি চিঠি লিখলেন। সেই চিঠিতে তিনি ফুলারের অনুরোধের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করে লিখেছিলেন: "Let me point out to your Excellency that

if the Lieutenant-Governor insist on taking action by the University, the result will be acrimonious public discussion in the Senate and outside....The administration will be bitterly attacked, I therfore think it most desirable to avoid such a contingency." বলা বাহুল্য, লর্ড মিণ্টো লর্ড কার্জন ছিলেন না; তিনি আশুতোষের যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করলেন এবং ফুলারকে এই অনুরোধ প্রত্যাহার করবার জন্য নির্দেশ দিলেন। বাংলার সেই আগ্নেয় পরিবেশে স্কুল-কলেজগুলির ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা স্বাভাবিক-ভাবেই জেগেছিল। দূর থেকে আশুতোষ সেটা লক্ষ্য করেছিলেন এবং ভাইস-চ্যান্সেলাররূপে, সেদিন তিনি এই ঘটনা উপলক্ষে যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা সেদিনকার সংবাদপত্রগুলিতে যথাযথ স্বীকৃতি পায়নি। কিন্তু ঘটনাটির শেষ এইখানেই নয়। চ্যান্সেলারের অনুরোধ সত্ত্বেও ফুলার কিন্তু তাঁর জেদ ত্যাগ করলেন না—তিনি লর্ড মিণ্টোকে সোজাসুজি লিখে পাঠালেন যে, হয় তাঁর অনুরোধ রক্ষিত হবে নতুবা তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করতে হবে। মিণ্টো তখন অশুতোষের কাছে লিখলেন: "সিণ্ডিকেট বিষয়টির পুনর্বিবেচনা করতে পারেন কিনা," উত্তরে আশুতোষ জানালেন: "ইহা অসম্ভব"। সমগ্র বিষয়টি তখন ভারতসচিবের নিকট প্রেরিত হয়। লর্ড মর্লে তখন ভারতসচিব। তিনি চ্যান্সেলারের মতই বহাল রাখলেন এবং তারযোগে সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাঁর পূর্ণ সম্মতি বড়োলাটকে জানিয়ে দেন।*

ফুলারের সঙ্গে সংঘর্ষে আশুতোষ সেদিন এইরকম দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় দিয়ে এই কথাটাই প্রমাণ করেছিলেন যে, ভাইস-চ্যান্সেলাররূপে তিনি আদৌ আমলাতন্ত্রের সহচর ছিলেন না। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনে তিনি সর্বদাই স্বাধীনভাবে কাজ করেছেন; সরকারের হস্তক্ষেপকে কখনো প্রশ্রয় দেননি। লর্ড কার্জনের গগনস্পর্শী স্পর্ধা তাঁকে টলাতে পারেনি; প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নকালে ইংরেজ অধ্যাপকের ভ্রূকুটী তিনি গ্রাহ্য করেননি। সেই তেজস্বিতা, সেই নির্ভীকতা যেন শতগুণে উজ্জ্বল হোয়ে দেখা দিয়েছিল যখন আশুতোষ

* *Recollections*: Morley.

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার নিযুক্ত হোলেন এবং সেই সময়ে তিনি যখন যে সংকল্প করেছেন, তা বুদ্ধি ও শক্তিবলে সর্বদাই কার্যে পরিণত করেছেন। ভাইস-চ্যান্সেলার আশুতোষের জীবনে এর অজস্র দৃষ্টান্ত আছে।

কার্জন-সম্পর্কিত ব্যাপারটি ছিল এই। এ ঘটনা আশুতোষের ভাইস-চ্যান্সেলার হবার কিছু আগের। এই শতাব্দীর প্রথমভাগে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে কলিকাতা মহানগরীর প্রতিনিধি-স্বরূপ বিলাত যাবার জন্য আশুতোষের নিকট লর্ড কার্জনের নিমন্ত্রণ এলো।

আশুতোষ বড়োলাটের এই প্রস্তাবে সম্মত হননি। কারণ এ বিষয়ে তাঁর মায়ের আপত্তি ছিল। মায়ের আদেশ লঙ্ঘন করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। কার্জন তখন আশুতোষকে সাক্ষাতে ডেকে এনে নিমন্ত্রণ গ্রহণের জন্য আবার অনুরোধ করেন। তখন তিনি তাঁর মায়ের আপত্তির কথা বড়োলাটকে জানালেন। বললেন, তাঁর বিলেত যাওয়াতে তাঁর মায়ের মত নেই। কথিত আছে, তখন লর্ড কার্জন আশুতোষকে বলেন . "Tell your mother that the Viceroy and Governor-general of India commands her son to go to England" আশুতোষ ক্ষণমাত্র দ্বিধা না করে কার্জনের মুখের উপর বলেছিলেন : "Then I will tell the Viceroy and Governor-general of India that Asutosh Mookerjee refuses to be commanded by any person except his mother, be he the Viceroy, or be he somebody higher still." একজন উচ্চশিক্ষিত বাঙালী যুবক যে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে এমন কথা বলতে পারেন, লর্ড কার্জনের তা ধারণার বাইরে ছিল।

এই লর্ড কার্জনই যখন ১৯০২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কারসাধন উপলক্ষে নূতন আইন প্রণয়ন ও প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন তখন তাঁর মূল উদ্দেশ্যটা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা খর্ব করা, বিশেষ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙালীর প্রতিষ্ঠা ও কর্তৃত্ব লোপ করে দেওয়া। আশ্চর্যের বিষয়, সেই আইনের কাঠামোর মধ্যে থেকেই আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা কিভাবে উচ্চশিখরে উন্নীত করেছিলেন, সে ইতিহাস আজো সম্পূর্ণ বিরচিত হয়নি। এ কথা অবিসম্বাদীভাবে সত্য যে তাঁর আমলেই কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণরূপে বাঙালীর বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। বিদেশীর কর্তৃত্ব, গভর্নমেণ্টের কর্তৃত্ব এর ওপর আদৌ ছিল না। এইজন্যই বিদেশী আমলাতন্ত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কখনো সুনজরে দেখতে পারত না, আশুতোষকে তো নয়ই। ১৯১৪ সালে আট বছর ভাইস-চ্যান্সেলারি করবার পর আশুতোষ অবসর নেবার সময় তাঁর কনভোকেশন বক্তৃতায় গভর্নমেণ্টের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করেছিলেন। যথাস্থানে আমরা এই বিষয়টির আলোচনা করব।

বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন : "অনেকের মনে এই ধারণা ছিল যে, যেহেতু গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে হাতে ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়কদের মধ্যে বসাইয়া দিয়াছিলেন, সেই হেতু আশুতোষ সেদিনের আমলাতন্ত্রের সহিত চিরকাল সাহচর্য করিয়া আসিয়াছেন। লাট কার্জন যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারসাধনে ব্রতী হইয়া বাঙালীর এই প্রতিষ্ঠান হইতে বাঙালীর কর্তৃত্ব ও প্রতিষ্ঠা লোপ করিতে উদ্যত হন, তখন আশুতোষকে তিনি আপনার প্রধান সহায়করূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন—অনেকেই দূর হইতে ও বাহির হইতে এই রকমই ভাবিত।" কিন্তু একাদিক্রমে আটবছরকাল বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করে আশুতোষ এই কথাটাই প্রমাণ করে দিয়েছেন যে তিনি ইংরেজ আমলাতন্ত্রের সহচর ছিলেন না। দেশের লোক তাঁকে এইখানেই ভুল বুঝেছিল। কিন্তু তিনি স্বাধীনচেতা ছিলেন বলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা বজায় রাখবার জন্য সর্বদা তৎপর ছিলেন। এই প্রসঙ্গে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে তাঁর ১৯২২ সালের বক্তৃতাটি। এই বক্তৃতাতেই তিনি তাঁর সেই ঐতিহাসিক কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন : "Freedom first, freedom second, freedom always."

তাঁর ভাইস-চ্যান্সেলারি জীবনে এই যে তিনি স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় রেখে গিয়েছেন, আজ আমরা তা একরকম বিস্মৃত হয়েছি। এই কাজটা সেদিন যে কি সুকঠিন ছিল, আজ আমরা তা কিছুমাত্র অনুমান করতে পারব না। অনুমান করতে পারব না যে, শিক্ষা-সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করতে গিয়ে, আশুতোষ কতখানি নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছিলেন সেদিন। অথচ ইহা বুঝতে না পারলে তাঁর জীবনের অনেকখানিই

অনুদ্ঘাটিত থেকে যায়। কথিত আছে, আশুতোষ তাঁর বন্ধুদের কাছে অনেক সময় বলতেন: "লর্ড কার্জন নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ের রথ চালিয়েছিলেন। অথচ সে রথ তাঁর অভীষ্টস্থানে না গিয়ে, ঠিক তার বিপরীত দিকে গেল।" লর্ড কার্জনের আইনের সাহায্যেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে কত বড়ো করে তুলেছিলেন, অতঃপর আমরা সেই কাহিনীর বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

॥ পাঁচ ॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে আশুতোষ নতুন করে গড়েছেন।

এ নতুন করে গড়ার অর্থ স্বর্ণ দেউল নির্মাণ করা।

এইটাই কিন্তু তাঁর জীবনের বড়ো কীর্তি নয়। এই প্রসঙ্গে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী সত্যই লিখেছেন : "আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, দেশের সর্ববিধ কর্মী ও সংস্কারকের জন্য আশুবাবু মালমশলা জোগাইয়া গিয়াছেন। এইটাই তাঁহার প্রধান কীর্তি। এই হিসাবেই তিনি স্রষ্টা। অনেকের উপরে তাঁহার স্থান।" এক অদম্য ইচ্ছাশক্তির মূর্ত বিগ্রহ আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সত্য সত্যই বিশ্ববিদ্যার আলয় করার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। সেই তাঁর সংকল্পসাধনের ইতিহাসটা বাঙালী তেমন করে জানতে চাইলো না যেমন করে জানা উচিত ছিল। ভারতবর্ষ জ্ঞানে-বিজ্ঞানে পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন পাবে—সেই ছিল তাঁর হৃদ্গত আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার জন্য ১৯০৮ সাল থেকে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি কী অমানুষিক পরিশ্রম করেছিলেন, কিভাবে মস্তিষ্ক চালনা করেছিলেন তা তিনি নিজের মুখেই ব্যক্ত করেছেন। ১৯১৪ সালের কনভোকেশন বক্তৃতার একস্থানে আশুতোষ বলেছিলেন : "Of myself I may say with good conscience that if often I have not spared others, I have never spared myself. For years now, every hour, every minute that I could spare from other unavoidable duties—foremost among them the duties of my judicial office—has been devoted by me to University work." এর মধ্যে 'has been devoted'—এই কথাটি লক্ষণীয়। প্রবল কর্মৈষণার সঙ্গে তনুমন নিবেদিত এই যে devotion বা নিষ্ঠা, ইহাই তো আশুতোষের কর্মজীবনের প্রথম ও প্রধান কথা।

তাঁর চক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কী মহিমান্বিত রূপ উদ্ভাসিত হয়েছিল তা আশুতোষের এই সময়কার একটি কনভোকেশন বক্তৃতার মধ্যে আমরা পাই। তিনি বলেছিলেন: "No University can rightly be regarded as fulfilling the purpose of its existence unless it enables intellectual powers whenever detected, to exercise its highest functions." বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তিনি এই আদর্শ পোষণ করতেন বলেই না তাঁর পক্ষে স্বীয় প্রতিভার সবটুকু শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে অমনভাবে উজার করে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। স্যর মাইকেল স্যাডলার সত্যই বলেছেন: "He (Sir Asutosh) could have ruled on empire. But he gave the best of his powers to education." কথাটি সত্য। একটি সাম্রাজ্য শাসন করবার উপযুক্ত প্রতিভাই আশুতোষের ছিল, কিন্তু সেই প্রতিভা তিনি নিয়োগ করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কার্যে। যে সুদীর্ঘকাল তিনি এই কাজে রত ছিলেন, আমরা দেখতে পাই সেই একই সময়ে তিনি হাইকোর্টের জজিয়তীর দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই কর্মশক্তির তুলনা নেই। তিনি যে তাঁর সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-সংস্কারক হোতে পেরেছিলেন, তার মূলে ছিল এই প্রচণ্ড কর্মশক্তি। বস্তুত, এই শতকের ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষা বিস্তারকল্পে একা আশুতোষ কী সমস্যাসঙ্কুল পরিবেশের মধ্যে থেকে যে কী অসাধ্যসাধন করে গিয়েছেন, একমাত্র সেই বিষয়ে যথাযথ আলোচনা করতে গেলে কয়েক খণ্ড বই লিখতে হয়। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক জীবনীকার যথার্থই লিখেছেন: "It is impossible to realize the magnitude of his achievements, the excellence of his striving and the quality of his labours and his sacrifice," এ কথা মিথ্যা নয় জীবনে তাঁর অনুরাগের বিষয় ছিল এই কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং এই অনুরাগের পিছনে যে বিপুল পরিমাণ আত্মত্যাগ আমরা দেখতে পাই, এই দেশে শিক্ষা-সংস্কারের ক্ষেত্রে তেমন আত্মত্যাগ খুব কম লোকই দেখাতে পেরেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায় হোল এর রূপান্তরের ইতিহাস। এ রূপান্তর যেমন তেমন ছিল না—এ ছিল একেবারে 'total transformation' আর এই রূপান্তর

সাধিত হয়েছিল একজনেরই চেষ্টায়। তিনি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। সেই হিসাবে তাঁর জীবনেতিহাসের ইহাও একটি অত্যুজ্জ্বল অধ্যায়। লর্ড লিটনই তো আশুতোষের মৃত্যুর পর সিনেটে অনুষ্ঠিত এক শোক-সভায় সভাপতি হিসাবে সেই স্মরণীয় উক্তিটি করেছিলেন: 'For many years Sir Asutosh was in fact the University and the University was Sir Asutosh." বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধাতাপুরুষ হিসাবে আশুতোষ যেসব কাজ করেছিলেন, তার আনুপূর্বিক ইতিহাস যাঁদের জানা আছে, তাঁরাই স্বীকার করবেন যে লর্ড লিটনের (এই লাট লিটনই আশুতোষের তেজস্বিতার পরিচয় পেয়ে একসময়ে বিস্মিত হয়েছিলেন, সে কাহিনী যথাস্থানে বলব।) এই উক্তি আদৌ অত্যুক্তি ছিল না। তাঁর সর্বক্ষণের চিন্তায় ও ধ্যানে এবং তাঁর সকল কাজে বিশ্ববিদ্যালয় এতখানি স্থান জুড়ে ছিল যে আশুতোষ অনায়াসে বলতে পারতেন: "I am the University"– "আমিই বিশ্ববিদ্যালয়।"

১৯০৬ সালে আশুতোষ যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন তখন এই বিশ্ববিদ্যালয় কি ছিল? এর একটা সুন্দর চিত্র দিয়েছেন দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'আশুতোষ স্মৃতিকথা' গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন: "১৯০৪ খৃস্টাব্দের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল একটি পরীক্ষাশালা মাত্র। এই প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা সম্বন্ধে আইন-কানুন, পরীক্ষার্থীদের নাম-ধাম, সংখ্যা, কোন্ স্কুল-কলেজ হইতে কোন্ পরীক্ষা দেওয়া হয়, তাহার তালিকা, প্রশ্ন প্রস্তুত করা ও তাহা ছাপানো, পাসের তালিকা—ইত্যাদি পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় সম্পাদিত হইত এবং সিনেট-সিণ্ডিকেট প্রধানত এই সমস্ত বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিলে বৃত্তি, পদক ও উপাধি প্রভৃতি বাৎসরিক কনভোকেশনে ভাইস-চ্যান্সেলার ঘোষণা করিতেন এবং বড়োলাট চ্যান্সেলারস্বরূপে বৎসরের মধ্যে একবার কনভোকেশনে উপস্থিত হইয়া এই উৎসবের সৌষ্ঠব বর্ধন করিতেন। সিনেটের থামওয়ালা বড়ো একতলা বাড়িটা এইসকল বিষয়ের জন্য সুপ্রচুর বলিয়া বিবেচিত হইত।

সিনেট হলের* সম্মুখ দিকের বাসঘরের গৃহে রেজিষ্ট্রার বসিতেন এবং কনভোকেশনের সময় লাটসাহেব সেই ঘরে যাইয়া তাঁহার বেশ বদলাইয়া বিদ্যায়তনের উপযোগী পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। দক্ষিণ দিকের কামরায় অ্যাসিস্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রার বিরাজ করিতেন। সিনেট হলের পশ্চিম দিকে ছোটো-খাটো সভা-সমিতি হইত এবং বৎসর ভরিয়া অল্পসংখ্যক কেরানিরা পরীক্ষা-সংক্রান্ত সমস্ত কাজ করিতেন।"

এই ধারাই চলেছিল প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ 'Advancement of learning'—অর্থাৎ জ্ঞানের প্রসার এইভাবেই রূপায়িত হোত। তারপর নবগঠিত বিশ্ববিদ্যালয় আশুতোষের নেতৃত্বে নতুন রূপ ধারণ করল। নতুন এবং বিরাট রূপ। উঠে গেল সিনেটের পিছনের মাধববাবুর বাজার, সেখানে নির্মিত হোল পাঁচতলা দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং। এ তো গেল বহিরঙ্গ ব্যাপার। তারপর তিনি উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করলেন—খুললেন স্নাতকোত্তর বিভাগ। ইহাই তাঁর সুমহতীকীর্তি। ১৯০৬ থেকে ১৯১৪ এই আট বছরকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ইতিহাস তাকে বলা যেতে পারে "reorganisation, reform and revolution"-এর ইতিহাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি বিভাগে এইসময়ে আমূল সংস্কার প্রবর্তিত হয় এবং এরই ফলে বিশ্ববিদ্যালয় একটি শ্রেষ্ঠ "Teaching University"-তে পরিণত হয়। এই অসাধ্যসাধন করতে গিয়ে আশুতোষকে কি পরিমাণ স্বার্থত্যাগ করতে হয়েছিল তার কিছু ইঙ্গিত তিনি দিয়েছিলেন তাঁর ১৯১৪ সালের কনভোকেশন বক্তৃতায়। ঐ বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন: "Plans and schemes to heighten the efficiency of the University have been the subject of my day dreams, they have haunted me in the hours of nightly rest. To University concerns I have sacrificed all chances of study and research, possibly, to some extent, the interests of family and friends, and certainly, I regret to say, a good part of my health and vitality." অথচ, ভাবলে দুঃখবোধ হয়, এর বিনিময়ে দেশবাসীর কাছ

* অধুনা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সেই হলটি বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে।

থেকে কৃতজ্ঞতা বা সহানুভূতিলাভ দূরে থাক, এই শিক্ষাব্রতীকে আজীবন প্রতিকূল সমালোচনার সম্মুখীন হোতে হয়েছিল।

আজ যখন আমরা কল্পনা করি, জ্ঞান-পথের পথিক আশুতোষ নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, পারিবারিক উন্নতির চিন্তা, সব কিছুই বিসর্জন দিয়ে দেশব্যাপী উচ্চশিক্ষার এক বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন এবং সেই যজ্ঞের হোতা, অধ্বর্য সব তিনিই ছিলেন, তখন তাঁর কীর্তির বেদীমূলে আমরা মাথা নত না করে পারি না। দীনেশচন্দ্র সত্যই লিখেছেন: "আশুতোষ সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যে তাঁহার যোগিজনোচিত একাগ্র সাধনা নিয়োগ করিয়াছিলেন।" বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি যে এতটা একাত্মতা অনুভব করতেন, তাঁর সেই অনুভূতির প্রাক্স্ফুরণের ইতিহাসটা এখানে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। আমরা দেখেছি প্রকৃতিদত্ত অনুরাগের ফলেই আশুতোষ পাঠ্যাবস্থা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কাগজপত্র পাঠ করতে ভালোবাসতেন এবং সেই বয়সেই তিনি জ্ঞাতব্য বিষয় আয়ত্ত করবার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন। ১৮৮৬ সাল। আশুতোষ স্টুডেণ্টশিপ পরীক্ষা দেবেন। তখন প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তির জন্য আর্ট ও সায়েন্স, এই দুটি বিষয়ে পরীক্ষা হোত। সিনেট থেকে নিয়ম পাস হোল যে বিজ্ঞানে বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রদের বিলেতে গিয়ে তিন বছর পড়ে আসতে হবে। কারণ দেখানো হয় যে, ভারতে বিজ্ঞান-শিক্ষার যোগ্য কোনো প্রতিষ্ঠানই নেই, এদেশে লেবরেটরি ও প্রয়োজনীয় যন্ত্র প্রভৃতির অভাব ইত্যাদি। আশুতোষ এই নিয়মের প্রতিবাদ করে সেই সময়ে এক পত্রে সুযুক্তিপূর্ণ যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, তা পাঠ করে সিনেটের ভারতীয় ও ইংরেজ সকল সদস্যই চমৎকৃত হয়েছিলেন এবং তাঁর সেই প্রতিবাদটি সিনেটে গ্রাহ্য হয়েছিল। তখন আশুতোষের বয়স মাত্র বাইশ বছর।

আশুতোষ লিখেছিলেন: "এদেশে এখনো সামাজিক নিয়ম এত কঠোর যে, বহু মনস্বী ছাত্র বিলাতে যাওয়ার শর্তে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষা দিতে স্বীকৃত হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, বাৎসরিক বৃত্তি মাত্র ১৬০০৲ টাকা। বিলাতে তিন বৎসর থাকিতে হইলে বৃত্তিভোগী ছাত্র সাকুল্যে ৪৮০০৲ টাকা পাইবেন। কিন্তু সর্বসমেত তাঁহাকে খরচ করিতে হইবে ১১০০০৲ টাকা। বাকি টাকার

সংস্থান হইবে কিরূপে? তারপর বিলাত হইতে আসিয়া সেই ব্যক্তি এখানে লেবরেটরির অভাবে গবেষণা ও বিদ্যাচর্চা করিতে পারিবে না। যেখানেই সে কাজ করুক না কেন, য়ুরোপীয়দের বেতনের ⅓ অংশমাত্র পাইবে। ··এইভাবে বিলাতে ছাত্র পাঠাইয়া টাকা খরচ করিয়া যদি কর্তৃপক্ষ বাস্তবিকই বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উন্নতি করিতে ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, তবে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের লেবরেটরির উন্নতি করুন তাহা হইল দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রকৃত বিস্তার ও পুষ্টি সাধিত হইবে।"

বাইশবছরের যুবকের লেখা এই পত্র "হয়ত আজকালকার মাপকাঠিতে দোষবিবর্জিত না হইতে পারে, কিন্তু সেই তরুণ বয়সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি-নিয়ম লইয়া তিনি এতটা মাথা ঘামাইতেন। ইহা কি আশুতোষের চরিত্রের ও মনোভাবের একটা দিগ্‌দর্শনী নহে?" কথিত আছে, সিনেটের অধিবেশনের আগে এই চিঠি আশুতোষ সদস্যদের হাতে হাতে বিলি করেছিলেন। স্বনামধন্য উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonnerjee) এই চিঠিখানি পাঠ করে এই মর্মে মন্তব্য করেন: "There is enough sense in this letter." এই চিঠির ফল ফলেছিল। বিজ্ঞান-বিভাগের প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ পরীক্ষার্থীর বিলেত যাওয়ার শর্তটা তুলে দেওয়া হয়। এই দৃষ্টান্তটি এখানে উল্লেখ করলাম শুধু এই কথাটা বলবার জন্য যে পাঠ্যাবস্থা থেকেই আশুতোষ যেন তাঁর প্রাণ মন ঢেলে দিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর। এই অনুরাগই পরবর্তীকালে যোগিজনোচিত্ত সাধনায় পরিণত হয়েছিল।

১৯০৭। ভাইস-চ্যান্সেলাররূপে আশুতোষ তাঁর প্রথম কনভোকেশন বক্তৃতা দিলেন। পরবর্তীকালে ভাইস-চ্যান্সেলাররূপে তিনি আরো অনেক বক্তৃতা করেছেন। কিন্তু তাঁর এই প্রথম বক্তৃতাটি নানা কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বক্তৃতায় তিনি যেসব কথা বলেছিলেন তার অনেকগুলি আজো তাদের মূল্য হারায়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এমন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুতে সমবেদনা প্রকাশ করে এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আশুতোষ তাঁর বক্তৃতাটি আরম্ভ করেছেন। পণ্ডিত মহেশচন্দ্র

ন্যায়রত্ন, আনন্দমোহন বসু, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌলভি আব্দুল হাই, র‍্যাল্ফ্ টমাস হচকিন গ্রিফিথ ও পণ্ডিত লক্ষ্মীশঙ্কর মিত্র—এই সাতজনের উল্লেখ করে তিনি যে ভাষায় সমবেদনা জানিয়েছেন তা তাঁর সংবেদনশীল মনেরই পরিচায়ক। এমন কি তিনি তাঁর বক্তৃতায় প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের মৃত্যুতেও গভীর শোক প্রকাশ করে বলেছিলেন: "It is not much to the credit of the wealthy aristocracy of these Provinces, that his princely benefaction has not been liberally imitated." এ ছাড়া, পেডলার প্রভৃতি যাঁরা সে বছর অবসর গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের কথাও তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

এই বক্তৃতায় তিনি নূতন নিয়মাবলী (New Regulations) সম্পর্কেই বেশি করে আলোচনা করেছেন এবং সেই সঙ্গে স্কুল ও কলেজগুলি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আসার ফলে ইহাদের সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব কতখানি সেই বিষয়টিও তিনি সুন্দরভাবে আলোচনা করেন। বাংলা-দেশে বিশ শতকের প্রারম্ভে শিক্ষা-সম্পর্কিত সমস্যাটির এমন সামগ্রিক আলোচনা এর আগে আর কেউ করতে পারেননি, পরেও না। তাঁর এই বক্তৃতাটি প্রত্যেক শিক্ষাবিদের যত্নের সঙ্গে পাঠ করা উচিত। স্কুলের ছাত্রদের জীবনে আজ আমরা যে উচ্ছৃঙ্খলতা লক্ষ্য করি এবং যার ফলে দেশের ছাত্র-সমাজের শিথিল আচরণ সমাজের পক্ষে উদ্বেগের কারণ হোয়ে উঠেছে, ভাবলে আশ্চর্য বোধ হয়, আশুতোষ কত কাল পূর্বে এই সমস্যাটির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন। "Sound education should be imparted and discipline should be enforced in all schools."—এই কথা সেদিন স্কুলের কর্তৃপক্ষদের উদ্দেশ করে তিনি বিশেষভাবে বলেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার মান ঠিকভাবে বজায় রাখতে হোলে ছাত্রদের স্কুলজীবনের বনিয়াদটা পাকাপোক্ত ভাবে যে গড়ে তোলা উচিত, এই মূল কথাটা আজ আমরা একরকম বিস্মৃত হয়েছি বলেই না সামগ্রিকভাবে দেশে শিক্ষার মান শোচনীয়ভাবে নেমে গিয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার রূপ ও রীতি (আশুতোষের কথায় 'tone and standard') ঠিকমত যাতে বজায় থাকে সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি স্কুলগুলির উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা দাবী

করেছিলেন এবং নবগঠিত নিয়মাবলীর মাধ্যমে সেই ক্ষমতাকেই তিনি বাস্তবে রূপায়িত করতে অগ্রসর হয়েছিলেন।

তাঁর এই বক্তৃতার আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তিনি উত্থাপন করেছিলেন। সেটি হোল কলেজের ছাত্রদের আবাসের সমস্যা। কলিকাতা শহরে বহিরাগত কলেজছাত্রদের থাকবার প্রশ্নটি ইতিপূর্বে কি বিশ্ববিদ্যালয়, কি শিক্ষা-অধিকর্তা কারো তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। অথচ দিন দিন কলেজের ছাত্রসংখ্যা এই শহরে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আশুতোষ তাই সমগ্র বিষয়টি অনুধাবন করে তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন: "বহিরাগত ছাত্রদের সকলপ্রকার প্রলোভন থেকে রক্ষা করবার জন্য আবাসিক প্রথা সম্পর্কে নূতন নিয়মাবলীতে যা বলা হয়েছে, সে বিষয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশ আছে বলে আমি মনে করি না।" বলেছিলেন: "If the residential system ultimately takes root and obtain a firm hold of the mind of our people, the time may come when all our colleges will be converted into truly residential colleges of the type so familiar in the Universities of the West." সেদিন অনেকেই আশুতোষের এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করেছিলেন।

এই বক্তৃতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক, লেকচারার এবং রীডার নিযুক্ত করা সম্পর্কেও তিনি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন এবং বলেন, "যেহেতু এখন থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু পরীক্ষা গ্রহণের কেন্দ্র না হয়ে ইহা শিক্ষাদানেরও কেন্দ্র হয়ে উঠবে, সেই হেতু অধ্যাপক প্রভৃতি নিয়োগের প্রশ্নটি এখন থেকেই চিন্তা করতে হবে, যদিও বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সঙ্গতি তেমন আশাপ্রদ নয়, তথাপি উচ্চশিক্ষার বিস্তারের জন্য যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন করেই হোক সেই সিদ্ধান্তকে আমাদের কার্যে পরিণত করতেই হবে। অল্পসংখ্যক হোলেও কিছু অধ্যাপক, লেকচারার ও রীডার নিয়োগ করতে হবে এবং এর জন্য অর্থের ব্যবস্থা করতে হবে।" তখন থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ করবার জন্য উৎকণ্ঠিত আশুতোষ কী রকম প্রয়াস পেয়েছিলেন, সে কাহিনী আমরা যথাস্থানে বলব।

কিন্তু তাঁর এই কনভোকেশন বক্তৃতাটির উপসংহারে সদ্য উপাধি-প্রাপ্ত ছাত্রদের উদ্দেশ করে তিনি যে সারগর্ভ কথাগুলি বলেছিলেন তাই-ই এই বক্তৃতাটিকে একটি স্বতন্ত্র মূল্য দিয়েছে। তিনি বলেছিলেন: "হে আমার গ্রাজুয়েটবৃন্দ, তোমরা কি সম্পূর্ণরূপে এই উপাধি লাভের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছ? বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতির ছাপ ললাটে ধারণ করে অতঃপর তোমরা যখন কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে, তখন তোমরা তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে কি সচেতন থাকবে না? মনে করো না এখনি কিংবা স্নাতকোত্তর শিক্ষা লাভের পর তোমাদের জ্ঞানানুশীলনে পূর্ণচ্ছেদ পড়ল। মনে রেখো, জ্ঞানের আরম্ভ আছে, শেষ নাই। এখন থেকেই তো তোমাদের বিশেষ শিক্ষা আরম্ভ হোল এবং অতঃপর তোমাদের নিজস্ব চেষ্টায় সেই শিক্ষা আয়ত্ত করতে হবে, কোনো শিক্ষক তোমাদের আর সহায়ক হবেন না। জীবনব্যাপী এই যে শিক্ষার সাধনা, এযে কেবল তোমাদের নিজেদের জন্য প্রয়োজন তা নয়—তোমাদের লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর উন্নতিসাধনের জন্যই ইহার প্রয়োজনীয়তা। যদিও তোমরা আকণ্ঠ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির রস পান করেছ, তবু ভারতীয় রীতি-নীতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ, যা কিছু উপাদেয় কোনোমতেই তা তোমরা উপেক্ষা করবে না। পাশ্চাত্যের চোখ-ধাঁধানো আলোয় তোমাদের মহামূল্য উত্তরাধিকার বিসর্জন দেবে না। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যা কিছু সারবান তার প্রশংসা করতে গিয়ে, কোনো অবস্থাতেই তোমরা বিজাতীয় ভাবাপন্ন হবে না। ("Never denationalise yourselves")। তোমরা যে প্রকৃত ভারতীয় ইহা অস্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবে না। তোমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, রুচি এবং আচার-আচরণে কখনো যেন বৃথাগর্ব প্রকাশ না পায়। সকলের উপর, তোমরা তোমাদের মাতৃভাষার অনুশীলন করবে, কারণ য়ুরোপীয় শিক্ষার যে মহামূল্য সম্পদ তোমরা আহরণ করেছ, তোমাদের দেশবাসীর কাছে তা পৌঁছে দেবার ইহাই একমাত্র উপায়। ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের শুভ ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব তোমরা যেমন করবে তেমনি ইংলণ্ডের উপর ভারতের দাবীরও প্রতিনিধিত্ব তোমরা করবে। তোমাদের কর্মজীবনের কৃতিত্বে উত্তরপুরুষ সত্যই যেন গর্ববোধ করতে পারে, তাহলেই যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা দিয়ে তোমাদের লালন-পালন করেছে, তার গৌরব ও সুনাম বৃদ্ধি পাবে।"

সেদিনও যেমন, আজো তেমনি আশুতোষের এই কথাগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্রগোষ্ঠীকে উদ্দেশ করে বলা যেতে পারে। ভারতবর্ষের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো উপাচার্যই আজ পর্যন্ত ছাত্রদের সম্পর্কে এমন সুচিন্তিত কথা বলতে পারেননি। এ বিষয়ে আশুতোষের মতো বুঝাবার শক্তি অন্যত্র বিরল।

১৯০৮। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হোল। এই বছর সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব আর কনভোকেশনের অনুষ্ঠান একসঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। তাঁর এই বক্তৃতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তিনি তুলে ধরবেন, আশুতোষের এই রকম একটি ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যেহেতু সুবর্ণ-জয়ন্তী উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করবার আয়োজন হয়, সেজন্য তিনি তাঁর ভাষণে বর্তমান প্রসঙ্গ নিয়েই আলোচনা করে ক্ষান্ত হন। তাঁর প্রত্যেকটি কনভোকেশন বক্তৃতার প্রারম্ভে একটি বিষয়ের উল্লেখ থাকতো। অর্থ, শ্রম বা প্রতিভা, এর যে কোনো একটি দ্বারা যে কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করেছেন, তাঁদের মৃত্যুতে বা অবসর গ্রহণ আশুতোষ যে ভাষায় ও যে ভঙ্গিতে তাঁর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন, তা অতুলনীয়। এই কর্তব্যপালনে ভাইস-চ্যান্সেলার আশুতোষের মধ্যে সংবেদনশীল যে মানুষের পরিচয় পাই, তার প্রকৃতি গঠিত হয়েছিল উনিশ শতকীয় বাংলার মানবিকতা-ঋদ্ধ চিন্তাধারায়। ১৯০৮ সালের বক্তৃতায় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বাবু শ্রীনাথ দাস, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত এবং ডক্টর ময়রের মৃত্যুতে তিনি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন আর মিস্টার র‍্যাটক্লিফ, ডক্টর উইলিয়াম বুথের অবসর গ্রহণে তাঁদের উদ্দেশে প্রশস্তি রচনা করেন। গণিতাচার্য বুথ সাহেব তাঁর শিক্ষক ছিলেন। এদেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের প্রয়াস এবং দানের কথা স্মরণ করে আশুতোষ বলেছিলেন: "He was a true friend of education and a sincere promoter of learning." বস্তুতঃ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর এর উন্নতি ও বিকাশ সাধনে যেসব বাঙালী সন্তান প্রথম যুগে মুক্তহস্তে অর্থ দান করেছিলেন,

সেই ইতিহাস আজ বিস্মৃতির অন্তরালে চাপা পড়েছে। এদেশে শিক্ষা বিস্তারে সরকারী অর্থসাহায্যের পাশাপাশি দেশীয় লোকের অর্থসাহায্য বড়ো কম ছিল না। বরং অনেকক্ষেত্রেই বিস্ময়জনক ভাবে তা সুপ্রচুর ছিল। এক তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষের দানের কথা স্মরণ করলেই শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা নত হোয়ে আসে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই সময়ে দুইটি ঘটনা উল্লেখ্য। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে যথাক্রমে দ্বারভাঙ্গার মহারাজা ও বাবু গুরুপ্রসন্ন ঘোষ আড়াই লক্ষ টাকা করে পাঁচ লক্ষ টাকা দান করেন। চল্লিশ বছর আগে বোম্বাইয়ের ধনকুবের প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ দুই লক্ষ টাকা এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর তিন লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। দ্বারভাঙ্গা মহারাজার টাকায় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ভবন নির্মিত হয় আর গুরুপ্রসন্ন ঘোষের টাকায় তাঁর নামে একটি স্কলারশিপ বা বৃত্তি স্থাপিত হয়। এই বৃত্তির সাহায্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্র পরবর্তীকালে য়ুরোপ, আমেরিকা ও জাপানে গিয়ে শিল্প বিদ্যায় জ্ঞানলাভ করে এসেছেন। আশুতোষের এই বক্তৃতা পাঠে জানতে পারা যায় যে এই সময় বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তিনজন রীডার নিযুক্ত করেছিলেন যথা, ডক্টর থিবো, অধ্যাপক সুস্টার এবং ডক্টর হল্যাণ্ড। থিবোর বক্তৃতার বিষয় ছিল—গ্রহবিজ্ঞানে প্রাচীন প্রাচ্য জাতিসমূহের দান; সুস্টার বক্তৃতা দিয়েছিলেন আধুনিক পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে আর হল্যাণ্ড বক্তৃতা দিয়েছিলেন ভারতবর্ষের ভূ-বিদ্যা সম্পর্কে। সেদিন এইসব প্রখ্যাত অধ্যাপক-প্রদত্ত বক্তৃতামালা বিশ্ববিদ্যালয়ের যথেষ্ট গৌরব বর্ধন করেছিল। আশুতোষ কেবল বিদেশ থেকেই অধ্যাপক আমন্ত্রণ করেননি, স্নাতকোত্তর ছাত্রদের জ্ঞানের উৎকর্ষ বিধানের জন্য তিনি দেশীয় অধ্যাপক দ্বারাও বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছিলেন। পালি ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে বক্তৃতা দিলেন বিখ্যাত মারাঠী পণ্ডিত কোশাম্বী; বেদ-পারঙ্গম আচার্য সত্যব্রত সামশ্রমী বক্তৃতা দিলেন বেদের উপদেশ সম্পর্কে। এই সময়ে দেখা যায় যে আশুতোষ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বেদান্তদর্শন সম্পর্কে নিয়মিত পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করেছেন এবং এজন্য তিনি বাবু শ্রীগোপাল বসু মল্লিকের অর্থানুকূল্যে খ্যাতনামা পণ্ডিত রামাবতার শর্মাকে বক্তৃতা দেবার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন।

দু'বছরের মধ্যেই আশুতোষ যেন বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অভূতপূর্ব কর্মপ্রবাহের সৃষ্টি করলেন এবং এই প্রতিষ্ঠানটিকে যথার্থ একটি বিদ্যামন্দিরের মর্যাদা দেবার জন্য কৃতসংকল্প হোলেন। পঞ্চাশ বছর কাল যাবৎ যে প্রতিষ্ঠানটি ছিল নিছক একটি পরীক্ষা গ্রহণের কেন্দ্র স্বরূপ, আজ তাই-ই নবকলেবর ধারণ করতে চলেছে আশুতোষের নেতৃত্বে। তাইতো দেখতে পাই যে, তাঁর দ্বিতীয় কনভোকেশন বক্তৃতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আশুতোষ বললেন: "The present conception of the function of the University is, that it is an institution for the acqusition, conservation, refinement and distribution of knowledge." বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্বিন্যাসে তিনি এই আদর্শকেই বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য তাঁর সমস্ত প্রতিভা ও পরিশ্রম নিয়োগ করেছিলেন এবং তিনি কি পরিমাণ সাফল্য অর্জন করেছিলেন তা আমরা ক্রমে ক্রমে দেখতে পাব। আশুতোষের শিক্ষা-চিন্তার ধারা অনুসরণ করবার পক্ষে তাঁর প্রথম আটবছরের কনভোকেশন বক্তৃতাগুলি যত্নের সঙ্গে পাঠ করতে হয়। এই জ্ঞানতাপস বিশেষ ভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিক্ষাকে গৌণ করে পরীক্ষা গ্রহণ ও উপাধি বিতরণের কাজটাকে মুখ্য করে তোলার ফল আদৌ কল্যাণপ্রসূ হয় নি। তাঁর দ্বিতীয় কনভোকেশন বক্তৃতায় তিনি এই বিষয়টির বিশদ আলোচনা করেছেন দেখা যায়। তাঁর পূর্বে 'research' বা গবেষণা সম্পর্কে বিশ্ব বিদ্যালয়ে কোনো ব্যবস্থা তো ছিলই না, বরং এই কথা বলা যেতে পারে যে, সিনেট তখনো পর্যন্ত এই বিষয়ে যথাযথ চিন্তা পর্যন্ত করেননি। উচ্চশিক্ষা গবেষণা ভিন্ন সম্পূর্ণ হয় না, এই অভিমত প্রকাশ করে সেদিন আশুতোষ বলেছিলেন: "বিংশ শতাব্দীর এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের যুগে শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ গবেষণার গুরুত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা অথবা বিতর্ক উত্থাপন করা আমাদের পক্ষে সমীচীন হবে না; ছাত্রদের মধ্যে গবেষণা প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলা এবং এই বিষয়ে তাদের আনুকূল্য করার মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত সার্থকতা। আমাদের এই বিদ্যাপীঠ সকল রকম গবেষণার পথ প্রশস্ত করে দেবে—ইহাই আমার অভিপ্রায়।"

য়ুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিচয় যে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই হওয়া

প্রয়োজন, এই বিষয়টির আলোচনা প্রসঙ্গে আশুতোষ তাঁর এই বক্তৃতার উপসংহারে সেই বিখ্যাত উক্তিটি করেছিলেন : "Western light should reach us through Western gates and not through lattices work in the Eastern windows," সেদিন এই বিষয়টি নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের প্রথম এডুকেশান ডেসপ্যাচ থেকে শুরু করে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হবার কুড়ি বছর কাল পর্যন্ত এবং লর্ড মেকলের বিখ্যাত Minute থেকে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিকের শিক্ষাসংক্রান্ত সেই বিখ্যাত প্রস্তাব পর্যন্ত অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত কোম্পানীর আমলে এই দেশে শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে আশুতোষ রাজা রামমোহন রায়ের মতের পুনরুক্তি করেই সেদিন বলেছিলেন "এইদেশে যাঁরা উচ্চতম শিক্ষালাভ করতে ব্যগ্র তাঁদের পক্ষে ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান থাকা নিতান্তই বাঞ্ছনীয়।"

এই বক্তৃতার উপসংহারে আশুতোষ স্নাতকদের লক্ষ্য করে বাংলার ছাত্র সমাজের উদ্দেশে একটি প্রয়োজনীয় কথা বলেছিলেন। যে সময়ে তিনি ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হয়েছিলেন, বাংলার ইতিহাসে সেই সময়টা ছিল স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। এই কালের যিনি অবিসম্বাদী নেতা ছিলেন সেই রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ যখন প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, "ছাত্রদের পক্ষে রাজনীতি বর্জনীয় নয়, আচরণীয়", তখন দেশের ছাত্রসমাজে এর তুমুল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। * সেদিন এটি একটি তুমুল বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছিল এবং যখন দেখা গেল যে, স্বদেশী আন্দোলনের ঘূর্ণাবর্তে কোমলমতি অনেক ছাত্র অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে রাজনীতির চর্চা শুরু করেছে, তখনই আশুতোষ সমগ্র সমস্যাটি অনুধাবন করেন এবং তাঁর কনভোকেশন বক্তৃতায় তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন, "Students of this University, allow not the pursuit of your studies to be disturbed by extra academic elements. Forget not that the normal task of the student, so long as

* লেখকের 'রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ' দ্রষ্টব্য।

he is a student, is not to make politics, nor to be conspicuous in political life.'' বলেছিলেন, "তোমরা পলিটিক্যাল ইকনমি পড়, পলিটিক্যাল ফিলজফি পড়, জুরিসপ্রুডেন্স এবং কনষ্টিটিউসনাল ল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন কর—ইতিহাসের সুমহান পাঠগুলি আয়ত্ত কর, কিন্তু যৌবনোচিত উৎসাহের প্রাবল্যে ভেসে গিয়ে রাজনীতির অনুশীলনে কখনো প্রমত্ত হবে না।" আরো বলেছিলেন: "Devote yourselves, theretore to the quiet and steady acquisition of physical, intellectual and moral habits and take to your hearts the motto: 'Self-rev erence, self-knowledge, self-control'—these there alone lead life to sovereign power.

সেদিনও যেমন, আজো তেমনি মনে হয় ছাত্রদের সম্পর্কে আশুতোষের এই সাবধান-বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এত বড়ো ছাত্রসুহৃদ শিক্ষাবিদ্ বাঙালী বহুদিন দেখেনি। ছাত্রদের রাজনীতির বাইরে রাখবার চেষ্টা করে তিনি ভালো করেছিলেন কি মন্দ করেছিলেন, এই বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে আমরা শুধু এই কথা বলব যে আত্ম-শ্রদ্ধা, আত্ম-জ্ঞান ও আত্ম-শক্তির উপর নির্ভর করে জীবন ও চরিত্র গঠন করবার জন্য আশুতোষ ছাত্রদের যেসব উপদেশ দিয়ে গেছেন, আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতিসাধনের পক্ষে এর চেয়ে ভালো উপদেশ আর কেউ দিতে পারেননি।

॥ ছয় ॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েয় পুনর্বিন্যাস সাধনে আশুতোষের একাগ্র প্রয়াসকে তাঁর এক জীবনীকার "New creations' বা নবসৃষ্টি বলে অভিহিত করেছেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান ও আইন শাস্ত্রের পঠন-পাঠন—এই ত্রিধারায় অভিব্যক্ত হয়েছিল এই সৃষ্টি। কিন্তু কেবল মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠন বা এর জন্য নূতন নূতন ইমারত নির্মাণের ব্যবস্থা করেই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না— যে উৎসমূল থেকে এর উন্নতিবিধানের উপকরণ ও উপাদান সংগ্রহ ভিন্ন এই উন্নতি স্থায়ী হোতে পারে না, তিনি সর্বাগ্রে সেইদিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন এবং সেখানে তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে স্কুল-কলেজগুলির উন্নতি ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি কিছুতেই সম্ভব নয়। আমরা আগেই বলেছি যে, লর্ড কার্জনের আমলে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে যে কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল তার রিপোর্ট যখন প্রকাশিত হয় তখন সংবাদপত্রে ও কাউন্সিল গৃহে এই নিয়ে তুমুল বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। ঐ রিপোর্টে স্কুল-কলেজগুলির উপর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে যে ক্ষমতা দেবার প্রস্তাব করা হয়, সেটা অনেকেরই পছন্দ হয়নি। তারপর নূতন আইন প্রবর্তিত হবার পর আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হোলেন এবং তিনি প্রথমেই এই দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন। এই কাজটা ইংরেজিতে যাকে বলে 'Thankless job'—অনেকটা তাই ছিল। সেই নীরস এবং ঘোরতর প্রতিকূল সমালোচনার দ্বারা কণ্টকিত কর্তব্য সম্পাদনে আশুতোষ যে বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন তার সম্যক মূল্যায়ন বোধহয় আজো করা হয়নি।

তখনকার বাংলা প্রদেশ মানে বাংলা বিহার উড়িষ্যা ও আসাম আর তার সঙ্গে ব্রহ্মদেশ— এই ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা। এই বিস্তীর্ণ

এলাকার মধ্যে সাতশত স্কুল এখানে ওখানে ছড়ানো ছিল আর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কলেজগুলির সংখ্যা ছিল ষাট। কলেজগুলিও এখানে-ওখানে ছড়ানো ছিল। অধিকাংশ বিদ্যালয়গুলির অবস্থা আদৌ সন্তোষজনক ছিল না। তখনকার স্কুল-কলেজগুলি সম্পর্কে সেই সময়ে আশুতোষ এই মন্তব্যটি করেছিলেন: "They are without exception undermanned, of libraries and laboratories, there are only few which can satisfactorily stand the scrutiny of most reasonable test." তাই সর্বাগ্রে তিনি স্কুল-কলেজগুলির আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে রীতিমত তদন্তের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। এর আগে নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা ছিল না—আশুতোষই এই প্রয়োজনীয় বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলতেন, মৃত্তিকার তলদেশ থেকে প্রাণ-রস আহরণ ভিন্ন যেমন গাছের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায় না, গাছ সতেজ হয় না, তেমনি স্কুল-কলেজগুলি যদি সুগঠিত ও সুপরিচালিত না হয়, যদি সেখানকার শিক্ষা-ব্যবস্থা ক্রটীহীন ভাবে না গড়ে ওঠে এবং ছাত্রদের মানসিক ও শারীরিক উৎকর্ষ বিধানে গোড়া থেকে মনোযোগ না দেওয়া হয়, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় তার প্রাণরস আহরণ করবে কোথা থেকে? তাঁর এই প্রয়াসের সুফল শীঘ্রই দেখা গেল এবং বাংলার স্কুল-কলেজগুলি অনতিবিলম্বে এক নূতন প্রাণ-প্রবাহে যেন সঞ্জীবিত হোয়ে উঠলো নূতন আদর্শে উদ্বুদ্ধ হোল। দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার চেহারাটাই যেন রাতারাতি পরিবর্তিত হোয়ে গেল কোন্ এক যাদুকরের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে। শিক্ষাক্ষেত্রে সেদিন এইটাই ছিল বিপ্লব।

এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের পঠন-পাঠনের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কোনো কলেজই এতদিন গড়ে ওঠেনি। এই ক্ষেত্রে আশুতোষের প্রথম পদক্ষেপ ছিল ইউনির্ভাসিটি ল-কলেজ। ১৯০৮ সালেই সিনেট সর্ববাদী সম্মতিক্রমে একটি ল-কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৮৫৪ সালে একটি ডেসপ্যাচে* বলা হয়েছিল যে, "It will be advisable to

* Wood's *Education Despatch, 1854*

establish in connection with the Universities, Professorships in various branches of learning and the most important of those branches is law." তারপর অর্ধশতাব্দীরও অধিক কাল গত হয়েছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে আইনের পঠন-পাঠনের জন্য একটি কলেজ স্থাপন করার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গিয়েছিল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট-সিণ্ডিকেটের কোনো সদস্য কিংবা আশুতোষের পূর্ববর্তী কোনো উপাচার্যই এই বিষয়টি সম্পর্কে চিন্তা করেননি। ১৯০৮ সালে তিনি এই বিষয়টি বিবেচনার জন্য সিণ্ডিকেটে উপস্থাপিত করেন; এই সম্পর্কে তাঁর রচিত একটি মিনিট থেকে আমরা কয়েক লাইন এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম। আশুতোষ বলেছিলেন: "The branch of our education system which stands in the need of the most urgent and radical reform is that concerned with teaching of law for our degree examinations. It is a noteworthy fact that we have not got a single College devoted entirely to the study of Law as we have in the cases of Medicine and Engineering" এই মিনিটের মধ্যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ল কলেজ স্থাপনের ইতিহাস সুন্দররূপে বিবৃত হয়েছে।

অনেকেরই হয়তো জানা নেই যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার বাইশ বছর আগে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয় এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এক বছর আগে। ১৮৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয় যখন স্থাপিত হয় তখন প্রেসিডেন্সী কলেজেই আইনের ক্লাস বসতো। সাত বছর পরে হুগলী, ঢাকা কৃষ্ণনগর, বহরমপুর ও পাটনা—এই পাঁচ জায়গায় সরকারী কলেজে আইন পড়াবার ব্যবস্থা হয়। ১৮৬৯ সালে কটক ও চট্টগ্রাম কলেজে এই ব্যবস্থা প্রসারিত হয়। ১৮৮০-তে এই ব্যবস্থা রাজসাহী কলেজে প্রবর্তিত হয়। কিন্তু এতগুলি ল ক্লাসের নিজস্ব কোনো সত্তা ছিল না—এগুলি সরকারী আর্টস কলেজগুলির অন্তর্ভুক্ত ছিল। বেসরকারী কলেজগুলির মধ্যে ১৮৮২ সালে মেট্রোপলিটান এবং তার পরের বছর সিটি কলেজে আইন পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হয়। ১৮৮৫ সালে তৎকালীন রিপন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে ল ক্লাস খুলবার অনুমোদন লাভ করে। বঙ্গবাসী কলেজও এই বিষয়ে

রিপন কলেজের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। পরবর্তী এগার বছর কালের মধ্যে কলিকাতার বাইরে কুচবিহার, ভাগলপুর, মেদিনীপুর, বাঁকীপুর, বরিশাল ও রেঙ্গুন এই ছয়টি কলেজে আইনের পঠন-পাঠন আরম্ভ হয়। এই ভাবে দেখা গেল যে, ১৯০৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত মোট আঠারটি কলেজে এই ব্যবস্থা ছিল। কোনো কলেজেই আইন সংক্রান্ত পুস্তকের একটিও উপযুক্ত গ্রন্থাগার ছিল না। অধিকাংশ কলেজেই আইনের অধ্যাপকগণ কৃতবিদ্য ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু যেসব ছাত্র আইন অধ্যয়ন করতো তারা এর প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং আদর্শ সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল বললেই হয়। ১৯০৮ সালে দেখা গেল যে, কলিকাতার বেসরকারী কলেজগুলির মধ্যে একমাত্র রিপন কলেজ ব্যতীত আর সব কলেজেই আইনের পঠন-পাঠন কম হয়ে যায়। মফস্বলের সমস্ত কলেজেই ল ক্লাস উঠে গেল। ঠিক এই সময়েই (১৯০৮) এলাহাবাদ, বোম্বাই ও মাদ্রাজের দৃষ্টান্তের অনুসরণে আশুতোষ কলিকাতায় একটি স্বতন্ত্র ল কলেজ স্থাপনের কথা বিশেষভাবে চিন্তা করেন। তাঁর এই চিন্তারই পরিণতি ইউনিভার্সিটি ল কলেজ। আইন শিক্ষার একটি যথার্থ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় হিসাবেই তিনি এই ল কলেজ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন।

৪ঠা জুলাই, ১৯০৮। ইউনিভার্সিটি ল কলেজ সংক্রান্ত আশুতোষের 'মিনিট' সম্পর্কে সিণ্ডিকেট যথাযথ আলোচনা করলেন এবং সিণ্ডিকেটের ঐ সভাতেই একটি ইউনিভার্সিটি ল কলেজ স্থাপন বিষয়ে প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। ১৭ই জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকালটি অব ল উক্ত মিনিট সম্পর্কে বিবেচনা করে সিণ্ডিকেটের প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। ২৭শে জুলাই সিনেটের এক সভায় ভাইস-চ্যান্সেলার রূপে আশুতোষ এই দুইটি প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন রেক্টর স্যর এণ্ড্রু ফ্রেজার সভাপতিত্ব করেন। এই সভাতেই আশুতোষ সেই বিখ্যাত উক্তিটি করেছিলেন "Law is neither a trade nor a solemn jugglery but a living science in the proper sense of the word." যুক্তরাষ্ট্রের গভর্নমেণ্ট সেই সময়ে পৃথিবীর বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রচলিত আইন শিক্ষার ধারা সম্পর্কে যে তদন্ত করেছিলেন, তার মধ্যে ভারতবর্ষের উল্লেখ ছিল না, এই বিষয়টা সভায় উল্লেখ

করে সেদিন তিনি বলেছিলেন "আমাদের সৌভাগ্যক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন শিক্ষার বিষয়টি এই তদন্তের অন্তর্গত হয় নি—যদি হোত তা হলে আমাদের মুখ রক্ষা হোত কিনা সন্দেহ।"

১৯০৯, জুলাই মাস।

বিশ্ববিদ্যালয় তথা আশুতোষের জীবনে একটি স্মরণীয় তারিখ।

ইউনিভার্সিটি ল কলেজ এই সময় থেকে আরম্ভ হয়। প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এস. সি. বাগচি। এঁর সম্পর্কে স্মারক গ্রন্থে বলা হয়েছে: "He was a scholar of eminence and jurist of reputation." অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন গোপালচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী, হারাধন নাগ, হরেন্দ্রনাথ সেন আর সহকারী অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র রায়, নির্মলচন্দ্র সেন, আব্দুল্লা মামুন সুরাবর্দী, জ্যোতিপ্রসাদ সর্বাধিকারী, হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, এন. এন. গুপ্ত ও বিরাজমোহন মজুমদার। ১৯১২ সালে বিরাজমোহন সহ-অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ল কলেজ পরিচালনার জন্য ষোলজন সদস্যকে নিয়ে একটি গভর্নিং বডি গঠিত হয়; তাঁর পদাধিকারের বলে ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন এর সভাপতি। নবনির্মিত দ্বারভাঙ্গা লাইব্রেরী ভবনের সংলগ্ন টালির ছাদের একটি ঘরে তখন ল কলেজ বসত; ছাত্রদের বেতন ব্যতীত কলেজের অন্য কোনো আর্থিক সংস্থান ছিল না। ১৯০৯ সালে ইউনিভার্সিটি ল কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫২০; পরে এই সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায়। বাংলা সরকার পাঁচ বছরের জন্য বার্ষিক সাড়ে তিন হাজার টাকা অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করেন আর ভারত সরকার প্রথমে বিশহাজার, পরে ত্রিশহাজার টাকা করে বছরে দান করতে থাকেন। ল কলেজের উন্নতিবিধানে ব্যক্তিগত দানের মধ্যে প্রথমেই কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কথা উল্লেখ করতে হয়। তিনি শুধু কৃষ্ণনাথ কলেজের ল ক্লাসটা বন্ধ করে দেননি, নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন; ঐ টাকায় কয়েকটি বৃত্তি স্থাপিত হয়। ল কলেজের নিজস্ব একটি গ্রন্থাগারের জন্য মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর প্রদান করেন দশহাজার টাকা; এই গ্রন্থাগারটি 'যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর গ্রন্থাগার' নামে পরিচিত; যতীন্দ্রমোহন প্রদ্যোৎকুমারের পিতা ছিলেন। এই যতীন্দ্রমোহন ১৮৮১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকালটি অব আর্টস-এর সভাপতি ছিলেন।

প্রদ্যোৎকুমারের পিতামহ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের আইন সম্পর্কিত একটি মূল্যবান সংগ্রহ ছিল ; সেটিও তিনি ল কলেজকে দান করেন। ১৯১২ সালে দ্বারভাঙ্গা লাইব্রেরী ভবনের দক্ষিণে দেড়লক্ষ টাকা দিয়ে একটি জমি কেনা হয়, ঐ জমির উপর চার লক্ষ টাকা ব্যয়ে ল কলেজ এবং হোস্টেল নির্মিত হয়। এর মধ্যে তিন লক্ষ টাকা ভারত সরকার থেকে পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের নবজাগরণে (এখানে আমরা বিশ শতকের কথাই বলছি) ইউনিভার্সিটি ল কলেজের দান অনেক। স্মারক গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে যথার্থই বলা হয়েছে : "The University Law Collge has been, during the course of its existence for nearly half a century, the nursery of leaders of the bar and the judiciary of these provinces including the High Courts" স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই ল কলেজের ছাত্র এবং পরে কিছুকালের জন্য তিনি এখানে অধ্যাপনাও কবেছিলেন। সুপ্রীম কোর্টেব দুইজন প্রধান বিচারপতি বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় ও সুধীরঞ্জন দাস এই কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং এঁরাও দুজনে এখানে কিছুকালের জন্য অধ্যাপনা করেছিলেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম নায়ক প্রমথ চৌধুরী এবং বিখ্যাত ছোটো গল্প লেখক ও ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও এখানকার শিক্ষক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ল কলেজের জন্য আশুতোষ সব সময়েই বেছে বেছে ভালো অধ্যাপক নিযুক্ত করতেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলার আছে। ইউনিভার্সিটির পক্ষে এই ল কলেজ আশীর্বাদস্বরূপ হয়েছিল। ১৯০৯ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত একমাত্র এই ল কলেজ থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকীর্ণ তহবিলে প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা এসেছে।

আমরা দেখেছি, তরুণ বয়স থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে আশুতোষের কী অপরিসীম অনুরাগ ছিল। বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁর আগে এবং পরে যাঁরা এসেছেন তাঁদের মধ্যে আশুতোষের মতন অনুরাগ বোধ করি আর কেউ দেখাতে পারেননি। এই অনুরাগই তাঁকে নূতন নূতন ব্যবস্থা

প্রবর্তনে প্রেরণা দিত। বলেছি, ভাইস-চ্যান্সেলার হিসাবে তাঁর সুমহতী কীর্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগ। তাঁর যা কিছু প্রতিভা তা অভিব্যক্ত হয়েছে দেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য এই সর্বাঙ্গসুন্দর ব্যবস্থার পরিকল্পনায়। বিরাট কল্পনা আর সেই কল্পনাকে রূপ দেবার উপযোগী কর্মপ্রতিভা একমাত্র তাঁরই ছিল। সে প্রতিভাও যেমন তেমন নয়, যাকে বলে অপ্রতিহত কর্মঠতা, আশুতোষের ছিল তাই। এরই সাহায্যে তিনি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সেদিন যে যুগান্তর এনেছিলেন তার সম্যক ধারণা ব্যতীত আশুতোষের জীবনানুশীলন বৃথা। বাঙালী জীবনের আধুনিক মহাচিত্রশালায় কর্মঠতার এমন ছবি আর কখনো দেখতে পাইনি।

দীনেশচন্দ্র লিখেছেন : "যেদিন কলিকাতায় কলেজগুলির এম এ ক্লাস ভাঙিয়া দিবার প্রস্তাব লইয়া আশুতোষ ফ্যাকালটির সভায় দাঁড়াইলেন, সেদিন তাঁহাকে সম্মিলিত কলেজসমূহের দৃঢ়-সংকল্পিত প্রতিকূলতা সহ্য করিতে হইয়াছিল। কলেজের অধ্যক্ষেরা বলিলেন—কেহ যদি মাথার মুকুট কাড়িয়া লয়, তবে যে দশা হয়, আজ এম. এ. ক্লাস-বর্জিত কলেজগুলি সেইরূপ সঙ্কটের অবস্থায় দাঁড়াইবে। সুদীর্ঘকাল যে উচ্চস্থান ও মর্যাদা কলেজগুলি ভোগ করিয়া আসিতেছে, আজ তাহা হইতে তাহারা কেন বঞ্চিত হইবে? উত্তরে আশুতোষের প্রধান যুক্তি এই ছিল যে, এখন কলিকাতার কৃতী অধ্যাপকেরা নানা কলেজে বিক্ষিপ্তভাবে কাজ করিতেছেন। মনীষী অধ্যাপকগণ ঘাটেপথে পড়িয়া নাই। হয়তো কোনো বিশেষ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকদের একজন আছেন প্রেসিডেন্সী কলেজে, একজন আছেন স্কটিশ চার্চ বা অপর কোনো কলেজে। সমস্ত ছাত্রমণ্ডলী যাঁহাদের অধ্যাপনাদ্বারা উপকৃত হইতে প্রত্যাশা করে, তাঁহারা কলেজ-বিশেষের একচেটিয়া হইয়া থাকিবেন কেন? বিশ্ববিদ্যা-লয়ের এম. এ. ক্লাসগুলি যদি এরূপভাবে গঠিত হয় যে, এই দেশের যাঁহারা উৎকৃষ্ট অধ্যাপক, তাঁহাদিগকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অধ্যাপনার্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ করা যায়, তবে সমস্ত ছাত্রই তাঁহাদের অধ্যাপনার ফল এবং উপকার পাইতে পারিবে।"

বলা বাহুল্য, সার্বজনীন জাতীয় উচ্চ শিক্ষার দিকে দৃষ্টি রেখেই আশুতোষ এই কথা বলেছিলেন। কিন্তু কলেজের অধ্যক্ষগণ সহজে স্বীকৃত হোলেন

না—তাঁরা এইসব যুক্তির সারবত্তা, নিজেদের বহুদিনের গৌরব ও প্রতিষ্ঠা হারাবার আশঙ্কায়, কিছুতেই অনুধাবন করতে চাইলেন না। সর্বদেশে সর্বকালে কায়েমী স্বার্থের স্বরূপ ইহাই। কিন্তু দেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একটা বৃহৎ এবং মহৎ পরিবর্তন তখন আসন্ন হোয়ে উঠেছে। দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীকাল পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় রচিত হবার দিন তখন অনিবার্যভাবেই এসে গিয়েছে। আশুতোষের প্রতিভা তাকেই ত্বরান্বিত করে দিল। সিনেটের এক সভায় আশুতোষ এই প্রস্তাব পাস করিয়ে নিলেন। সকলেই তাঁর অদম্য শক্তির পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হোলেন। দীনেশবাবু লিখেছেন: "আশুতোষের মুখে শুনিয়াছি, স্বয়ং লাট সাহেব আশুতোষের এই আশ্চর্য সফলতায় বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন।" বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসে আশুতোষ কী পরিমাণ মস্তিষ্ক চালনা করেছিলেন তার পরিচয় আছে প্রেসিডেন্সী কলেজের স্বনামধন্য অধ্যাপক এইচ এম. পার্সিভালকে লেখা ১৯১২, ১৬ই অক্টোবর তারিখের একখানি সুদীর্ঘ পত্রে। পার্সিভাল তখন অবসর নিয়ে স্বদেশে ফিরে গিয়েছেন। আশুতোষ পার্সিভালের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ঐ পত্রে তিনি লিখেছিলেন:

"Since you left this country I have endeavoured to develop post-graduate study in this University. Since the new Regulations came into force, M. A. teaching has been attempted in two or three colleges, and even that on a somewhat limited scale. This I have felt, if allowed to continue, is likely to hamper the progress of high education in this country. We have seven hundred schools within our jurisdiction, and the time may be far distant when it wlll be possible to have in many of them good teachers. But what about the fifty colleges affiliated to the University? We have been insisting that each college should have on its staff at least two good M. A.'s in each subject. How can this be realised unless the University turns out year after

year a fairly large number of well-trained M. A's. I have consequently organised this year University M. A. lectures on a somewhat extensive scale in Pure Mathematics, History, Economics, Arabic, Persian, Sanskrit, Mental and Moral philosophy and English. We have in each subject a number of paid lecturers, who lecture regularly so as to be able to cover the course in their respective subjects in two years. The system has been very successful, and at the present moment there are more than five hundred students reading for the M. A. Degree under the direct control of the University."

আশুতোষের এই চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি যে, এই সময়ে কোনো কোনো বিষয়ে এম এ শিক্ষার্থীর সংখ্যা যথেষ্ট ছিল ; বিশুদ্ধ গণিতের ছাত্র-সংখ্যা ছিল ৯০ আর ইংরেজির ছাত্রসংখ্যা ৭০। তখনো পর্যন্ত ইংরেজির ভালো অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ করতে পারেননি ; হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ও রবীন্দ্রনাথ দত্ত এই দু'জনই তখন এখানে ইংরেজির লেকচারার ছিলেন। এই ত্রুটি দূর করবার অভিপ্রায়ে আশুতোষ তাঁর ঐ পত্রে পার্সিভাল সাহেবকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির অধ্যাপক পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করে পাঠিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯০৭ সালে পার্সিভাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অন্যতম লেকচারার নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে অনেকেই (যথা এম. ঘোষ, এম প্রোথেরো, জে. এন. দাশগুপ্ত, সি. লিট্‌ল্‌, জগদীশচন্দ্র বসু, সি ডাব্লিউ. পীক, জে এ. কানিংহামস, সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ ও মেজর ডি. ম্যাকে) ইংরেজি, ইতিহাস, গণিত, রসায়ন ও ফিজিওলজির লেকচারার নিযুক্ত হয়েছিলেন। সংস্কৃতের জন্য সংস্কৃত কলেজ থেকে যেসব অধ্যাপকদের বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার নিযুক্ত করা হয়, তাঁদের মধ্যে ছিলেন সত্যব্রত সামশ্রমী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, প্রমথ-নাথ তর্কভূষণ, রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী প্রভৃতি স্বনামধন্য পণ্ডিতগণ। অর্থনীতির জন্য স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা হয় ১৯০৯ সাল। লর্ড মিণ্টো তখন বড়োলাট এবং

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার। এই বিষয়টির পঠন-পাঠনের জন্ম ভারতসরকার বিশেষভাবে এককালীন প্রচুর অর্থ মঞ্জুর করেন এবং সেই অর্থের দ্বারাই 'মিণ্টো চেয়ার'-এর সৃষ্টি হয়। তৎকালীন সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও অর্থনীতিবিদ্ অধ্যাপক মনোহর লাল প্রথম 'মিণ্টো অধ্যাপক নিযুক্ত হবার গৌরব লাভ করেন। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির পঠন-পাঠন সেই প্রথম। কথিত আছে, আশুতোষের বড়ো ইচ্ছা ছিল রমেশচন্দ্র দত্তকে অর্থ-নীতির অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করবেন কিন্তু ১৯০৯ সালের নভেম্বর মাসে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে আশুতোষের এই ইচ্ছা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বহুভাষাবিদ্ হরিনাথ দে এবং সক্রেটিসতুল্য জ্ঞানী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল—ইঁহারা উভয়ে এইসময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার নিযুক্ত হন। স্টিফেন, স্টার্লিং, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রমুখ বহু বিখ্যাত বিদেশী অধ্যাপকগণ এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শিক্ষকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এইভাবেই আশুতোষ সেদিন যে শিক্ষাযজ্ঞের আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তার প্রকৃত লক্ষ্য ছিল কলিকাতাকে তিনি শুধু বিদ্যানুশীলনের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত করবেন না, একেই তিনি ভারতের পলিটিক্যাল ও ইনটেলেকচুআল রাজধানীতে পরিণত করবেন।

কিন্তু সহসা ১৯১১ সালে ভারতের রাজধানী কলিকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হওয়ার দরুণ তাঁর এই স্বপ্ন শূন্যে বিলীন হয়ে যায়। সম্রাট পঞ্চম জর্জ সেই বছর ভারতে এসেছেন। এই উপলক্ষে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত দরবারে কুখ্যাত কার্জনী বিধান—বঙ্গভঙ্গ রদ হোল বটে, কিন্তু বাঙালীর প্রাধান্যকে খর্ব করবার অভিপ্রায়ে দিল্লীকে রাজধানী হিসাবে ঘোষণা করা হয়। সেদিন এর বিরুদ্ধে মাত্র একজন বাঙালীর কণ্ঠে প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছিল, তিনি আশুতোষ। ১৯১২ সালের কনভোকেশন বক্তৃতায় এই প্রসঙ্গে তিনি যে উক্তি করেছিলেন আমাদের তা একবার স্মরণ করা দরকার। রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার বিষয়টাকে তিনি বাঙালীর জাতীয় জীবনে একটি সংকট বা crisis বলেই উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: "Bengal has been for more than a century the leading province of India; Calcutta has been the Capital, in name no less than in fact, of a great empire; and now these high distinctions are all

at once passing away from us. Calcutta, Bengal, are dis-crowned and cannot help feeling desolate. The gloom of grievous bereavement lies heavy on our minds, we feel like men who have 'fallen from their high estate'...In addition, as misfortune never comes single it appears likely that before long the jurisdiction of the University may be contracted very considerably."

এ কথা আজ অনস্বীকার্য যে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়াটা বাঙালীর পক্ষে ভালো হয়নি। যাই হোক, ভারত সম্রাটের উপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করতে চাইলেন আশুতোষ। লর্ড হার্ডিঞ্জ তখন রাজপ্রতিনিধি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার। তিনি হার্ডিঞ্জকে অনুরোধ করলেন সম্রাটের ভারত-পরিদর্শনের স্মৃতিকে স্থায়িমূল্য দেবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেন আরো দুটি অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। আশুতোষের এই অনুরোধ রক্ষিত হয় এবং সরকারী অর্থানুকূল্যে অতঃপর দুইটি নূতন অধ্যাপক-পদের সৃষ্টি হয়, যথা, King George V Professor of Mental and Moral Science এবং Hardinge Professor for Advanccd Mathematics. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম George V অধ্যাপকের গৌরব লাভ করেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল যিনি পরবর্তীকালে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন। ব্রজেন্দ্রনাথের পর যিনি ঐ পদ অলংকৃত করেন তিনি ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি, স্বনামধন্য ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। প্রথম হার্ডিঞ্জ অধ্যাপক ছিলেন ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির অন্যতম সদস্য এ. আর. ফরসাইথ। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির অধ্যাপক হিসাবে জর্জ থিবোর নিয়োগ এই সময়কারই ঘটনা।

এই ভাবে দেখা যায় যে, প্রথম ছয় বৎসর কালের মধ্যেই ভাইস-চ্যান্সেলার রূপে আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠনে, বিশেষ করে এর স্নাতকোত্তর বিভাগটির পরিকল্পনা এবং গঠনে বহুল পরিমাণে সফলকাম হয়েছিলেন। ইংরেজি, সংস্কৃত, পালি, আরবী, পার্সিয়ান, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি ও গণিত—এই সকল বিষয়েই নিয়মিত পঠন-পাঠন এবং অনুশীলন ও গবেষণার

ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে এইসব শ্রেণীতে স্নাতকোত্তর ছাত্রের সংখ্যা ছিল পাঁচশতেরও অধিক। কিন্তু তখনো পর্যন্ত একটি অসম্পূর্ণতা রয়ে গিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট তখনো পর্যন্ত বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন ও গবেষণার কোনোরকম আয়োজন করে উঠতে পারেননি। অতঃপর আশুতোষ এই বিষয়ে সচেষ্ট হোলেন এবং তাঁর সেই প্রয়াসের ফল ইউনিভার্সিটি কলেজ অব সায়ান্স। এইবার আমরা সেই প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

১৯১২ সালটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তথা আশুতোষের জীবনেতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ভাইস-চ্যান্সেলার রূপে প্রথম পাঁচ বছর তাঁকে কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছিল পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাস খুলবার জন্য। এই বছরের কনভোকেশন বক্তৃতায় তিনি বলেন; "No University is nowadays complete unless it is equipped with teaching faculties in all the more important bránches of the Sciences and Arts, and unless it provides ample opportunities for research" এ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য কোনো ব্যবস্থাই করা হয়নি। এর প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল অর্থাভাব। কৃতী অধ্যাপকের অভাব হয়ত তখন ছিল না—অভাব ছিল বাড়ির, ল্যাবোরেটরির, মিউজিয়ামের আর সাজসরঞ্জামের। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে কয়েক লক্ষ টাকা এসে গেল। এই টাকা দান করে-ছিলেন স্বনামধন্য তারকনাথ পালিত আর রাসবিহারী ঘোষ। তারকনাথ ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের একজন যশস্বী ব্যারিস্টার আর রাসবিহারী ছিলেন প্রসিদ্ধ আইনজীবী। বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন একজন কৃতী গ্রাজুয়েট। ১৯১২ সালের জুন মাসে তারকনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের হাতে সাত লক্ষ টাকা (নগদ সাড়ে চার লক্ষ আর জমি ও বাড়িতে আড়াই লক্ষ) সমর্পণ করেন। এই দানের একটি শর্ত এই ছিল যে এর দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রের জন্য দুইজন অধ্যাপক নিযুক্ত

করবার ব্যবস্থা করবেন। চার মাস বাদে তিনি অপর একটি দানপত্র মারফৎ আরো সাত লক্ষ টাকা দান করেন। আজ পর্যন্ত কোনো একজন ব্যক্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এত অধিক অর্থ দান করতে পারেননি।

তারকনাথের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এগিয়ে এলেন রাসবিহারী ঘোষ। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে সমর্পণ করলেন দশ লক্ষ টাকা। তারকনাথের কাছ থেকে অর্থসাহায্য লাভ করে সিনেট বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব একটি বিজ্ঞান কলেজ স্থাপনে অগ্রসর হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন এবং ভারত সরকারের নিকটে অর্থসাহায্যের জন্য আবেদন করেন। ১৯১৪ সালের ২৭শে মার্চ বিজ্ঞান কলেজের ভিত্তিস্থাপন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ঐ অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তৃতায় আশুতোষ বলেছিলেন, "Considerable disappointment was in store for the promoters of the scheme. The Government of India did not respond to the request of the University for liberal financial assistance to supplement the gift of Sir Taraknath Palit." আশুতোষ স্বভাবত একটু নিরুৎসাহ বোধ করেছিলেন। কিন্তু আবার তাঁর হাতে এসে পৌছল আর একটি অপ্রত্যাশিত দান। সিনেটের এই সিদ্ধান্তের বিষয় অবগত হোয়েই রাসবিহারী ঘোষ আশুতোষকে ১৯১৩ সালের ৮ই আগস্ট একখানি পত্রে জানালেন যে, এইদেশে বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য বিশ্ববিষ্যালয় যে মহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তার আনুকূল্য বিধান করবার উদ্দেশ্যে তিনি দশলক্ষ টাকা দান করতে প্রস্তুত আছেন। রাসবিহারী ঘোষের নিকট থেকে অযাচিতভাবে এমন বিপুল অর্থ সাহায্য লাভ করে আশুতোষের হৃদয় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছিল সেদিন। তারক পালিত ও রাসবিহারী ঘোষের এই দানের সংবাদ সেদিনকার ভারতবর্ষে রীতিমতো বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিল। এ তাঁদের স্বোপার্জিত অর্থ ছিল। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষ তিনজনেই আইনজীবী ছিলেন। সিনেটের এক বিশেষ সভায় একটি প্রস্তাবে রাসবিহারী ঘোষের দানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। পালিত ও ঘোষের এই বিপুল দানের উপরেই প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববিষ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের ভিত্তি প্রস্তর

স্থাপিত হয়েছিল। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে এটি নিঃসন্দেহে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা।

বিজ্ঞান কলেজ স্থাপিত হোল।

আশুতোষের বহুদিনের একটি স্বপ্ন আজ চরিতার্থ হোল।

এইবার অধ্যাপক নিয়োগের জন্য তিনি অগ্রসর হোলেন। তারকনাথ ও রাসবিহারীর দানপত্রের শর্ত অনুসারে তিনি ছয়জন অধ্যাপক ও তাঁদের কাজে সহায়তা করতে প্রত্যেকের জন্য দুজন করে রিসার্চ স্টুডেন্ট নিয়োগের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করেন। পূর্বোক্ত বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন: "It is a matter for sincere congratulation that we have been able to secure scholars of high distinction as our first Professors, because it is obviously of supreme importance that our work should be initiated under the guidance of not merely the most accomplished but also the most devoted and the most enthusiastic workers available."

ইহাই ছিল আশুতোষের কর্মপদ্ধতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তিনি সর্বদাই শ্রেষ্ঠ মনীষার সন্ধান করেছেন—খুঁজে খুঁজে সেরা অধ্যাপক নিযুক্ত করেছেন। পাকা জহুরী ছিলেন তিনি, কাজেই অধ্যাপক-গোষ্ঠী নির্বাচনে তিনি যে অনন্যসুলভ বিচার-বিবেচনার পরিচয় দিতেন তা সত্যই বিস্ময়কর ছিল।

বিজ্ঞান কলেজের রসায়নের প্রথম 'পালিত অধ্যাপক' হবার গৌরব লাভ করেন প্রফুল্লচন্দ্র রায় আর পদার্থ বিজ্ঞানের প্রথম 'পালিত অধ্যাপক' চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমণ। প্রফুল্লচন্দ্র স্বয়ং দু'লক্ষ টাকা বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে এইদেশে দানে [illegible] ভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন। রাসবিহারী ঘোষের দানে স্থ[illegible]

প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র। পদার্থ বিজ্ঞানে[illegible] প্রথম 'ঘোষ অধ্যাপক' ডক্টর দেবেন্দ্রমোহন বসু, ইনিই পরবর্তীকাল জগদীশচন্দ্র বসু স্থাপিত 'বসু বিজ্ঞান-মন্দির'-এর ডাইরেক্টার নিযুক্ত হন। জগদীশচন্দ্রও এক লক্ষ টাকা দান করেছিলেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তহবিলে। ব্যাবহারিক গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ডক্টর গণেশ

প্রসাদ আর উদ্ভিদবিদ্যার (Botany) জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত হন শঙ্কর পুরুষোত্তম আঘরকর।

কিন্তু ইউনিভার্সিটি সায়ান্স কলেজ প্রকৃতপক্ষে একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবেই স্বীকৃতি পেয়েছিল। অধিকাংশ অধ্যাপকই বাংলার বাইরে থেকে এনেছিলেন আশুতোষ। "Science in its ultimate essentials, echoes the voice of the living God'—এই সুন্দর উক্তিটি আশুতোষের।

বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে লেখা আশুতোষের একটি পত্রের কিছু অংশ এখানে উদ্‌ধৃত করে দিলাম। এই চিঠির তারিখ জুন ২৫, ১৯১২। প্রফুল্লচন্দ্র তখন তৃতীয়বারের জন্য বিলাত গিয়েছেন। ঐ পত্রে আশুতোষ লিখেছিলেন: "আপনার স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত ২৪শে জানুয়ারি তারিখে সিনেটের সম্মুখে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-পদের প্রশ্ন উপস্থিত হয় তখন আপনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বিজ্ঞানের অধ্যাপকের জন্য কোনো ব্যবস্থা করা হয় নাই। তখন আমি আপনাকে আশ্বাস দিয়াছিলাম যে, শীঘ্রই হয়তো বিজ্ঞানের অধ্যাপকের জন্যও ব্যবস্থা হইবে। আপনি শুনিয়া সুখী হইবেন যে, আমার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। আমরা একটি পদার্থবিদ্যার ও আর একটি রসায়ন শাস্ত্রের দুইটি অধ্যাপক-পদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আমরা অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপনের সংকল্প করিয়াছি। মিঃ পালিতের মহৎ দান এবং তাহার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজার্ভ ফণ্ড হইতে আরো আড়াই লক্ষ টাকা দিয়া, আমরা এই সব ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইয়াছি।'

তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষের পর বিজ্ঞান কলেজে উল্লেখযোগ্য দান যাঁর তিনি হোলেন খয়ড়ার মহারাজা গুরুপ্রসন্ন সিংহ। এঁর দানের পরিমাণ পাঁচলক্ষ টাকা। বিজ্ঞান কলেজের গৃহনির্মাণ যখন সম্পূর্ণ হয় তখন অর্থের অনটন দেখা দিল। যন্ত্রপাতি কিনবার আর টাকা নেই। যেসব যন্ত্রপাতি ছিল তা দিয়ে রসায়ন বিভাগের কাজ কোনোমতে চলতে লাগলো; কিন্তু ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি ও পদার্থবিদ্যা বিভাগে কোনো যন্ত্রপাতি ছিল না। তখন য়ুরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ চলছে, সেখান থেকে নূতন যন্ত্রপাতি আমদানী

করার উপায় ছিল না। আশুতোষ নিরুৎসাহ হোলেন না। তাঁর কাছে খবর এলো কৃষ্ণনাথ কলেজে পদার্থবিদ্যায় 'অনার্স কোর্স' খুলবার জন্য মূল্যবান যন্ত্রপাতি অনেক কেনা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ প্রস্তাব আর কার্যকরী হোয়ে ওঠেনি। যন্ত্রপাতিগুলি এমনি পড়ে আছে। আশুতোষ চিঠি লিখলেন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীকে। মহারাজা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ঔদার্যের সঙ্গে ঐসব যন্ত্রপাতি বিজ্ঞান কলেজের জন্য দান করলেন। বাংলাদেশে শিক্ষার জন্য কাশিমবাজারের মহারাজার মুক্ত হস্তে দানের ইতিহাসও বাঙালী চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। এইভাবেই সেদিন তারক পালিত ও রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতির দান এবং আশুতোষের ঐকান্তিক প্রয়াস ভারতে বিজ্ঞান শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়ে এক নূতন ইতিহাস রচনা করেছিল।

১৯১৩ সালে সিনেট তারকনাথ পালিতকে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টর অব ল' এই সম্মানিত উপাধিতে ভূষিত করবার সুপারিশ করেন। ঐ বছরের কনভোকেশন বক্তৃতায় এই প্রসঙ্গে আশুতোষ যেসব কথা বলেছিলেন তা স্মর্তব্য। অসুস্থতার জন্য সশরীরে উপস্থিত হোয়ে তারকনাথ এই সম্মান গ্রহণ করতে পারেননি। আশুতোষ এই মহৎদাতার গুণকীর্তন করে বলেছিলেন : "To the benefactor we cannot indeed be grateful enough. Sir Taraknath Palit stands before us in a double character,—in the first place, as an eminent and learned lawyer, and in the second place, as a great benefactor of our University on a scale hitherto unparalled...He has given not a fraction or part only of his wealth—he has freely given us the whole." বস্তুতঃ সকল দাতার প্রতিই তিনি এইরূপ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করতেন।

উচ্চশিক্ষার মহাযজ্ঞের যে আয়োজন সেদিন আশুতোষ করেছিলেন তাতে অর্থের সমিধ যাঁরা জুগিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই আমাদের স্মরণীয়, আমাদের নমস্য। বাংলাদেশে বিজ্ঞানচর্চার সূচনা করে যান স্বনামধন্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার; এ ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন পথিকৃৎ। 'Indian Association for

the cultivation of Science" তাঁরই প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয় উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে। মহেন্দ্রলাল যার সূচনা করে গিয়েছিলেন আজ আশুতোষের প্রয়াসের সঙ্গে তারকনাথ ও রাসবিহারী প্রভৃতি দাতার বিপুল অর্থসাহায্য মিলিত হোয়ে তাকেই সম্পূর্ণতা দান করলো—ভারতে বিজ্ঞানচর্চার পথ এতদিনে সুগম হোল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এতদিন বাদে একটি যথার্থ teaching and research University রূপে তার ইতিহাস-নির্দিষ্ট পরিণতি লাভ করলো।

॥ সাত ॥

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার আর গবেষণার বিভাগ—এইদিকেই আশু-তোষের ষোল আনা দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। তাঁর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ ছিল যে, তিনি উচ্চশিক্ষাকে 'মাটি করিয়া গিয়াছেন'। তাঁর সময়কার বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র উপাধি বিতরণের বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনেকেই বলতেন, আশুতোষ নাকি উচ্চ শিক্ষার উচ্চতা রক্ষা করতেন না। তখন তিনি বলতেন, "আমি যাহা চাই, তাহাই করিতেছি।" যাঁরা তাঁর অন্তরঙ্গ স্থানীয়দের মধ্যে ছিলেন তাঁদের কাছে শুনেছি যে আশুতোষ অত্যন্ত আবেগ ভরে বলতেন, "ওহে বাপু, সব বুঝি, কিন্তু যে দেশে বর্তমান অবস্থায় সাধারণ শিক্ষা কিছুতেই সম্প্রসারিত হোতে পারছে না, সেদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা ভিন্ন গত্যন্তর আর কি আছে?" আমাদের মনে হয়, আশুতোষের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, এই উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে তিনি সেই প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ঘটাবেন। Compulsory education-এর ধুয়াটা গোখলে যখন তুলেছিলেন তখন সরকার সজাগ হন। আশুতোষের ছিল মন্ত্রগুপ্তি—তিনি স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধবার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখে-ছিলেন সত্য, কিন্তু কার্যে তাঁর লক্ষ্য ছিল—যত সম্ভব অধিক সংখ্যক দেশবাসীর মধ্যে সাধারণ শিক্ষার সুবিস্তার সাধন।

যে আট বছর কাল আশুতোষ ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন সেই সময়ের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার দ্বার যে কত দিক দিয়ে উন্মুক্ত হয়েছিল তার একটি সুন্দর চিত্র দিয়েছেন দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'আশুতোষ স্মৃতিকথা' গ্রন্থে। এখানে আমরা তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করে দিলাম। তিনি লিখেছেন: "বন্যার জলস্রোতের মতো অজস্র দান বিভিন্ন দিক হইতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আসিতে লাগিল। পালিত ও ঘোষ যাহা দিলেন, সেরূপ মুক্তহস্ত বদান্যতা ভারতীয় কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এ পর্যন্ত পাইবার সৌভাগ্য হয়

নাই।…এইরূপে বিদ্যোৎসাহী ধনী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের অকুণ্ঠিত দানে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুকূল্য করিতে লাগিলেন। যাদুকরের মন্ত্রপূত কাঠি দিয়া আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়কে স্পর্শ কবিয়াছিলেন, তাঁহার হাতে ছিল আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ। উচ্চশিক্ষা বিভাগের দরজা যে কত দিক দিয়া খোলা হইল, তাহার সীমা-সংখ্যা নাই, সেই দ্বার নিত্য নূতন জ্ঞানের পথে বঙ্গদেশীয় তরুণদিগকে আহ্বান করিল।"

মাত্র আট বছরের মধ্যে স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থাটা যে কি ব্যাপক হয়ে উঠলো তা দেখে সেদিন অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। কুড়িটি ফ্যাকালটির স্থষ্টি হোল। এক আর্টস-এর বিভাগেই কুড়িটি বিষয়ের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়। যথা—ইংরেজি, সংস্কৃত, পালি, আরবি, পারসী, বাংলা, হিন্দী, মৈথিলী. উড়িয়া, অসমিয়া প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষা সমূহ, তুলনা মূলক ভাষাতত্ত্ব, দর্শন নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস, ভূবিদ্যা, অর্থশাস্ত্র, রাষ্ট্রনীতি, বাণিজ্য-বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, শারীরতত্ত্ব, নৃ-তত্ত্ব প্রভৃতি; বিজ্ঞান বিভাগে রসায়ন বিদ্যা, পদার্থ-বিদ্যা, উচ্চতর গণিতশাস্ত্র, জড়-বিজ্ঞান প্রভৃতি।

এতগুলি ফ্যাকালটি তো খোলা হোল—উপযুক্ত শিক্ষক কোথায়? আশুতোষ দেশ-বিদেশ থেকে খুঁজে খুঁজে কি ভাবে কৃতী পণ্ডিতদের আনতেন সেইকথা বলতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র লিখেছেন: "রাশিয়া হইতে ব্যবহারশাস্ত্রের গুরু ভিনোগ্রেডফ্, ফরাসী হইতে প্রতীচ্য কলাবিৎ ফুসে, সংস্কৃত সাহিত্যের জন্য সুবিখ্যাত ম্যাকডোনেল, প্রাচ্যবিদ্যার অগাধ পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভি, জার্মান-পণ্ডিত ডেনবি, ওল্ডেনবার্গ, উইণ্টারনীজ, ম্যুস্টার—এই সব দিগ্‌গজ পণ্ডিতদিগকে আশুতোষ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আনাইয়া বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।… ইসলামের মৌলভী, বৌদ্ধের ফুঙ্গী, হিন্দুর ভট্টাচার্য ও খ্রীস্টানের পাদ্রী যিনি যেখানে ছিলেন আশুতোষের আহ্বানে ছুটিয়া আসিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুয়ারে ভিড় করিয়াছেন…কত দেশের কত পণ্ডিত যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকরূপে কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কত লিখিব। তিনি তাঁহার এই মহাতীর্থে সমস্ত জগৎকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষের আহ্বানে প্রায় সমগ্র বিশ্বের প্রতিনিধিগণ আসিয়া সমবেত হইয়া এক মহামিলনের স্থষ্টি করিয়াছিলেন।"

রবীন্দ্রনাথের কবি কল্পনায় "এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে"-র যে চিত্র আমরা পাই তারই একটা বাস্তবরূপ সেদিন বাঙালী তথা ভারতবাসী প্রত্যক্ষ করেছিল আশুতোষের এই বিশাল সারস্বত মন্দিরে। নানা ভাষার নানা দেশের পণ্ডিত দূর দূরান্ত থেকে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেমন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন, তেমনি "আশুবাবুর প্রাণময়ী বিদ্যাদায়িনী মূর্তির পদতলে বসিয়া তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তঁাহারা যে শিক্ষা পাইয়াছেন, তাহাও তাঁহাদের নিকট কম মূল্যবান হয় নাই।" এই ভাবেই সেদিন দিবে আর নিবে—মিলাবে মিলিবে"-র একটা বড়ো রকমের পরীক্ষা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ঘটে গিয়েছিল আমাদের চোখের সামনেই। সেদিন আমরা এর গুরুত্বটা তেমন ভাবে উপলব্ধি করতে পারিনি—বুঝতে পারিনি যে এই ভাবে উচ্চশিক্ষার আয়োজন করে বাঙালীকে আবার তিনি গৌরবের আসনে বসাবার জন্য কী অতন্দ্র তপস্যা করে গিয়েছেন। তিনি তো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে শুধু প্রাদেশিক একটা পাঠশালার মতোন গড়তে চাননি—তিনি এই প্রতিষ্ঠানকে এমন একটি দুর্লভ মর্যাদার শিখরে স্থাপন করবার জন্য ব্যগ্র ও সচেষ্ট ছিলেন যার ফলে ইহা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃতি পাবে। দীনেশচন্দ্র যথার্থই বলেছেন "রাজাধিরাজ হইতে কুটীরবাসী পর্যন্ত সকলে এখান হইতে সসম্মানে ভারতীর প্রসাদ গ্রহণ করিয়া ধন্য হইবেন, এই গৌরবই আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দিতে প্রয়াসী ছিলেন।" এইভাবে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নবজীবন সঞ্চার করে আশুতোষ যে যুগান্তর এনেছিলেন, পরবর্তীকালের ইতিহাসে তার প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া যে কী ব্যাপক হয়েছিল তার কিছু আভাস দিয়ে গেছেন লর্ড রোনাল্ডসে। আজ মনে হয়, নালন্দার ছবি তিনি ধ্যানে পেয়েছিলেন, তাইতো বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন বিরাট পরিকল্পনা তিনি করতে পেরেছিলেন।

ছাত্রদের পরম সুহৃদ ছিলেন আশুতোষ। কঠিন প্রশ্ন তিনি কখনো মঞ্জুর করতেন না। বলতেন "ছাত্র হইয়া ছাত্রদের পরীক্ষক হইতে হয়।" ১৯০৪ সনে যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নূতনভাবে সংগঠিত হোল, তখন ভাইস-

চ্যান্সেলার রূপে আশুতোষ নূতন বিধি রচনা করেন। সেই সময় অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন হয়ত এই New Regulations খুব কঠিন হবে। কিন্তু তাঁদের এই আশঙ্কা অমূলক ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে নববিধি প্রচলিত হবার পূর্বে পরীক্ষার যে আদর্শ এবং প্রশ্নপত্র রচনার যে রীতি ছিল তা তিনি সম্পূর্ণভাবে বদলিয়ে দিলেন। এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র লিখেছেন: "আশুতোষের সহিত প্রশ্নকর্তাদের অনেক বিষয়েই পরামর্শ করিবার রীতি প্রবর্তিত হইল। পোস্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের বহুসংখ্যক ফ্যাকালটিরই সভাপতি ছিলেন আশুবাবু। প্রশ্নকারীদের উপর নির্দেশ হইত প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যেন পরামর্শ করিয়া প্রশ্ন তৈয়ার করা হয়। খসড়া প্রস্তুত হইলে আমরা আশুবাবুর নিকট লইয়া যাইতাম। তখন পূর্বকার রীতি অনুসরণ করিয়া যে খসড়া প্রস্তুত করিতাম, তাহার জন্য তাঁহার কত যে ভ্রূকুটি সহ্য করিয়াছি, তাহা আর কি লিখিব? প্রশ্নকারীকে তিনি বলিতেন, মহাশয়, এটি স্মরণ রাখিবেন যে, প্রশ্নদ্বারা আপনার বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় আমরা মাপ করিব না। আপনি কত বড়ো বিদ্বান, তাহা ক্ষুদ্র বালকদিগকে বুঝাইয়া আশ্চর্যান্বিত করিতে যাইবেন না;—এটি সর্বদা স্মরণ রাখিবেন, যে-যে শ্রেণীর ছাত্রদের পরীক্ষা হইবে, সেই-সেই শ্রেণীর বালকদিগের নিকট আপনারা যাহা ন্যায়তঃ প্রত্যাশা করিতে পারেন, সেই পরিমাণ বিদ্যা তাহাদের হইয়াছে কিনা, তাহাই দ্রষ্টব্য অতিরিক্ত কোনো জটিল সমস্যাদ্বারা পরীক্ষা-গৃহে তাহাদের মাথা ঘুরাইয়া দিবেন না।"

আশুতোষের এই কথাগুলি আজো প্রণিধান যোগ্য। অনেকে আশুতোষের এই নীতির সমালোচনা করে বলেছেন যে, শিক্ষাকে সুলভ করতে গিয়ে তিনি নাকি শিক্ষার মান নামিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা কিন্তু ইহা বিশ্বাস করি না; বরং ইহাই সত্য যে তাঁরই সময়ে শিক্ষার মান উন্নত ছিল, গবেষণা ফলপ্রসূ ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে নববিধি বা New Regulations প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকেই দেখা যায় যে ভাইস-চ্যান্সেলাররূপে আশুতোষ পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকেন। দেশে উচ্চশিক্ষার বিস্তার সাধন করতে হোলে এযাবৎকাল প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সম্পর্কে যেরূপ কঠোরতা অবলম্বিত হোয়ে আসছিল তার পরিবর্তন প্রয়োজন—এই কথা তিনিই

প্রথম চিন্তা করলেন। তারপর ১৯১০ সাল থেকে যখন এনট্রান্স উঠে গিয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা প্রবর্তিত হয় তখন থেকে তিনি নিজে এই বিষয়টির উপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে থাকেন। ম্যাট্রিকুলেশনে ইংরেজী ও অঙ্কের প্রশ্নপত্রের তিনি নিজেই অন্যতম প্রশ্নকর্তা ছিলেন। ইহা স্বাভাবিক।

এই প্রসঙ্গে 'আশুতোষ স্মৃতিকথা' গ্রন্থে দীনেশচন্দ্র সেন একটি চমৎকার ঘটনার উল্লেখ করেছেন। একবার জনৈক অধ্যাপক ম্যাট্রিকের অঙ্কের প্রশ্ন আশুতোষকে দেখাতে এনেছেন। প্রশ্নের খসড়াটি দেখে তাঁর মনে হোল, প্রশ্ন কঠিন হয়েছে। তখন তিনি তাঁকে এই কথাগুলি বলেছিলেন: "খুব মেধাবী ও মনস্বী ছেলেরা যেরূপ জানে, সেই আদর্শে প্রশ্ন প্রস্তুত করিবেন না। যাহারা মাঝামাঝি দলের ছেলে, তাহাদের অনুযায়ী প্রশ্ন দিবেন। জানিবেন প্রশ্ন হইবে average ছেলেদের জন্য।"

দীনেশচন্দ্র লিখেছেন: "এইভাবে প্রশ্ন করার রীতির একটা আমূল পরিবর্তন হইল। যদি নববিধি-গঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার ও তৎপূর্ববর্তী ক্যালেণ্ডার পাঠক তারতম্য করিয়া দেখেন, তবে এই রূপান্তরের তত্ত্বটি বুঝিতে পারিবেন।"

সেই থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশ্ন করার রীতির একটা আমূল পরিবর্তন হয়। 'আগে paper set করবার যে পদ্ধতি ছিল তাতে প্রশ্ন-কর্তার বিদ্যার দৌড় প্রকাশ পেত, কিন্তু দারুণ অবিচার হোত পরীক্ষার্থীদের উপর। এখন থেকে প্রশ্নগুলি আগের চেয়ে সহজ হোতে লাগলো। শুধু তাই নয় পাসের হার বৃদ্ধি হবার আরো দুটি কারণ ছিল। আশুতোষের সময়েই বিকল্প প্রশ্নের নিয়ম প্রচলিত হয়। আগে শুধু রচনার প্রশ্নে দুই-তিনটি বিষয়ের কোনো একটির উত্তর লিখবার রীতি ছিল; কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে কোনো বিকল্প প্রশ্নের নিয়ম ছিল না। দুই-তিনটি নির্দিষ্ট প্রশ্নের যেটি ইচ্ছা সেইটিই পরীক্ষার্থী নির্বাচন করে লিখতে পারে, এই নিয়ম প্রবর্তিত হবার পরে ছেলেরা আগের চেয়ে বেশি নম্বর পেতে লাগল এবং পাসের হারও বৃদ্ধি পেলো। প্রশ্ন সম্বন্ধে যেমন, বিষয় সম্বন্ধেও তেমনি ছাত্রদের নির্বাচন করে নেবার সুবিধা দেওয়া হয়। এমন কি কোনো কোনো পরীক্ষায় গণিত পর্যন্ত বাধ্যতামূলক পাঠ্যতালিকার অন্তর্গত রইল না। সংস্কৃত ও ভূগোলের পরিবর্তে অন্য একটি বিষয় নির্বাচনের সুযোগ পেল ছাত্ররা। পাঠ্যতালিকার মধ্যে

নির্বাচনের এই সুবিধার ফলেই পরবর্তীকালে পাসের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল।

উত্তরপত্র দেখবার রীতি আগে কঠিন ছিল। আশুতোষ সেদিকেও দৃষ্টি দিলেন। এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র লিখেছেন: "বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত সকল কাজেই আশুবাবুর ছাত্রদের উপর প্রাণের একান্ত দরদ প্রকাশ পাইত। যে সকল পরীক্ষক নম্বর দিতে কার্পণ্য করিতেন, তাঁহাদের উপরও তাঁহার ধারণা ভালো হইত না। তিনি ছিলেন ছাত্রবন্ধু, তাঁহার পূর্বে সচরাচর একটা ধারণা ছিল যে, উত্তর যতই ভালো হউক না কেন, সম্পূর্ণ নম্বর কিছুতেই দেওয়া যায় না। তিনি বলিতেন, যদি লেখা নির্দোষ হইয়া থাকে, তবে তাহার নম্বর কাটিবেন কেন? পুরা নম্বরই তাহার পাওয়ার জন্য রাখা হইয়াছে। তাহা কমাইবার অধিকার কাহারও নাই।"

এই যে ছাত্রদের প্রতি সদাশয়তা ও সহানুভূতি, ইহা সেদিন অনেকেই ভুল বুঝেছিলেন। আশুতোষকেও সেই সঙ্গে তাঁরা ভুল বুঝেছিলেন এবং তাঁর এইসব কাজের কঠিন সমালোচনাও করেছিলেন। সেসব সমালোচনার সুর ছিল একই—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রসাতলে গেল, এর উচ্চ আদর্শ ধূলায় লুটাল। 'Calcutta University is a graduate manufacturing University." এমন কথাও সেদিন কোনো একখানি কাগজে লেখা হয়েছিল। গ্রাজুয়েটদের ঠাট্টা করে বলা হোতো—"স্যর আশুতোষের বি. এ।" "সাহেব মহলে" অর্থাৎ সরকারী মহলেও এই নিয়ে কম সমালোচনা ওঠেনি। সেদিন আত্মপক্ষ সমর্থনে আশুতোষ যে কথা বলছিলেন এখানে তা উদ্ধৃতিযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, "উচ্চ শিক্ষার প্রসার কতটা বাড়িয়াছে তাহা সমালোচকদের একবার হিসাব করিয়া দেখিতে বলি। যাহারা পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের লৌহ-দ্বার ঠেলিয়া ঢুকিতে পারিত না, তাহারা এখন বি.এ, এম.এ পাস করিয়া আসিতেছে। যদিও আমি নিজে বিশ্বাস করি না যে প্রকৃত গুণী ও মনস্বী ছেলেদের গুণপণার কোনো হানি হইয়াছে, তথাপি যদি মানিয়া লই যে, শিক্ষার আদর্শ পূর্বাপেক্ষা একটু খর্ব হইয়া গিয়াছে তথাপি শিক্ষার বিস্তার যে বহুল পরিমাণে বাড়িয়াছে, তাহাতে কি কেহ সন্দেহ করিতে পারেন? পল্লীতে পল্লীতে, বঙ্গের দূর-দূরান্তরে আজ কতশত গ্রাজুয়েট পাওয়া যাইবে

স্কুলের কয়েক ক্লাস পর্যন্ত পড়িয়া যদি নিরুৎসাহ হইয়া তাহাদিগকে ঘরে ফিরিয়া যাইতে হইত, তবে কি বঙ্গদেশ আজকার মতো শিক্ষা বিষয়ে নেতৃত্ব করিতে পারিত ?" এদেশে একমাত্র আশুতোষই জানতেন, কত কষ্টে বাঙালী মাতাপিতা ও অভিভাবকেরা ছেলেদের লেখাপড়ার গুরু ব্যয়ভার বহন করেন—সেইজন্যই কি তিনি ছাত্রদের প্রতি এমন সদাশয় ও সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন ?

আশুতোষ ছাত্রবৎসল ছিলেন সত্য, কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই তিনি ছাত্র-বাৎসল্যকে তাঁর সুবিচারের সীমা লঙ্ঘন করতে দেননি। ইহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দীনেশবাবু তাঁর 'আশুতোষ-স্মৃতিকথা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই : বাংলার এক সুদূর পল্লীগ্রামে এক দুঃখিনী বিধবার সন্তান সে বছর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছে, কিন্তু বাংলা পরীক্ষার দিন সে ভীষণ ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয় এবং পরীক্ষা দিতে অসমর্থ হয়। দরিদ্র বলে গ্রামের হাইস্কুলে সে বিনা বেতনে পড়ত। প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করার উপর তার ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করছিল— গ্রামের জমিদার ছেলেটিকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, সে যদি পাস করতে পারে তা হোলে তিনি তাকে একটা চাকরি দেবেন। গ্রামের স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে একটি পরিচয়-পত্র নিয়ে, ছেলেটি কলিকাতায় এসে একদিন জনৈক অধ্যাপকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং সমস্ত কথা তাঁকে বলে। "যদি পরীক্ষায় পাস করতে না পারি তা হোলে আমার মা এবং আমি এবার একেবারে অনশনে মরব," চোখের জল মুছতে মুছতে সে এই কথাগুলি তাঁকে বললো। সে আরো বললো—"অন্য সব Subject ভালোই লিখেছি, কিন্তু বাংলায় পরীক্ষা দিতে পারিনি—কি করে পাস করব ?" তখন সেই অধ্যাপকটি (ইনি আশুতোষের প্রিয়পাত্র ছিলেন) দয়াপরবশ হোয়ে ঐ ছেলেটিকে সঙ্গে করে একদিন আশুতোষের কাছে নিয়ে গেলেন এবং ছেলেটির বিপদের কথা তাঁর কাছে উপস্থাপিত করলেন।

—তোমরা আমাকে কি মনে করেছ ? আমি কি সর্বশক্তিমান ? পরীক্ষা দিতে পারেনি, একে পাস করিয়ে দেব কেমন করে ? গম্ভীরভাবে বললেন আশুতোষ।

—আজ্ঞে, একটা কিছু উপায় না করলে ছেলেটি না খেয়ে মরবে, সসংকোচে নিবেদন করেন অধ্যাপক।

—উপায়? তুমিই একটা উপায় বলে দাও না।

—আমি কি করে উপায় বলে দেব, আপনার কাছে তো সেইজন্যই এসেছি।

আশুতোষ কিছুক্ষণ নীরব রইলেন; একটু চিন্তা করলেন। হঠাৎ তাঁর গম্ভীর মুখ যেন প্রসন্ন হোল। ছেলেটিকে তিনি কাছে ডাকলেন, তার কাঁধে হাত দিয়ে একটা মৃদু চাপড় মারলেন। বললেন—"আচ্ছা, তোমার উপায় ঠিক হবে। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা হোয়ে গিয়েছে, কিন্তু আই.এ হয়নি, তুমি আই এ.র বাংলা পরীক্ষা দাও। তুমি আজই আমার কাছে দরখাস্ত লিখে দিয়ে যাও।"

দীনেশচন্দ্র সেন সে বছর আই. এ.র বাংলার প্রধান পরীক্ষক ছিলেন। তিনি লিখেছেন: "সিণ্ডিকেট হইতে একটি ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীর রোল আমাব নিকট আসিল, তৎসহ সিণ্ডিকেট আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, একখানি ম্যাট্রিকের কাগজ যেন আমি আই. এ র প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ গ্রহণ করিয়া নম্বর দিই। সেই ছেলেটি দ্বিতীয় বিভাগে সেবার ম্যাট্রিক পাস করিয়াছিল।"

এই ঘটনাটি সম্পর্কে দীনেশবাবু মন্তব্য করেছেন: "এই যে অপূর্বরূপে উদ্ভাবিত উপায়ে আশুবাবু বালকটিকে উদ্ধার করিয়া দিলেন, তাহা একদিকে যেরূপ তাঁহার মস্তিষ্কের উপায় উদ্ভাবনী শক্তি প্রমাণ করে, অপর দিকে তাহা তাঁহার পরদুঃখ-কাতব, দয়ার্দ্র, মহানুভবতার পরিচায়ক। এই উদ্ভাবনা যতটা তাঁহার মস্তিষ্ক হইতে সৃষ্টি হইয়াছিল, ততোধিক উহা তাঁহার হৃদয় হইতে আসিয়াছিল।"

ইনিই আশুতোষ। ছাত্র সমাজের পরমাত্মীয় আশুতোষ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক-নিয়োগ সম্পর্কে, গবেষকদের গবেষণায় উৎসাহ প্রদান করতে আশুতোষ সর্বদাই ব্যগ্র থাকতেন। তাঁর জীবনে এর যে কত দৃষ্টান্ত আছে তার সীমাসংখ্যা নেই; একমাত্র সেইগুলিই সংগ্রহ করে যদি

কেউ লিপিবদ্ধ করতে পারেন তাহলেই একখানি বিপুলায়তন গ্রন্থ হয়। তরুণ অধ্যাপক শিশিরকুমার মৈত্র দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে এম. এ. পাস করেন। ১৯১৯ সালে তিনি "The Neo-Romantic movement in contemporary Philosophy" নামক গবেষণা প্রবন্ধ দাখিল করে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত হন। কথিত আছে, আশুতোষ এই তরুণের প্রতিভায় আকৃষ্ট হন। গবেষণায় নানাভাবে তাঁকে উৎসাহিত করেন ও আরো জ্ঞানার্জনের প্রেরণা দেন। ডক্টর মৈত্র আজীবন ইহা সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছিলেন। ১৯১৯ সালে সংস্কৃত সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হোয়ে এম. এ. পাস করেন রসময় ভট্টাচার্য। আশুতোষ তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিব্বতীয় পুঁথি অনুশীলনের কাজে নিয়োগ করেন। পরবর্তীকালে অধ্যাপক ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বেদের নির্বাচিত অংশাবলী প্রকাশিত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখাতে পারলে তিনি বিনা পরিচয়ে ছেলেদের চিনে নিতে পারতেন। জ্ঞান-সমুদ্রের সমস্ত রত্নরাজির গভীর পরিচয় থাকতো তাঁর নখদর্পণে। কোথায় পৃথিবীর একপ্রান্তে একটি নবোদ্ভাবিত বিদ্যা সবেমাত্র লোক জানতে পেরেছে, আশুতোষ তারও খবর রাখতেন—এ বিপুল জ্ঞান তিনি কেমন করে আয়ত্ত করতেন, তা সহসা কেহ বুঝে উঠতে পারত না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সত্যসত্যই বিশ্ববিদ্যার আলয়রূপে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন আশুতোষ। ভাইস-চ্যান্সেলার রূপে তাঁর প্রথম আট বছরের প্রয়াস এইদিকে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল বিশেষভাবে। যে যে বিষয়ে তখনকার দিনে পরীক্ষা হোত আগে সেইগুলির পঠন-পাঠনের ব্যবস্থাটা তিনি সর্বাগ্রে সম্পূর্ণ করেন। ক্ষমতাশালী বহুলোক সেদিন তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু নিজের কর্তব্য আর শক্তিতে তাঁর অটল বিশ্বাস ছিল, তাঁর স্বজাতির সামর্থ্যে তাঁর তেমনই দৃঢ় আস্থা ছিল। এর একটা দৃষ্টান্ত দিই। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তখন অল্পদিন হয় এম. এ. পাস করেছেন। বয়সও তাঁর অল্প। এই সময় স্নাতকোত্তর বিভাগের জন্য আশুতোষ কয়েকজন নূতন অধ্যাপক নিয়োগ করেন। তরুণ সুনীতিকুমার আহ্বান পেলেন আশুতোষের। পরবর্তী কাহিনী সুনীতিবাবু স্বয়ং এই ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন : "অধ্যাপকের কাজে

জীবন অতিবাহিত করব, এইরকম একটা অস্পষ্ট চিন্তা মনের মধ্যে উদয় হয়েছে মাত্র; আশুতোষ অতি সহজ ভাবেই আমার জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে পথ দেখিয়ে দিলেন। নতুন এম. এ. পাস, একেবারেই এম. এ ক্লাসে পড়াতে হবে। এ প্রস্তাবটা শুনে বুক ঢিপ ঢিপ করছিল, তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে আমার আশঙ্কার কথা নিবেদন করি। তিনি সমস্ত ভয়, সমস্ত সংকোচ তাঁর সকল বাধা-উপেক্ষা-করা, সকল ভয়-হরা উৎসাহের পিঠ চাপরানি দিয়ে বললেন, 'ভয় কি? যেটুকু পড়েছ, সেটুকু ভালো করেই পড়েছ, এ বিশ্বাস মনে আছে ত? এই ত পড়বার শোনবার সময় হোল, সারা জীবন এখন থেকে জ্ঞানে এগোতে হবে। সাহস কর, উচ্চ সংকল্প নিয়ে নেমে যাও, যাতে নিজের ইউনিভার্সিটির নাম, দেশের নাম উজ্জ্বল করতে পার।' তাঁর এই উৎসাহ-বাণী কখনো ভুলিনি, তাঁর কথাগুলি এখনো আমার মনে মন্ত্রশক্তিযুক্ত হয়ে আছে।"

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার হোতে হোলে সকল বিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার। আশুতোষের তা ছিল। দূর থেকে এটা অনেকের উপলব্ধিগম্য হোত না। পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য এর একটি চমৎকার সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন: "পূর্বে ভাবিতাম, স্যর আশুতোষ সংস্কৃত কিছু কম জানেন। কিন্তু সে ধারণার বৈপরীত্য ঘটিল। যখন ইউনিভার্সিটির ব্যাকরণ পুনঃসংস্করণ করিবার ভার আমার ও পণ্ডিত বহুবল্লভ শাস্ত্রীর উপর পতিত হয়, তখন আমি বলিলাম, আমাদের উভয়ের মধ্যে মতভেদ হইলে তাহা কে নিরসন করিবে? তিনি বলিলেন, এরূপ স্থলে আমাকে মধ্যস্থ মানিতে পারেন। আমি তাঁহার এই কথায় অবাক হইলাম বটে, কিন্তু শেষে জানিতে পারিলাম, তিনি বৃথা গর্ব করেন নাই। এইজন্যই আমার ধারণা আছে ইনি সর্বশাস্ত্রে সর্বজ্ঞাতব্য বিষয়ে মহাবিজ্ঞ ছিলেন। জ্ঞান-বিষয়ে ইঁহার দ্বিতীয় আছে বলিয়া মনে হয় না।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় প্রত্যেকটি ফ্যাকালটির সভাপতি ছিলেন আশুতোষ। তিনি যেন 'সবজান্তা'—সব বিষয়ই বোঝেন, এমন কথাও সেদিন অনেক সমালোচকের মুখে শোনা গিয়েছিল ভাইস-চ্যান্সেলার সম্পর্কে। এই সব সমালোচকদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের লোক ছিলেন, তাই তাঁরা মনে করতেন, এই বিদ্যামন্দিরে স্বীয় অখণ্ড আধিপত্য স্থাপনের

উদ্দেশ্যেই বুঝি আশুতোষ প্রত্যেকটি ফ্যাকালটিতে ছিলেন। এই সম্পর্কে ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন লিখেছেন: "বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের চাকুরি জুটিল না, অগত্যা আর দশজন কৃতী ছাত্র যে ব্যবসায় অবলম্বন করে আশুতোষও সেই ব্যবসায়ই গ্রহণ করিলেন। তিনি উকিল হইলেন। কিন্তু অন্যান্য দশজন উকিলের মতো কেবল আইন চর্চায় সময় অতিবাহিত করেন নাই। একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজন হইবে বলিয়াই তিনি ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের অনুশীলন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার মতো বহু ভাষাবিদ্ ভারতবর্ষে বিরল ছিল। য়ুরোপের অনেকগুলি ভাষাই তিনি জানিতেন—ফরাসী ভাষাও অনর্গল বলিতে পারিতেন। এসিয়ার ভাষার মধ্যে সংস্কৃত, পালি, আরবী, পারসী, উর্দু, হিন্দী প্রভৃতি বিখ্যাত ভাষার কথাই নাই, পুস্তুর মতো একটি অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত ভাষা ও সাহিত্যেরও তিনি দীর্ঘকাল আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সমালোচকরা তিনি পোস্ট গ্রাজুয়েটের বিশ কি বাইশটি বোর্ডের সভাপতি বলিয়া তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার অধীনে কাজ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে আশুতোষ কখনো অনধিকার চর্চা করেন নাই।"

এই বিষয়ে দীনেশচন্দ্র সেনও সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন: "আশুতোষ স্বয়ং পণ্ডিতাগ্রগণ্য ছিলেন এবং সকল বিষয়েই তাঁহার অল্প-বিস্তর অধিকার ছিল,—গণিত, সাহিত্য, দর্শন ও সংস্কৃতের জ্ঞান তাঁহার যে কোনো অধ্যাপকের যোগ্য ছিল। কিন্তু এমন বিষয়ও ছিল যাহার পরিধিমাত্র তিনি স্পর্শ করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ও বিষয়-জ্ঞান এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, বিষয়টি বিবেচনাধীন হওয়া মাত্র তিনি তাহার প্রয়োজনীয়তা, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও তাহা পরিপুষ্ট করিয়া তোলার উপায় সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেন। একাধিক ফ্যাকালটির সভায় দেখা গিয়াছে, তিনি কোনো বিষয়ের সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম তথ্যগুলির আলোচনা কালে অধ্যাপকদের অপেক্ষাও তৎসম্বন্ধে দূরদৃষ্টি ও বর্তমান সমস্যাগুলির সমাধান করিবার শক্তি অনেক বেশি দেখাইয়াছেন। এজন্য তিনি প্রত্যেক বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ এরূপ দক্ষতার সহিত করিতেন যে, বহুদর্শী ও বহুপ্রবীণ অধ্যাপকেরাও অবনত শিরে তাঁহার শাসন মানিয়া লইয়াছেন, তাঁহার কার্যের প্রতিবাদ করিবার উপযুক্ত কিছু তাহারা পান

নাই। এই সকল মহাগুণে বোর্ড ও ফ্যাকালটিতে তাঁহার অপ্রতিহত একাধিপত্য ও রাজ-ছত্র স্বীকৃত হইয়াছিল।”

স্নাতকোত্তর বিভাগে উচ্চশিক্ষার বহুমুখী ব্যবস্থা আশুতোষের প্রতিভারই পরিচায়ক। এর মধ্যে চারটি বিভাগ তাঁর প্রধান কীর্তি বলা যেতে পারে, যথা, ১. ভারতীয় ভাষা সমূহের বিভাগ (Indian Vernaculars); ২. প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি ; ৩. ইসলামিক কালচার এবং ৪. পালি ভাষার চর্চা। তাঁর প্রতিভা ও পরিশ্রমের বহুলাংশ এই চারটি বিভাগের সংগঠনে কিভাবে ব্যয়িত হয়েছিল তার সবিশেষ আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। প্রাদেশিক ভাষা-বিভাগে আশুতোষ এই কয়েকটি ভাষা গ্রহণ করেছিলেন —বাংলা, অসমিয়া, মৈথিলী, ওড়িয়া, উর্দু, হিন্দী, গুজরাটী, দ্রাবিড়ী, তামিল, মালায়ালম, কেনারিজ এবং সিংহলী। ভাষাশিক্ষা করবার জন্য ছাত্র আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রত্যেক বিষয়ে একটি করে ২৫৲ টাকার মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন :

“এইভাবে প্রাদেশিক ভাষাগুলির আহ্বানে ভারতবর্ষের বহু দেশ হইতে সাড়া পাওয়া গিয়াছে। এই কলিকাতাকে ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ভাষার একমাত্র কেন্দ্র স্থানে পরিণত করিয়া তিনি প্রত্যেক প্রদেশের সঙ্গে শিক্ষা-বিষয়ে আমাদের পরম ঐক্য বিধান করিয়াছেন। এতগুলি ভাষা পড়িবার দরুণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত ভারতবর্ষের দৃষ্টি, কৌতূহল ও সৌহার্দ্য আমন্ত্রণ করিতে পারিয়াছিল।… নানা প্রাদেশিক ভাষাবিৎ অধ্যাপকগণের কলরবে ভারতীয় ভাষা বিভাগ মুখরিত হইয়া উঠিল। বাংলা দেশের সঙ্গে ভারতীয় অপরাপর দেশের একটা নূতন ঘনিষ্ঠতার সৃষ্টি হইল।…কিন্তু জাতীয় ঐক্য যদিও আশুবাবুর পরম কাম্য ছিল, তথাপি ইহা ছিল তাঁহার গৌণ লক্ষ্য, তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উচ্চ শিক্ষার উন্নতি। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন,— ‘বুঝিতে পারিতেছেন না, এতগুলি ভাষা-শিক্ষার দরজা খুলিয়া দেওয়াতে আমাদের দেশে শিক্ষার কতটা উন্নতির সম্ভাবনা দাঁড়াইয়াছে। এখন জাতীয় ইতিহাসের যে চর্চা হইতেছে, তাহা শুধু কয়েকখানি তাম্র-শাসন শিলালিপি ও বিদেশীয় লোকদের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া। কিন্তু দেশের লোকের

সাময়িক ঘটনা-সম্বন্ধে কি ধারণা, তাহা প্রত্যেক প্রাদেশিক প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যাইবে'।"

এইখানেই আশুতোষের দূরদর্শিতার পরিচয় দেখে বিস্মিত হোতে হয়। সেদিন একমাত্র তিনিই এই সত্যটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশের লোক নানাসূত্রে পরস্পরের নিকট পরিচিত ছিল আর এই পরিচয়ের চিহ্ন তাদের প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যেই উৎকীর্ণ আছে। তিনি আরো বিশ্বাস করতেন যে, এইভাবে যতদিন পর্যন্ত আমরা বিস্মৃত ও উপেক্ষিত প্রাদেশিক সাহিত্যগুলির সঙ্গে পরিচিত হোতে না পারছি, ততদিন পর্যন্ত আমাদের দেশের একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর ইতিহাস কিছুতেই রচিত হবে না। অনেকেই জানেন, এই অনুশীলনের ফলেই 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' আবিষ্কৃত হয় এবং এর ফলে বাংলায় মহারাষ্ট্র অভিযানের ইতিহাস সম্পর্কে নূতন উপকরণের সন্ধান পাওয়া যায়। এইভাবে প্রাদেশিক ভাষাগুলির অনুশীলনের ফলে ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ইতিহাসের রূপরেখা যে কী নূতন রূপ ধারণ করেছে, আজ বোধহয় আমরা সেটা প্রত্যক্ষ করতে পারছি এই একটিমাত্র কাজের জন্য আশুতোষের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

কোনো বিরাট প্রতিষ্ঠান গঠন করতে হোলে, কোনো উদার কল্পনাকে রূপদান করতে হোলে যেসব গুণের সমবায় আবশ্যক, তা আশুতোষের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। বিপুল কল্পনাশক্তি এবং তাকে রূপদান করতে হোলে যে অক্লান্ত সাধনা আবশ্যক, সৃষ্টি করবার সামর্থ্য ও তাকে শ্রেয়স্কর পথে পরিচালিত করতে হোলে যে প্রতিভার আবশ্যক, আশুতোষ চরিত্রে তাদের অপূর্ব মিলন ঘটেছিল। এসবের উপরে ছিল তাঁর স্বাজাত্যবোধ। প্রাদেশিক ভাষাগুলির পঠন-পাঠন এবং সেগুলিকে স্নাতকোত্তর পরীক্ষার বিষয়রূপে নির্দিষ্ট করে ভার্নাকুলারে উক্ত পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থার মধ্যে আমরা আশুতোষের ভূয়োদর্শন ও দূরদৃষ্টির পরিচয় পাই। আজ সেইকথা যখন একবার চিন্তা করি তখন বুঝতে পারি বাংলা দেশের ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টি কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। ভাইস-চ্যান্সেলাররূপে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে আশুতোষ কি করেছেন, পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা সেই বিষয়টির কিছু বিস্তারিত আলোচনা করব।

॥ আট ॥

বাংলা সাহিত্যকে আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত করে বাঙালীর মনীষাকে আধুনিক বিশ্বসাধনার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আশুতোষের প্রাণে গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল। বাঁকিপুরের সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে এই আকাঙ্ক্ষাটা পরিস্ফুট হোয়ে ওঠে। তিনি বাংলার লেখক না হোয়েও বাংলা সাহিত্যকে কী গভীর অনুরাগের চক্ষে দেখতেন এই অভিভাষণে তার সুস্পষ্ট পরিচয় আছে। এই বাসনার প্রেরণাতেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি পরীক্ষাতে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে একটা বিশিষ্ট স্থান দিয়েছিলেন। আমার বিবেচনায় ভাইস-চ্যান্সেলাররূপে এইটাই ছিল তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। এইক্ষেত্রে তিনি একটা আশ্চর্য দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন বিভাগের প্রসারের আগে থেকেই তিনি মাতৃভাষাকে তার উচ্চ আসন দিতে সংকল্প করেছিলেন। দু-চারজন বিজ্ঞলোক এই কাজের উপযোগিতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েছিলেন। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে বাঙালীর আর অন্যান্য ভারতীয়ের শিক্ষার জন্য মাতৃভাষা আর মাতৃভাষার চর্চা কতখানি স্থান নেবে, আশুতোষ তা অতি সহজেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের অনুপম সাহিত্য সৃষ্টি, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা আর বাণীর মন্দিরে শত শত সাহিত্যিকের শতাব্দীকালব্যাপী সেবা, পরোক্ষভাবে আশুতোষের মনে এই কথাটা জাগিয়ে থাকবে—বাংলাভাষার গর্ব করতে হোলে তাকে তার প্রাপ্য উচ্চ আসন দিতেই হবে। সুনীতিবাবু যথার্থই বলেছেন: "মাতৃভাষার চর্চার জন্য আশুতোষ তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা যতটা করাতে সমর্থ হয়েছেন আর কোনো ব্যক্তি বা কোনো প্রতিষ্ঠান ততটা করতে পারেননি। তাঁর যে কেবল দূরদৃষ্টি ছিল তা নয়, শিক্ষা সম্বন্ধে সরল সহজ বুদ্ধির দ্বারা অনুমোদিত, দেশভক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত

কতকগুলি বিশ্বাসও তাঁর ছিল, আর ছিল তাঁর মনোনীত চিন্তা আর ভাবকে কাজে স্পষ্ট করার মতো কর্তব্যনির্ধারণ শক্তি।'

অধ্যাপক শিশিরকুমার মৈত্র লিখেছেন: "স্যর আশুতোষ একদিন কথা-প্রসঙ্গে আমাকে বলিয়াছিলেন—'My religion is my country'—'আমার দেশই আমার ধর্ম'।' এইকথা একদিন বঙ্কিমচন্দ্রও বলেছিলেন। বস্তুত এই উক্তির মধ্যে দেশের প্রতি আশুতোষের যে প্রগাঢ় প্রেম ও ভক্তির পরিচয় আমরা পাই, তাই তাঁকে তাঁর মাতৃভাষার প্রতি অমনভাবে আকৃষ্ট করেছিল। এইদিক দিয়ে বিবেচনা করলে আমরা বলতে পারি যে, তিনি দেশসেবার ও দেশাত্মবোধের একটা নূতন দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন। তাঁর আমলের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষার প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। আশুতোষ মাতৃভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহাসনে বসিয়ে পুষ্পাঞ্জলি দান করেছেন। স্নাতকোত্তর পরীক্ষা যে বাংলা ভাষায় দেওয়া যেতে পারে, তাঁর আগে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। আশুতোষের এই একটিমাত্র প্রয়াসের আনুপূর্বিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হোলে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক লিখতে হয়।

আশুতোষ অনন্যসাধারণ প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সেই প্রতিভা তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে অকাতরে প্রয়োগ করেছিলেন। যখন থেকে স্নাতকোত্তর শিক্ষার ভার বিশ্ববিদ্যালয় নিজ হস্তে গ্রহণ করে, তখন এর ভাইস-চ্যান্সেলাররূপে তাঁর সাহস ও প্রতিষ্ঠান গঠননৈপুণ্যে সকলে বিস্মিত হয়েছিল। এই বিস্ময় শতগুণে অভিব্যক্ত হোল যখন তিনি ভারতের দেশীয় ভাষাগুলির পঠন-পাঠনের আয়োজন করেন। ইতিপূর্বে বাংলা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা ও বাংলা সাহিত্য অনাদৃত ছিল। অনেকেই হয়ত জানেন না যে, ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন বাংলা সাহিত্য একটি অবশ্যপাঠ্য বিষয়মধ্যে গণ্য ছিল। কিন্তু ১৮৬৮ থেকে ঐ ব্যবস্থা উঠে যায়। ইংরেজি সাহিত্যের নূতন রসাস্বাদে বিভোর বাঙালী শিক্ষিত সম্প্রদায় বাংলাভাষাকে অবজ্ঞা করতেই শিক্ষা করে-ছিলেন। মাইকেলের "হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন" কবিতাটির মধ্যে আমরা তারই একটা ছবি যেন দেখতে পাই। 'বঙ্গদর্শন'-এ বঙ্কিমচন্দ্র স্বীয়

মাতৃভাষার প্রতি সমকলীন শিক্ষিত বাঙালীর অবজ্ঞাসূচক মনোভাবের তীব্র নিন্দা করেছিলেন। ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে সিনেটের সদস্যপদ প্রাপ্ত হয়ে অল্পদিনের মধ্যেই আশুতোষ সিণ্ডিকেটে প্রবেশলাভ করেন। তখন থেকেই তাঁর লক্ষ্য ছিল, কি উপায়ে পুনরায় বাংলাভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার অবশ্যপাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন। ১৮৯১তে Faculty of Arts সভায় তিনি প্রস্তাব নিয়ে এলেন এম এ-তে যারা সংস্কৃত পড়বে তাদের বাংলা পরীক্ষা দিতে হবে। প্রস্তাবটি কিন্তু গৃহীত হয়নি। সেদিন একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র ব্যতীত সিণ্ডিকেটের আর সকলেই আশুতোষের এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। বিদ্যাসাগর তখন জীবিত ছিলেন না। আশুতোষ কিন্তু নিরাশ হোলেন না, উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করলেন।

'জাতীয় সাহিত্য' নামে আশুতোষের রচিত একখানি পুস্তক আছে। বাংলাভাষা ও সাহিত্য এবং ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে ১৯১৫ থেকে ১৯১৯ সনের মধ্যে তিনি যে পাঁচটি ভাষণ দিয়েছিলেন, এই বইখানি তারই সংকলন। এর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : " 'ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' " নামক প্রবন্ধে আশুতোষ ভারতব্যাপী বিশাল ভূমিকায় তাঁর মনের সর্বোচ্চ কামনার ও সাধনার যে চিত্র এঁকেছেন তাতে এই কর্মবীরের ধ্যানের মহত্ত্ব আমি সুস্পষ্টরূপে অনুভব করেছি। তাঁর বলিষ্ঠ প্রকৃতি শিক্ষানিকেতনে দুরূহ বাধার বিরুদ্ধে আপন সৃষ্টিশক্তির ক্ষেত্র অধিকার করেছিল। এইখানে তিনি সমস্ত ভারতের চিত্তমুক্তি ও জ্ঞানসম্পদের ভিত্তি স্থাপন করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব ও উদার কল্পনাশক্তি সমস্ত দেশের ভবিষ্যৎকে ধ্রুব আশ্রয় দেবার অভিপ্রায়ে সেই বিদ্যানিকেতনের প্রসারীকৃত ভিত্তির উপর স্থায়ী কীর্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করেছিল।"

সমস্ত ভারতের চিত্তমুক্তি সম্ভব হোতে পারে একমাত্র মাতৃভাষার অনুশীলন দ্বারা— এই সত্যটা আশুতোষ বুঝেছিলেন বহু আগেই, কিন্তু ভাইস-চ্যান্সেলার না হওয়া পর্যন্ত তিনি এই দুরূহ কাজকে বাস্তবে রূপায়িত করবার কোনো সুযোগ পাননি। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে ভার্নাকুলারে এম. এ. পরীক্ষার সৃষ্টি হয়। এর প্রায় সাত-আট বছর আগে থেকে দীনেশচন্দ্র সেন বাংলার এম. এ. পরীক্ষার ব্যবস্থার জন্য তাঁর কাছে প্রস্তাব করতে থাকেন। এই প্রসঙ্গে

দীনেশচন্দ্র লিখেছেন : "১৯২০ সনে একদিন আশুবাবুর নিকট হইতে ডাক আসিল। আমি যাওয়া মাত্র তিনি বলিলেন, 'এবার বাংলার এম. এ. বিভাগ খুলিব স্থির করিয়াছি। আপনি এণ্ডারসন সাহেবকে চিঠি লিখিয়া দিন, তিনি একটা খসড়া ও সিলেবাস ঠিক করিয়া পাঠান'।"

সেদিন আশুতোষের এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে দীনেশচন্দ্র বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি জানতেন না যে, কতকাল আগে থেকে আশুতোষ বাংলায় স্নাতকোত্তর বিভাগ খুলবার কথা চিন্তা করছিলেন সকলের অগোচরে। বাংলায় এম. এ. পরীক্ষা হবে, ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস কোথায়? ইতিপূর্বে দীনেশচন্দ্র বাংলায় 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামে একখানি বই লিখেছেন। কিন্তু কেবল যে বাঙালী ছাত্র তার মাতৃভাষায় এম. এ. পরীক্ষা দেবে এমন নয়, অনেক বিদেশী ছাত্র হয়ত বাংলায় এম. এ. দিতে চাইবে। এজন্য একখানি ইংরেজি বই দরকার। তিনি দীনেশচন্দ্রকে দিয়ে *History of Bengali Language and Literature* সম্পূর্ণ নূতনভাবে লিখিয়ে নিয়েছিলেন। তেমনি বৈষ্ণব-ইতিহাস সম্বন্ধে একজন 'রীডার' নিযুক্ত করে তাঁকে দিয়ে তা লিখিয়ে নিয়েছিলেন। অধ্যাপক জে. এন. দাসকে দিয়ে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে বর্ণিত বাংলার সামাজিক ইতিহাস লিখিয়ে নিয়েছিলেন। বিজয়চন্দ্র মজুমদারকে ভাষার ইতিহাস রচনার উৎসাহ দিয়েছেন। এইভাবেই তিনি বুনিয়াদ তৈরি করে মন্দির নির্মাণ কার্যে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। ইহাই ছিল তাঁর কর্মপদ্ধতি। পূর্বোক্ত এণ্ডারসন সাহেব ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের একজন সদস্য ছিলেন। ইনি চট্টগ্রাম-বিভাগের কমিশনার থাকাকালীন চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইনি দীনেশচন্দ্রের বিশেষ পরিচিত ছিলেন, সেইজন্য আশুতোষ তাঁর কাছ থেকে সিলেবাস পাবার জন্য দীনেশবাবুকে ঐরূপ কথা বলেন। এণ্ডারসন সাহেব অনুরুদ্ধ হোয়ে যথাসময়ে সিলেবাসের একটি খসড়া পাঠিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ পোস্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগে বাংলা পুঁথিশালার পত্তন কি করে হয়, সেই ইতিহাস জানা দরকার। বাংলা পুঁথি সংগ্রহের কাজে প্রথম যিনি অগ্রণী হন তিনি দীনেশচন্দ্র সেন। তাঁর সংগৃহীত পুঁথিগুলি বিশ্বকোষ-

সম্পাদক গ্রহণ করেন। এইরূপে প্রায় তিন-চার হাজার পুঁথি সংগ্রহ হয়। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ যখন খোলা হয় তখন আশুতোষ তিন হাজার টাকা মূল্যে ঐ পুঁথিগুলি ক্রয় করেন। এইভাবে পোস্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগে পুঁথিশালার পত্তন হয়। তারপর নানাস্থান থেকে নানাজনের সহায়তায় প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহের কাজ চলে এবং এইরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব সংগ্রহে প্রাচীন বাংলা পুঁথির সংখ্যা প্রায় নয়-দশ হাজারে দাঁড়ায়। পুঁথি সংগৃহীত হোল। এইবার রিসার্চ-স্কলার নিযুক্ত করবার সময়; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন অর্থের ঘোর অনটন চলেছে। এই বিভাগটির ভার তখন দীনেশচন্দ্র সেনের উপর ন্যস্ত ছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন: "আমি আশুবাবুকে একদিন বলিলাম—দশহাজার পুঁথি বাংলা পাঠাগারে সঞ্চিত হইয়াছে। এই পুঁথিগুলিতে বাংলাদেশের ভূগোল, সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে এত তথ্য আছে যে মৌলিক গবেষণায় ইহারা বাংলার সর্ববিষয়ে নূতন আলো প্রক্ষেপ করিবে।…যদি ইহাদের ব্যবহার না হয়, তবে শুধু কি আলমারি সাজাইবার জন্য এগুলি সংগৃহীত হইয়াছে?"

আশুতোষ দীনেশচন্দ্রের কথার গুরুত্ব অনুভব করলেন এবং যদিও বিশ্ববিদ্যালয় তখন 'অর্থকষ্টের ঝটিকায় টলমল', তথাপি আত্মশক্তির উপর তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। দীনেশচন্দ্রের আবেদন ব্যর্থ হোল না। সিণ্ডিকেটকে দিয়ে তিনি বাংলা বিভাগের জন্য চারজন রিসার্চ-স্কলার নিযুক্ত করবার প্রস্তাব পাস করিয়ে নিলেন। আশুতোষের মৃত্যুর পর শুধু পুঁথি সংগ্রহের কাজ বন্ধ হয়নি, গোটা বাংলা বিভাগকেই একটা বিরাট অপব্যয় বলে মনে করেছিলেন তদানীন্তন শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী লিণ্ডসে সাহেব। আশুতোষের সময় বাংলা পুঁথিশালার অধ্যক্ষ ছিলেন 'কৃষ্ণকীর্তন'-সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায়।

অন্যান্য বিভাগের তুলনায় বাংলা বিভাগ সম্পূর্ণ নূতন ছিল। এই বিভাগটি গঠন করবার জন্য আশুতোষকে কত নূতন সমস্যার সমাধান করতে হয়েছে তার কিছু পরিচয় লিপিবদ্ধ দীনেশচন্দ্র করেছেন তাঁর 'স্মৃতিকথা' গ্রন্থে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ঐগুলি পড়ে দেখতে পারেন। তিনিই দীর্ঘকাল যাবৎ এই বিভাগটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এই বিভাগের গঠনে আশুতোষের বিরাট কর্ম-প্রতিভার পরিচয় একমাত্র তিনিই বিশেষভাবে অবগত ছিলেন।

এর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত তিনি উল্লেখ করেছেন। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি যখন ময়মনসিংহ পল্লীগীতিগুলি আবিষ্কার করেন তখন সেইগুলি উদ্ধার করবার জন্য তিনি একদিন আশুতোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে বলেন : "বাংলা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বৈষ্ণব-কবিতা এতদিন জানিতাম, কিন্তু আমি আর এক ভাণ্ডারের সন্ধান পাইয়াছি, যাহা বৈষ্ণব-মহাজনদের পদাবলীর প্রায় গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইতে পারে। এই গীতগুলি উদ্ধার করিতেই হইবে—আমি এই কার্যে ব্রতী হইতে চাই।"

আশুতোষ অমনি অর্থ মঞ্জুর করলেন। চন্দ্রকুমার দে নামক জনৈক যুবক মারফৎ দীনেশচন্দ্র ঐ গীতগুলি সংগ্রহ করালেন। আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তজ্জন্য চন্দ্রকুমারকে পারিশ্রমিক দিলেন এবং সেই গাথাগুলি ছাপাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। এই প্রাচীন পল্লীগাথা সংগ্রহের জন্য দীনেশচন্দ্রকে উৎসাহ দিয়ে সেদিন আশুতোষ বলেছিলেন— "আপনি আপনার কাজ করে যান, আপনার কিছু চিন্তা করবার দরকার নেই। সংগৃহীত পল্লী-গীতি যখন মুদ্রিত হোয়ে বেরুলো তখন লাট রোনাল্ডসে এর একটা ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। বিলাতের 'টাইমস' পত্রিকায় এই বইয়ের যখন প্রশংসা করে সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তখন সকলেই বুঝতে পারলেন যে বাংলা ভাষার উন্নতি বিধানে আশুতোষ বৃথা প্রয়াস পাননি বা অর্থব্যয় করেন নি। তথাপি এই কাজের জন্যও সেদিন প্রতিকূল মন্তব্যের অভাব ছিল না। দীনেশচন্দ্র লিখেছেন : "বহুলোক এ সকল গানের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া আশুবাবুর মন ভাঙাইবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন।" কিন্তু যখন ডক্টর গ্রীয়ারসন, রদেনস্টাইন, সিলভ্যাঁ লেভী প্রমুখ পণ্ডিত ও সমালোচকগণ এই গানগুলির অজস্র প্রশংসা করে আশুতোষকে পত্র লিখলেন তখন এই গাথাসাহিত্যের উদ্ধার-সাধনে দীনেশচন্দ্রের পরিশ্রম ও আশুতোষের আনুকূল্যের জন্য সিণ্ডিকেট এই কাজের প্রশংসা করলেন।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রতি সিনেটের প্রবীণ সদস্যদের তখন বিরূপ মনোভাব ছিল। বিদেশী সাহিত্যের মোহে সংস্কারগ্রস্ত প্রাচীনপন্থীরা একেবারেই বুঝতে পারতেন না যে বাংলার প্রাচীন সাহিত্য আমাদের কতটা গৌরবের সামগ্রী। বাংলা স্নাতকোত্তর বিভাগ (এবং অন্যান্য ভারতীয়

প্রাদেশিক ভাষা বিভাগ) যে এইদেশের প্রকৃত হিতার্থে সংগঠিত হয়েছে— এই কথাটা বোঝাতে সেদিন আশুতোষকে কম বেগ পেতে হয়নি। "একদিন ফ্যাকালটির সভায় প্রকাশ্যভাবে এক প্রবীণ পণ্ডিত বলিয়া উঠিলেন, "প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে কি ছাই-ভস্ম আছে? এক রবীন্দ্রনাথের পুস্তক পড়িলেই বাংলা-সাহিত্যের সার-কবিত্ব পাওয়া যায় এবং তাহা তো আমাদের মেয়েরাও পড়িয়া বোঝে। বাংলায় মুদি দোকানের পাঠ্য কতকগুলি খাতাপত্র পড়াইবার জন্য আবার এম. এ ক্লাস। তাহার আবার অধ্যাপক!" বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিরুদ্ধে ইহাই ছিল সেদিনকার সমালোচনার ধারা।

আশুতোষ এই ধারণার মোড় ফিরিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর হোলেন। সেদিন এই দুঃসাধ্য কাজে তিনি আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের ন্যায় ব্যক্তিকে যদি তাঁর পার্শ্বে না পেতেন তা হোলে এই বিষয়ে তিনি কতদূর কৃতকার্য হোতেন তা ভেবে দেখার বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের মাতৃভাষা আজ যে গৌরবের স্থানে সমাসীন, এজন্য আশুতোষের যতখানি কৃতিত্ব, দীনেশচন্দ্রের কৃতিত্বও ঠিক ততখানি—এই কথাটা আজ বলবার সময় হয়েছে। গুণীর গুণের আদর করতে জানতেন আশুতোষ। তাই দেখি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তিনি দীনেশচন্দ্রকে সম্মানিত 'ডি. লিট' উপাধি দানের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু বাংলার এই অদ্বিতীয় ভাষাচার্য, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস-প্রণেতা এবং বাংলাভাষার একজন রসস্রষ্টা লেখকের স্মৃতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান আমরা কতটুকু দেখিয়েছি? বাংলা ভাষার উন্নতিবিধানে দীনেশচন্দ্রের আত্মত্যাগের কথা বাঙালী কি একেবারেই বিস্মৃত হোল? বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা যাতে মর্যাদার আসন পায় সেজন্য আশুতোষের মহাভুজের তলায় দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষদের সঙ্গে দীনেশচন্দ্রকেও সেদিন কম সংগ্রাম করতে হয়নি। এই প্রসঙ্গে কাউয়েল সাহেব ও ভগিনী নিবেদিতার নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ করেন কাউয়েল সাহেব এবং তিনি কবিকঙ্কণকে চসারের সঙ্গে তুলনা করেন আর নিবেদিতা রামপ্রসাদের কবিত্ব ও মাতৃভাবের গান হুইটম্যান, ব্লেক ও অন্যান্য ইংরেজ কবিদের রচনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করেন।* তখন থেকেই বাংলা সাহিত্যের প্রতি বিদেশী

* *Mother Kali:* Sister Nivedita

পণ্ডিতদের দৃষ্টি যেমন আকৃষ্ট হোতে থাকে, তেমনি এদেশে বাংলার নামে যাঁরা নাসিকাকুঞ্চন করতেন ক্রমে তাঁদেরও মতের পরিবর্তন হোতে থাকে।

বাঙালী আশুতোষ বাংলা ভাষার জন্য যা করেছেন, পরবর্তীকালে আর কোনো ভাইস-চ্যান্সেলারের পক্ষে তা সাধ্যায়ত্ত হয়নি। শক্তিমান আশুতোষের কর্মজীবনের এই অধ্যায়টি না জানলে শিক্ষা-সংস্কারক আশুতোষের কর্মপ্রয়াসের যথার্থ মূল্যায়ন করা যাবে না। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিরোধী লোক কেবল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেরই ছিলেন তা নয়, ভিতরেও প্রতিকূলতা যথেষ্ট তীব্রতার সঙ্গে চলেছিল—সে অপ্রিয় ইতিহাসের আনুপূর্বিক আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নেই। বাংলা বিভাগ ছাড়া ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির জন্য আশুতোষ কম চিন্তা করেননি। বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি। ইংরেজের লেখা পাঠ্যপুস্তকই তাকে আত্মবিস্মৃত করে তুলেছিল। আমাদের জাতীয় গৌরবেব স্মৃতি জাগ্রত করবার জন্য ভাইস-চ্যান্সেলাররূপে আশুতোষ যে প্রয়াস পেয়েছিলেন, তার মূল্য আমরা কতটুকু বুঝেছি? আচার্য দীনেশচন্দ্র এই প্রসঙ্গে যথার্থই মন্তব্য করেছেন: "দ্বারভাঙ্গা বিদ্যালয়ের দ্বার উদ্ঘাটনের পূর্বে ইতিহাসের এম. এ গণ ভারতবর্ষের ইতিহাসের 'ক' 'খ'-এর উপর মাত্র হাত বুলাইতেছিলেন, কিন্তু এদেশের রাজৈশ্বর্যের কথা একেবারে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে লুক্কায়িত ছিল। মহামনা উইলসন সাহেব এসিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত করিয়া যে দীপ জ্বালাইয়াছিলেন, আশুবাবু তাহা আমাদের বিদ্যা-পীঠে আনিয়া সেই আলোকে এদেশের শিক্ষার্থীদের মোহ-ধ্বান্ত দূর করিয়া দিলেন। তাঁহার অনুপ্রাণনায় বহু অধ্যাপক ও শিক্ষার্থী এদেশের প্রাচীন ইতিহাস-উদ্ধারে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। ডক্টর ভাণ্ডারকরকে আনিয়া তিনি এই বিভাগের ভিত স্থাপন করিলেন।" পরবর্তীকালে এই বিভাগে যাঁরা নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে রমেশচন্দ্র মজুমদার, রমাপ্রসাদ চন্দ, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রাধাগোবিন্দ বসাক প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই আশুতোষের কাছ থেকে উৎসাহ লাভ করে ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস-চর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন। এই বিভাগে ডক্টর স্টেলা ক্রামরিশের মতো প্রতিভাশালিনী মহিলার নিয়োগও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। ভারতীয় শিল্পকলা বিদ্যার

পুনরুজ্জীবন ভিন্ন যে ভারতীয় সংস্কৃতির যথাযথ মূল্যায়ন সম্ভব নয়, এই তথ্যটা বুঝতে আশুতোষের বিলম্ব হয়নি।

তেমনি বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যে আশুতোষের বিশেষ অনুরাগ ও উৎসাহ ছিল। ভারত ও ভারতের বাইরের বিরাট বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল। মহাবোধি বিহারের প্রতিষ্ঠাতা অনাগরিক ধম্মপাল (১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে শিকাগো বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে ইনিও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন) ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহা-মহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের সহযোগিতায় আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি বিভাগের প্রবর্তন করেন। ইহাও তাঁর অন্যতম কীর্তি হিসাবে গণ্য হোতে পারে। তাঁর পূর্বে ভারতের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধ-ইতিহাস শিক্ষাদানের এবং গবেষণার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। অথচ য়ুরোপ ও আমেরিকার বহু শিক্ষা-কেন্দ্রে বৌদ্ধ-ধর্ম ও ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে। এমন কি বৌদ্ধ ইতিহাসের গবেষণায় অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত যশস্বী হয়েছেন। আশুতোষ এসব সংবাদ রাখতেন। প্রাচীন ইতিহাসের পুনর্বিন্যাসে বৌদ্ধ-সাহিত্যের আলোচনার যে প্রয়োজনীয়তা আছে, তা অনুভব করেই তিনি পালি-শিক্ষার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার প্রচলনে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন।

পোস্ট-গ্রাজুয়েটের প্রাদেশিক ভাষা বিভাগে অনেক ভাষার পণ্ডিতের দরকার হয়। জ্ঞানপথের পথিকের জাতিভেদ নেই, বর্ণ ভেদ নেই, এই কথাটা আশুতোষ বিলক্ষণ মানতেন। "সর্বত্র গুণের পূজার জন্য তাঁহার হস্ত পুষ্প কুড়াইত, কোনো সম্প্রদায় বা ধর্মের প্রতি তাঁহার অতিরিক্ত অনুরাগ বা বিরাগ ছিল না। কোথায় কোন্ বিষয়ের কোন্ পণ্ডিত আছেন, তাহার সমস্ত খবর তিনি জানিতেন।" কেমন করে তিনি এই খবর রাখতেন? সহস্র কাজের মধ্যে যদি কোনো সময়ে একটু অবসর পেতেন, তখনি আশুতোষ একমনে ক্যালেণ্ডারগুলি ভালো করে পড়তেন। এই ভাবেই তিনি বোম্বাই, কলিকাতা, বেনারস প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার খুঁজে খুঁজে কৃতী ছাত্রদের নামের

সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করেছিলেন। এই উপায়ে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে এনে কৃতবিদ্য তরুণ ও প্রবীণ অধ্যাপকদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান দিয়েছিলেন।

আশুতোষ ঠিক করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ললিতকলা শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। চিত্রবিদ্যা ললিতকলার অন্তর্গত; তিনি প্রথমে চিত্রবিদ্যা দিয়েই কাজটা আরম্ভ করলেন। তাঁর ইচ্ছা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিভাগের ভার গ্রহণ করেন। দীনেশচন্দ্রের মারফৎ তিনি প্রস্তাব পাঠালেন তাঁর কাছে। মাসিক ৫০০৲ টাকা বেতনে তিনি রাজী হবেন কিনা, এই কথাটি জানবার জন্য দীনেশবাবু একদিন জোড়াসাঁকোয় এসে শিল্পাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং সব কথা বলে শেষে নিবেদন করলেন, "আশুবাবু বর্তমানে অসুস্থ, তা নইলে তিনি নিজেই এসে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। আপনি কি একবার ভবানীপুরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারবেন?" আর বেশি বলতে হোল না। যথাসময়ে তিনি এসে আশুতোষের সঙ্গে দেখা করলেন। সঙ্গে ছিলেন দীনেশচন্দ্র। সেই সময়ে অবনীন্দ্রনাথ সরকারী আর্ট কলেজের অধ্যক্ষের পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন। আশুতোষ ভারতীয় চিত্র-বিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা এবং অবিসংবাদিতভাবে গুরুস্থানীয় হিসাবে অবনীন্দ্রনাথকে এমন সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন যে তাঁকে তিনি বলেছিলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা নাই, নতুবা তোমাকে এই সামান্য দক্ষিণা দেওয়ার প্রস্তাব করিতাম না, ইহা তোমার যোগ্য নয়। তুমি মাঝে মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ে চিত্রশিল্প সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবে এবং যদি কেহ ডিগ্রী পাইতে চায়, তবে তাহাকে উপদেশ দিয়া ও শিখাইয়া সেই উপাধির যোগ্য করিয়া তুলিবে, তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিবার দরকার হইবে না।" অতঃপর তিনি শিল্পগুরুকে সিনেটের একজন 'ফেলো' করলেন এবং চিত্রবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত করলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'বাগেশ্বরী বক্তৃতামালা'র ইহাই সূচনা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯১৯ সালে খয়ড়ার কুমার গুরুপ্রসাদ সিংহ যখন দ্বিতীয়বার বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে চার লক্ষ ষাট হাজার টাকা প্রদান করেন, তখন সেই অর্থ দ্বারা তাঁর স্ত্রী রাণী বাগেশ্বরী দেবীর নামে ললিতকলা চেয়ারের ঐ প্রকার নামকরণ হয়।

এই প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "আমার সৌভাগ্য যে, আশুতোষ আমাকে ডেকে পাঠিয়ে দেশের ছাত্রজীবনের সঙ্গে আমাকে মেলবার অবসর করে দিলেন। আমাকে কেন যে তিনি ডেকে নিলেন তা আজও আমি বুঝতে পারিনি। যে লোক জাহাজ চালিয়ে চলেছে সে যে ডিঙার মাঝিকে সঙ্গী করে নিলে তার কারণ—যে ডাকলে সে ছাড়া যাকে ডাকলে সে তো বলতে পারে না। অনেক বড়ো ছিলেন যে তিনি, আর অনেক ছোটো ছিলেম যে আমি। সেই আমাকে ডাক দেবার ধারাটা কেমন ছিল তা বলি। মাথা তাঁর পায়ের কাছে ছুইতে না ছুইতে তাঁর হাত এগিয়ে এলো, আমাকে একেবারে তাঁর বিছানার একধারে বসিয়ে দিলেন, তারপর একেবারে কাজের কথা—তোমার উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিই এমন সাধ্য আমার নেই, কিন্তু একাজ তোমাকে নিতে হবে।...বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্টের চেয়ার খোলার দু'চার দিন আগের কথা। আমি বাংলায় বলব স্থির করেছি জেনে তিনি আমাকে ডেকে বললেন, দেখ, লাটসাহেবের ইচ্ছে, নিদেন প্রথম বক্তৃতাটা ইংরেজিতে হোক্, কি বল? আমি সোজা আপত্তি জানালাম—হবে না, আমি ইংরেজি জানিনে এ আমার সাধ্যের বাইরে। তিনি আর কোনো উত্তর দিলেন না। যথাসময়ে চেয়ার খোলা হোল। বাংলা ভাষায় লেকচারের পর তিনি আমায় কাছে ডেকে বললেন, তুমি বাংলায় বলে ভালোই করেছ, আমি চাই এখানের সব কটা লেকচার বাংলায় হয়। তখন আমি বুঝলেম এমনি করে তিনি আমায় যাচিয়ে নিলেন। বাংলাভাষার উপর কতখানি টান তাঁর মনে ছিল এই অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে আমি অনুভব করলেম। এই মাতৃভাষাকে শিক্ষা দেবার ভাষা করে যাওয়া একেবারে তাঁর শেষ কাজও বলতে পারো।"

অঙ্কশাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত আশুতোষ আর্টের প্রতি সত্য সত্যই অনুরাগ পোষণ করতেন। এর সাক্ষ্য দিয়েছেন শিল্পগুরু। তিনি লিখেছেন: "একদিন লেকচারের পর তিনি বললেন, দেখ, আগে আমিও একটু আধটু আর্ট সম্বন্ধে চর্চা করেছি। এরপর থেকে প্রত্যেক প্রবন্ধ আমাকে অতি সাবধানে লিখতে হতো। এই যে তিনি বলেছিলেন তিনি আর্ট চর্চা করেছেন, তার প্রমাণ হঠাৎ পেলেম একদিন তাঁর বাড়ির ঘরে একটা আলমারি-ঠাসা আর্টের

বই দেখে—চিত্রবিদ্যার অমূল্য সমস্ত পুস্তক; খুব পুরাতন, খুব আধুনিক সমস্ত ধরা সেখানে। সকল বিষয়ে জানার জন্য কী একান্ত উৎসাহ ছিল তাঁর মনের মধ্যে। রূপবিদ্যা—বিদ্যাচর্চার মধ্যে তাকে স্থান দিলেও চলে, না দিলেও সংসার চলে যায়, এইতো আমাদের ধারণা। রূপবিদ্যার চেয়ে ডাক্তারি অস্থিবিদ্যা বেশি কাজে আসে, জীবনে এ ধারণাও সাধারণ। কিন্তু এই অসাধারণ মানুষটি রূপতত্ত্বের স্থান আছে বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশি, এটা ধরলেন এবং সেইভাবে কাজ আরম্ভ করলেন।"

ইনিই আশুতোষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধাতাপুরুষ আশুতোষ।

সংগীত সম্বন্ধেও একটি পোস্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ খুলবার ইচ্ছা ছিল আশুতোষের। এই বিষয়ে একবার মধুপুরে দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে আশুতোষের যে আলোচনা হয় তার একটি বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন এইভাবে: "সে আজ মাত্র আট মাস আগের কথা। পূজার সময় আমি তখন মধুপুরে। আশুতোষের ওখানে সন্ধ্যায় আহারের নিমন্ত্রণ ছিল। অনেকক্ষণ গানবাজনা হোল। তাঁকে সংগীতে বেশ উৎসাহী দেখে মনটা ভারি খুশি হোল। কারণ আমার ধারণা ছিল যে সংগীত সম্বন্ধে তাঁর ধারণা আমাদের অন্যান্য বড়োলোকদের মতো। আমাদের মধ্যে কথায় কথায় উচ্চ-শিক্ষায় ললিতকলার (Fine Arts) স্থান সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। আশুতোষ বললেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীত শেখাবার আমার খুবই ইচ্ছে ছিল হে। কিন্তু কি বলব গানের জন্য কেউ টাকা দিতে চায় না। আমি একবার চেষ্টা করেছিলাম, তাই একথা বলতে পারি। আমি বললাম যে এটা দুঃখের বিষয়। কারণ য়ুরোপে অনেক বড়ো বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়েই তারা সংগীত প্রভৃতি আর্টের অধ্যাপনার ব্যবস্থা করেছে—অথচ আমরা এ সম্বন্ধে এতই উদাসীন। আশুতোষ একটু হেসে বললেন—তা আর বলতে। আমাদের দেশ এ সম্বন্ধে এতই পেছিয়ে রয়েছে যে চিত্রবিদ্যায় আমি অধ্যাপকের ব্যবস্থা করার দরুণ লোকে বলে, আমাদের গরীবের ও ঘোড়া রোগ কেন ইত্যাদি। আমাকে এজন্য কি কম গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে? তবে সে যাই হোক, সংগীত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি ঢোকাবই।"*

* বঙ্গবাণী: আষাঢ় ১৩৩১

এর পর আশুতোষ অতি অল্পকালই জীবিত ছিলেন, তাই তাঁর এই সংকল্পটি অচরিতার্থই থেকে যায়।

আশুতোষের কর্মজীবনের মধ্যাহ্নকালে রবীন্দ্র-প্রতিভা সারা বিশ্বের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বাংলার কবি বিশ্বকবি রূপে বন্দিত হয়েছেন, ভারত-বর্ষের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম সাহিত্যে দুর্লভ 'নোবেল পুরস্কার' লাভ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধাররূপে আশুতোষ যে যুগান্তর এনেছিলেন উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি বাংলার এই মহান কর্মীপুরুষের প্রতি অন্তরে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষ রবীন্দ্রনাথকে পেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। বি. এ.'তে যখন বাংলা প্রবর্তিত হয়, আশুতোষের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ তখন দু'একবার বাংলার প্রশ্নপত্র তৈরি করে দিয়েছিলেন। তখন বাংলায় এম. এ.র সৃষ্টি হয়নি। এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র লিখেছেন : "বাংলায় উচ্চশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়ার পর আশুবাবু ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, কবিবর আমাদের সহিত সহযোগ করিয়া এই বিভাগটির উন্নতিসাধন করিবেন। সূচনায় তিনি এই বিভাগের শিক্ষা-বিষয়ে একটু মনোযোগী হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি আশুতোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেটি প্রাচীন বাংলার রচনার নমুনা-স্বরূপ একটা বড়ো রকমের সাহিত্য-চয়নিকা সংকলন।"

কিন্তু আশুতোষ কবির সহযোগিতা পেলেন না। তার একটা কারণ অবশ্য ছিল। নূতন এম. এ.র পাঠ্যতালিকা তৈরি হোল। তাতে রবীন্দ্রনাথ বাদ পড়লেন। সিণ্ডিকেট নিয়ম করেন যে কোনো জীবিত গ্রন্থকারের বই নেওয়া হবে না। কিন্তু দীনবন্ধু, মাইকেল প্রভৃতি লেখকেরাও প্রথমে স্থান পাননি, একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা কিছু কিছু পাঠ্য হয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে তখন সংবাদপত্রে কিছু সমালোচনাও হয়। দীনেশচন্দ্র লিখেছেন : "নানা লোকে নানা কথা কহিয়া কবিকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে আমার নামে কতকগুলি মিথ্যা কথা রটিয়াছিল।" কিন্তু নিন্দুকের মিথ্যা রটনায় কবি প্রথমটায় বিভ্রান্ত হোলেও, পরে তাঁর সহযোগিতার

হস্ত প্রসারিত করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। সে মহত্ত্ব তাঁর বিলক্ষণ ছিল। আশুতোষ অনুরোধ করে পাঠালেন কবিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রশ্নকর্তা হবার জন্য। দীনেশচন্দ্র সে অনুরোধ বহন করে নিয়ে আসেন কবির কাছে। তিনি সে অনুরোধে সাড়া দিলেন। তখন দুজনে মিলে paper set করবার নিয়ম ছিল। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রশ্নগুলি রবীন্দ্রনাথকে করতে বলা হয়। তিনি দীনেশবাবুকে বলেন, 'আমি তো এ বিষয়ে অভিজ্ঞ নই, আপনি বিষয়টি ভালো জানেন, আপনি প্রশ্ন করে আসুন, তারপর আমি দেখে দেব।' পরবর্তী কাহিনী দীনেশচন্দ্র এইভাবে বর্ণনা করেছেন:

"তদনুসারে আমি প্রশ্ন করিয়া তাঁহার নিকট লইয়া গেলাম। তিনি প্রায় একঘণ্টাকাল প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন এবং দুই-একটি প্রশ্ন তাঁহার মনঃপূত না হওয়ায়, তাহা জানাইয়া দিলেন। আমি প্রশ্ন লইয়া বাড়িতে আসিলাম এবং তাহা নকল করিয়া অফিসে নিয়া আসিলাম। দুই-তিন দিন পরে আশুবাবু আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমাকে তিনি কহিলেন, 'প্রশ্ন কি আপনিই করিয়াছেন? রবিবাবুকে উহা দেখান নাই?' আমি সমস্ত কথা তাঁহাকে জানাইলাম। আশুতোষ বলিলেন—'কবিবর জানাইয়াছেন যে, সে প্রশ্ন তিনি করেন নাই, এসকল দায়িত্ব লইতে তিনি প্রস্তুত নহেন। আপনিই উহা করিয়াছেন, উহাতে তাঁহার নাম যেন দেওয়া না হয়।' এইরূপ ভাব পরিবর্তনে আমি ব্যথিত হইয়াছিলাম। কিন্তু কেন যে এই পরিবর্তন হইল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বস্তুতঃ আশুতোষের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল কবিবরকে বঙ্গ বিভাগে আনিয়া তাঁহার উপর সমস্ত ভার ন্যস্ত করা। কিন্তু তিনি ধরা দিলেন না। তাঁহাকে একাধিকবার পরীক্ষক-স্বরূপে আনিবার জন্য আমরা চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছি।"

আশুতোষ কিন্তু রবীন্দ্র-প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করতে কুণ্ঠিত হন নি। প্রথমত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কবিকে 'ডি লিট'. উপাধিতে ভূষিত করেন। ইহা কবির 'নোবেল পুরস্কার' লাভের আগের ঘটনা। দীনেশচন্দ্র লিখেছেন:- "কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, কবিবর 'নোবেল প্রাইজ' পাওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহাকে 'ডি লিট'. উপাধি দেওয়া হয়। এ

বিষয়ে কাগজপত্র সকলই আছে ; তাহা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সিণ্ডিকেট যে তারিখে এই সম্মান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেওয়া স্থির করেন, তাহার পর কলিকাতায় কবির 'নোবেল-প্রাইজ' প্রাপ্তির সংবাদ আসে। কিন্তু সিণ্ডিকেটে এই প্রস্তাব পাস হইবারও অনেক পূর্বে আশুতোষ কবিবরকে উপাধি দেওয়ার সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন।"

দ্বিতীয়ত, অনেক দিন আগে থেকেই আশুতোষ রবীন্দ্রনাথকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কবি সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু ১৯২৪ সালের আগে তিনি এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন নি। প্রভাতকুমার 'রবীন্দ্র-জীবনী' গ্রন্থে লিখেছেন যে, এই বছর (১৯২৪) কবি কলিকাতায় আসিলে আশুতোষ তাঁহাকে অন্ততঃ একটি বক্তৃতাও দেওয়ার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। কবি তাঁহাকে জানান যে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করিবার সময় তাঁহার নাই ; তবে মৌখিক ভাষণ দিতে কর্তৃপক্ষের যদি আপত্তি না থাকে, তবে তিনি সেরূপ করিতে প্রস্তুত। আশুতোষ রাজী হইলেন। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা দিলেন। এই ঘটনার দশ বছর পরে 'কমলা লেকচার' দেওয়ার জন্য কবি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আর একবার নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের সম্মানে যে পদক দিয়ে থাকেন তার নাম 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক'। আশুতোষের মায়ের নাম জগত্তারিণী এবং তাঁরই স্মৃতিতে আশুতোষ-প্রদত্ত অর্থে এই পদকের সৃষ্টি হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত সাহিত্যের এই দুর্লভ সম্মান সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথই লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে আশুতোষের ব্যক্তিগত দানের পরিমাণ প্রায় একলক্ষ টাকা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে আশুতোষ বাংলা ভাষাকে স্থান দিয়ে একটা বড়ো রকমের কাজ করেছিলেন, তেমনি অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষ গুলিকেও ঐ মর্যাদার স্থান দিয়ে তিনি তাঁর বহুদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এই সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা অনুধাবন করার জন্য আমরা পূর্বোক্ত 'জাতীয়-সাহিত্য' গ্রন্থ থেকে কিছু অংশের উদ্ধৃতি এখানে দিলাম। বাঙালী আশুতোষের কল্পনায় তাঁর স্বজাতি ও মাতৃভাষা যেমন আদরের ছিল, তেমনি তাঁর নিকট সমানভাবেই প্রিয় ছিল সমগ্র ভারত ও ভারতের প্রাদেশিক ভাষাসমূহ।

সেইজন্যই তিনি বলতে পেরেছিলেন, "আজ একবার ক্ষণকালের জন্য আমাদিগকে বঙ্গের মানচিত্র গুটাইয়া রাখিয়া, ভারতের মানচিত্রে দৃষ্টি সংযোগ করিতে হইবে। কলবাহিনী ভাগীরথীর তীরে দাঁড়াইয়া একবার নর্মদা-সিন্ধু-কাবেরীর স্রোতে মানস স্নান করিতে হইবে। শ্যামা বঙ্গভূমির কোলে বসিয়া শৌর্যবীর্যের সমাধিক্ষেত্র রাজপুতানার গম্ভীর মূর্তি দেখিতে হইবে। কি করিলে, কোন্ পথে চলিলে, আমাদের বঙ্গভারতীকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাজ-সজ্জায় মনের মত করিয়া বিভূষিত করিতে পারিব, কি করিলে আমার বঙ্গ-সাহিত্যকে কালে ভারত-সাহিত্যে পরিণত করিতে পারিব, সকল প্রদেশের মনীষা-ফলে বঙ্গভূমিকে ফলবতী করিতে পারিব—এই চিন্তা আমাদিগকে করিতে হইবে। আমি বাঙালী যেমন মহারাষ্ট্রীয় জ্ঞান-গরিমায় আমার মনকে সাজাইতে চাই, তেমনই আবার বাংলার মনীষা-সম্পদে তৎ-তৎ প্রদেশ কি উপায়ে সম্পন্ন হইতে পারে, সে কথাও আমাকে ভাবিতে হইবে। ক্ষুদ্র আপনাকে ভুলিয়া বৃহৎকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। অল্পে সুখ নাই, যাহা ভূমা, বিরাট—তাহাতে আত্মবিসর্জন করিতে হইবে।"

অন্যত্র তিনি বলেছেন: "অন্যের যাহা ভাল, তাহা আমাকে লইতে হইবে। আমার যদি কিছু ভাল থাকে, তাহা অন্যকে অঞ্জলি পুরিয়া দিতে হইবে। এইরূপ আদান-প্রদান ছাড়া আমাদের সাহিত্যের প্রকৃত অভ্যুদয়ের আশা নাই, পূর্ণত্ব লাভের সম্ভাবনা নাই। এমন একটি সাধারণ উপায় নির্ধারণ করিতে হইবে যাহার আশ্রয়ে বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মাদ্রাজ, গুর্জর, রাজপুতানা, গান্ধার, পাঞ্জাব—সব একসূত্রে গ্রথিত ও সাহিত্যের এক সমতটে সমবেত হইতে পারে। বাংলার শ্যামা-দোয়েলের কূজনে রাজপুতানার ময়ূর কেকামৃত বর্ষণ করিবে, আবার গান্ধারের দ্রাক্ষারসে বাংলার সাহিত্যকুঞ্জ সরস হইবে।...এইরূপ করিতে পারিলেই কালে ভারতবর্ষে এক অদ্বিতীয় ও অবিচ্ছিন্ন এবং প্রকৃত ঐক্যবদ্ধ সাহিত্য-সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন হইবে।' মনে হয় এই মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হোয়েই আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাদেশিক ভাষাগুলির পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

ভারতবর্ষে সাহিত্যিক একতার সমাধানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির যে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে সে কথা তিনি যে কতকাল পূর্বে চিন্তা করে গিয়েছেন তা

ভাবলে বিস্মিত হোতে হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: "শিক্ষার প্রকৃত কেন্দ্র দেশে এখন বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমান সময়ে ভারতে সবে সাত আটটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে মাত্র। কিন্তু সেদিন আর দূর নহে মনে হয়, যখন ভারতের এক-এক প্রদেশে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় দেখিতে পাইব। যখন বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া দেশে অন্য কোন শিক্ষার কেন্দ্র নাই বা থাকিলেও তাহা গণনার মধ্যেই নহে, তখন যদি দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে কোনরূপ কিছু অদল-বদল করিতে হয়, বা নূতন কিছু করার দরকার হয়, তবে তাহা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়াই করিতে হইবে। ভারতের সাহিত্যিক একতার সমাধান যদি করিতেই হয়, তবে তাহা যতদূর সম্ভব ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যেই করিতে হইবে।...নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই, ভগবানের নাম করিয়া, দেশমাতৃকার চরণ স্মরণ করিয়া, বঙ্গভারতীর পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিয়া আমরা কার্যে প্রবৃত্ত হইব। ...আমার হৃদয়ে আমি ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইতেছি।' চির আশাবাদী আশুতোষ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাদেশিকতাকে কোনোদিনই স্থান দেন নি—তাঁর ধ্যানে এবং জ্ঞানে ছিল ভারতবর্ষ এবং বীণাপাণির মন্দিরে জাতিধর্মনির্বিশেষে তিনি সকলের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মায়ের পদে পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ করে গিয়েছেন। শিক্ষা-সংস্কারক আশুতোষের মহত্ত্ব এইখানেই।

আজ দেশে ভাষা সমস্যাটা নূতন করে দেখা দিয়েছে। ইংরেজী থাকবে কি যাবে, দেশীয় ভাষাগুলির মধ্যে কোন্‌টা রাষ্ট্রভাষার স্থান অধিকার করবে, এই নিয়ে প্রবল বিতর্ক উঠেছে। এই প্রসঙ্গে আশুতোষের অভিমত স্মর্তব্য। তিনি বলেছেন: "জাতীয় ভাব বজায় রাখিতে হইলে জাতীয় ভাষার সেবা আবশ্যক। বিজাতীয় ভাষার সাহায্যে জাতীয় সাহিত্য গঠনের চেষ্টা করা বাতুলতার কার্য। দশভূজার পাদপদ্মে রক্ত জবার অর্ঘ্যই মানায়, গোলাপ শত সুন্দর হইলেও মাতৃপদের অযোগ্য। ইহার অধিক আর কিছু বলিতে চাহি না। ইংরেজী ভাষা অর্থকরী হইলেও ভারতের অধিকাংশ লোক—ইতর সাধারণ—তাহা জানে না বা এখনও জানিবার জন্য তাহাদের প্রাণে তেমন আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় নাই। সুতরাং ইংরেজীর সাহায্যে তাহাদিগকে বুঝাইতে প্রয়াস করা বৃথা।...আমার মনে হয় জাতীয় ভাব ফুটাইতে হইলে, সকলকে এক

অদ্বিতীয় জাতীয়তার সূত্রে গাঁথিতে হইলে, জাতীয় সাহিত্যে একতাবন্ধনের চেষ্টা করিতে হইবে। বিভিন্ন জাতির ভাবের আদান-প্রদানের সুব্যবস্থা স্ব স্ব জাতীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়া করিতে হইবে। উচ্চশিক্ষিত হইতে নিরক্ষর কৃষককুল পর্যন্ত এক উর্ণনাভের জালে বেড়িয়া ফেলিতে হইবে, অন্যথা একীকরণ অসম্ভব।...Unification of language না হউক, Unification of thought and culture নিশ্চয়ই জন্মিবে। সুতরাং সমগ্র ভারতের সকল কেন্দ্রে, সকল পল্লীতে এক স্রোত প্রবাহিত হইবে। মরুভূমিও তখন সরস হইয়া উঠিবে! ইহা আমার স্বপ্ন নহে।"

আজ একটি প্রশ্ন উঠেছে কোন্ ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষার স্থান নেবে। আশুতোষ বহুকাল পূর্বে এই বিষয়ে চিন্তা করে যে অভিমত প্রকাশ করে গিয়েছেন তা আজো তার মূল্য হারায়নি। তিনি বলেছেন: "কেহ কেহ বলেন, সমগ্র ভারতে একভাষার প্রচলন আবশ্যক, কেন না ভাষাভেদে মনোভেদ, সুতরাং মতভেদ অনিবার্য। তাই তাঁহাদের মতে অন্তত হিন্দী ভাষা সমগ্র ভারতের জাতীয় ভাষা হওয়া উচিত। আমি কিন্তু এ মতের সমর্থন করিতে পারি না; যে কারণে ইংরাজী ভাষা আমাদের জাতীয় ভাষা হইতে পারে না, সেই কারণেই হিন্দী বা অন্য কোন একটা নির্দিষ্ট ভাষাও ভারতের একমাত্র সার্বজনীন ভাষা হইতে পারে না। ইংরাজী ভাষা ভারতের জাতীয় ভাষারূপে গৃহীত হইলে যেমন প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ ক্রমে তাহার নিজের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া অশ্বত্থপাদপজাত উপবৃক্ষের মত হইয়া পাড়িবে, সেইরূপে হিন্দীকে সমগ্র ভারতের ভাষা করিতে গেলেও ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশসমূহ তাহাদের নিজের নিজের বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ফেলিবে।"

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আশুতোষের কি রকম প্রাণের টান ছিল তার প্রমাণ আছে বাংলার দুইটি স্মরণীয় কবি-প্রতিভা সম্পর্কে তাঁ'র আলোচনার মধ্যে। ফুলিয়াতে কৃত্তিবাসের ভিটায় দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন: 'সংস্কৃত কাব্যাবলীর সহিত ব্যাস-বাল্মীকির যে সম্বন্ধ, বঙ্গভাষার কাব্যাবলীর সহিত কৃত্তিবাসেরও সেই সম্বন্ধ। যে ভাষা কোনও সম্প্রদায় বিশেষে সীমাবদ্ধ নহে, সকল সম্প্রদায় নির্বিশেষে, সমাজ-দেহের প্রত্যেক শিরা-ধমনী-কৈশিকায় যে ভাষা প্রবেশ করিতে পারে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকে যে ভাষাকে

'আমার' বলিয়া গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করেন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-অপণ্ডিত সকলে সমানভাবে যে ভাষাকে আদর করিয়া লয়েন, তাহাই যথার্থ ভাষা। কালিদাস সর্বতোগামিনী, সর্বতোব্যাপিনী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই যেমন তাঁহার কাব্য সকল সম্প্রদায়ের সকল সময়ে সকলের প্রিয়, মহাকবি কৃত্তিবাসও তদীয় অনবদ্য রামায়ণ কাব্য সেইরূপ সর্বকালানুযায়িনী, সর্বতোগামিনী ও সর্বতোব্যাপিনী ভাষায় রচনা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার রামায়ণ এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।·· মনোহর কল্পনা, মধুর ভাব, অনুপম সৃষ্টিকৌশল কৃত্তিবাসের পর আজ পর্যন্ত যত ব্যক্তি বঙ্গবাণীর পাদপূজা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই পূজার উপকরণ ফুল, ফল, পল্লব কৃত্তিবাসের ঐ রামায়ণরূপী কল্পকানন হইতে চয়িত ও সংগৃহীত।"

তেমনি মাইকেল সম্বন্ধে লিখেছেন : 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের ন্যায় মহাকবির আবির্ভাবে বঙ্গদেশ চিরদিনের মত পূজনীয় হইয়া রহিয়াছে। লৌকিক ভাষায় অনুষ্টুপ্ ছন্দের প্রবর্তনের ন্যায় বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করিয়া মধুসূদন বাংলা কবিতার পথ অতি সুগম করিয়া গিয়াছেন। যতদিন বাংলা ভাষা ও বাঙালী জাতি থাকিবে, ততদিন তাঁহার অমিত্রাক্ষরের মধুর বীণাধ্বনি শ্রুত হইবে। মধুর সমস্ত কবিতাতেই একটা প্রাণের অস্তিত্ব দেখিতে পাই। দেখিতে পাই তাঁহার কবিতার সমস্তই প্রায় দেশীয় উপাদানে রচিত, তাহাতে বিদেশীয় মশলা নাই। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়াছিলেন, পাশ্চাত্য জগতের ভাল-মন্দ সমস্তই দেখিয়াছিলেন ও শিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতৃ-পিতামহের প্রাচ্যের প্রতিমা-স্থানে কদাচ পাশ্চাত্য প্রতিমা বসান নাই, জাতীয়তা বিসর্জন দেন নাই। পশ্চিম গগনের সুচারু সান্ধ্যরাগের আভায় তিনি তদীয় কবিতারাণীর ললাট মার্জনা করিয়া দিয়াছেন মাত্র, কিন্তু তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন প্রাচীর অরুণ রাগে। তাই তাঁহার কবিতার বিনাশ অসম্ভব। তাঁহার কবিতার হিরণ্ময় জ্যোতিতে বাংলা ভাষা চিরদিনের মত জ্যোতিষ্মতী হইয়া রহিয়াছে।···কল্পনা সহচরীর ন্যায় তাঁহার অনুবর্তন করিত। তাঁহার যে কোনও কবিতা যখনই পাঠ করি, দেখি তাহাতে তদীয় হৃদয়ের দৃঢ়তার একটা ছায়া যেন স্বতঃই লাগিয়া আছে। বঙ্গ-কাব্য-কাননে

তিনি দৃপ্ত সিংহের ন্যায়, মদগর্বিত নগেন্দ্রের ন্যায় বিচরণ করিয়া গিয়াছেন,—কোথাও কদাচ কোন কারণে তিনি স্খলিত হন নাই। তাঁহার সমস্তই কবিত্বময় ছিল। তিনি দেখিতেন কবিতা, শুনিতেন কবিতা, কহিতেন কবিতা। তাঁহার হৃদয় যথার্থই মধুময় ছিল। বঙ্গভাষাকে তিনি যে অনর্ঘ সম্পদে সাজাইয়া গিয়াছেন, যে 'কাঞ্চন কঞ্চুক বিভায়' বঙ্গভাষাকে উদ্ভাসিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার মহিমা কোনও দিন ক্ষুন্ন হইবে না। মধুসূদন আমাদের জাতীয় মহাকবি।"

এই প্রসঙ্গে আরো একটু বলার আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইকেলের কবি-প্রতিভা সম্পর্কে সর্বপ্রথম আলোচনার সূত্রপাত করেন আশুতোষ। যখন স্নাতকোত্তর বিভাগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, তখন এই বিভাগের অন্যতম অধ্যাপক হিসাবে আশুতোষ শশাঙ্ক-মোহন সেনকে নিযুক্ত করেছিলেন। ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। আশুতোষের দৃষ্টি তখন থেকেই এই মেধাবী যুবকটির উপর নিবদ্ধ ছিল। পরে পোস্ট-গ্রাজুয়েট শ্রেণীতে বাংলা বিভাগ খোলা হোলে তিনি শশাঙ্কমোহনকে চট্টগ্রাম থেকে কলিকাতায় নিয়ে আসেন এবং ওকালতি পরিত্যাগ করে অধ্যাপনায় ব্রতী হতে অনুরোধ করেন। শশাঙ্কমোহন একজন সুকবি ছিলেন; তাঁর কবি-প্রতিভার কথা আশুতোষের অজানা ছিল না। তিনিই একদিন কথ-প্রসঙ্গে শশাঙ্কমোহনকে বলেন, "আমার খুব ইচ্ছা, মাইকেল সম্পর্কে তুমি একটা ধারাবাহিক লেকচার দাও।" এই অনুরোধেরই পরিণতি ১৯২১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক শশাঙ্কমোহন প্রদত্ত 'গোপালদাস চৌধুরী বক্তৃতামালা'। এই বক্তৃতার বিষয় ছিল: "মধুসূদন: অন্তর্জীবন ও প্রতিভা।" মধুসূদন সম্বন্ধে এই আলোচনা সেদিন বহু বিদগ্ধজনের নিকট সমাদৃত হয়েছিল। অদ্যাবধি একমাত্র মোহিতলাল ভিন্ন আর কেহই শশাঙ্কমোহনের এই আলোচনাকে অতিক্রম করতে পারেন নি। আশুতোষকে যে বাঙালী জাতির সারস্বত যজ্ঞের সর্বপ্রধান ঋত্বিক বলা হয়েছে, সে গৌরব তাঁর সর্বাংশেই প্রাপ্য।

আশুতোষ যে তাঁর মাতৃভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়েছিলেন

এটা কোনো আকস্মিক ব্যাপার ছিল না। তিনি নিজের মুখেই বলেছেন :
"প্রথম যৌবনে যখন কলেজে অধ্যয়ন করিতাম, তারপর যখন ক্রমে কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম, আমার সতত ধ্যান ছিল যে, কি উপায়ে আমার বঙ্গভূমির, বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিব। মানুষের কত স্বপ্ন থাকে, আমার ঐ একই স্বপ্ন ছিল। একটা ধারণা আমার দৃঢ় ছিল যে, যে জাতির মাতৃভাষা যত সম্পন্ন, সে জাতি তত উন্নত। আমি মধ্যে মধ্যে ভাবিতাম, কবে এমন দিন আসিবে, যখন আমার শিক্ষিত দেশবাসিগণ আচারে-ব্যবহারে, কথায়-বার্তায়, চালে-চলনে প্রকৃত বাঙালীর মত হইবে। কবে দেখিব, দেশের যাঁহারা মুখপাত্র-স্বরূপ, সমাজের যাঁহারা নেতা, বঙ্গভাষা তাঁহাদের আরাধ্য দেবতা। কবে শুনিব, শিক্ষিত বাঙালী আর এখন বাংলা ভাষায় সর্বসমক্ষে কথা বলিতে বা প্রকাশ্য সভা-সমিতিতে বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করিতে সংকোচ বোধ করেন না বা বাঙালী নিজেকে বঙ্গভাষার সেবকরূপে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন না। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার আসন পড়িয়াছে। শ্বেতদ্বীপের মাতৃভাষার পার্শ্বে আমার বঙ্গের শ্বেত শতদলবাহিনীর সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে। বঙ্গের তথা বঙ্গভাষার ইহা পরম কল্যাণের কথা। বাঙালীর ইহা পরম মাহেন্দ্রক্ষণ।"

এইভাবেই আশুতোষের চিত্তে তাঁর স্বদেশ, তাঁর মাতৃভাষা স্থান পেয়েছিল। তাঁরই বিরাট কল্পনায় ভারতের বিভিন্ন জাতির মিলন-কেন্দ্র, মহামানবের মিলন-তীর্থ হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে গঠন করা প্রথম অনুভূত হয়েছিল। শিক্ষার স্বর্ণসূত্রে তিনি সমস্ত ভারতকে বাঁধতে চেয়েছিলেন। কতখানি ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তিনি এই গঠনকার্যে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন, আজ বোধ হয় আমরা তা বুঝতে পেরেছি। কালের পটে সমুজ্জ্বল আশুতোষের জীবনব্যাপী এই সাধনার দীপ্ত মহিমার আলোকে আমাদের জাতীয় ইতিহাস চিরদিনের মতো উদ্ভাসিত হয়েছে।

॥ নয় ॥

বাইরে থেকে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি মনে করতেন আশুতোষ ইংরেজ আমলাতন্ত্রের সহচর—তিনি গভর্নমেণ্টের লোক। এই ধারণাটা সেদিন অনেকের মনেই বদ্ধমূল ছিল। তিনি একাদিক্রমে আট বছর ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হয়েছিলেন বলেই কি লোকের মনে এই ধারণা হয়েছিল? কিন্তু এই ধারণা যে কতদূর ভ্রান্ত তার সাক্ষ্য দিয়েছেন বিপিনচন্দ্র পাল। তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্মের তদন্ত করবার জন্য একটা কমিশন বসেছিল। ইহাই স্যাডলার কমিশন। অধ্যাপক র‍্যামসে মিউর বিলাত থেকে এই কমিশনের অন্যতম সভ্য নিযুক্ত হয়ে এদেশে আসেন। আশুতোষও এই কমিশনের একজন সভ্য ছিলেন। বিপিনচন্দ্র তখন অমৃতবাজারে লেখেন। অধ্যাপক মিউর কি একটা কথা নিয়ে হাইকোর্টের বার লাইব্রেরীতে একদিন বক্তৃতা দিতে গিয়ে অমৃতবাজার পত্রিকার উপরে তীব্র আক্রমণ করেন। বিপিন-চন্দ্র 'পত্রিকায়' তার জবাব দেন এবং উক্ত অধ্যাপকের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হোতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই উপলক্ষে তিনি আশুতোষের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন। কার্যতঃ ঐ দিনই আশুতোষের সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের কাছাকাছি প্রথম দেখাশুনা হয়। এই ঘটনা ১৯১৭ সালের। পরবর্তী কাহিনী তিনি স্বয়ং এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন :

"ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম অনেক লোক সেখানে বসিয়া আছেন। আশুতোষ তখন বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের কি কাজে নিবিষ্ট ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে নামিয়া আসিয়া আমাকে দেখিতে পাইয়াই অতিপরিচিত আত্মীয়ের মতন অভ্যর্থনা করিলেন। বলিলেন, 'আপনি এমন সময় আসিলেন যে একটু বসিয়া খোশগল্প করিব সে অবসর নাই। একদিন সন্ধ্যার পরে আসিবেন, অনেক কথা হইবে।' আমি বিদায় লইয়া বাহিরে আসিবার সময় আমার সঙ্গে

আসিলেন। বারান্দায় আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া কহিলেন, 'বিপিনবাবু, ভাব্‌বেন না, ওরা আমাকে আপনার চাইতে বেশি বিশ্বাস করে। এই সেদিন আমি Mysore গিয়েছিলাম, সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম উপলক্ষে। আমার পিছনেও গোয়েন্দা গিয়েছিল। এ সম্মান যে কেবল আপনারই আছে, তা মনে করবেন না, আমিও এ ভাবে সম্মানিত হোয়ে থাকি।'*

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব সভায় আশুতোষ ভাষণ দেওয়ার জন্য নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তিনি বিপিনচন্দ্রকে ঐ দিন বলেছিলেন: "মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যেসব্‌ কথা বলেছি কর্তাদের তা ভালো লাগবে না, জানতাম। কিন্তু ব্রিটিশ ভারতে যে সকল কথা বলার সুযোগ এবং অধিকার নেই, ভারতের একটি সামন্ত রাজ্যে সে সব কথা বলতে পারা যায়। আমার Mysore addres টা পড়ে দেখবেন। সেখানে আমার মুখে মুখোশ ছিল না। প্রাণ খুলে সব কথা বলে এসেছি।" তাঁর এই প্রাণ খুলে কথা বলাটা আর কিছুই ছিল না—ছিল সরকারের শিক্ষানীতির একটি সুতীব্র সমালোচনা। শিক্ষা-সংস্কারক ও শিক্ষা-প্রবর্তক হিসাবে আশুতোষের কৃতিত্বের কাহিনী সুবিদিত—কিন্তু যেটা অন্তরালে রয়ে গেছে সেটা হোল সরকারী নীতির সঙ্গে তাঁর বিরোধিতার কাহিনী। আশুতোষের আমলেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালীর নিরঙ্কুশ আধিপত্য স্থাপিত হয়। বিদেশীর কর্তৃত্ব বা সরকারী কর্তৃত্ব দুটোর কোনোটাই তখন এর ওপর ছিল না, এ কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। সম্ভবত এই কারণেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তথা এর তদানীন্তন ভাইস-চ্যান্সেলার স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের দীর্ঘকাল ধরে বিবাদ চলেছে। আশুতোষের জীবনের সেই কাহিনী না জানলে তাঁর জীবনানুশীলন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাঁর চরিত্রকে বুঝবার পক্ষে এর বিশেষ প্রয়োজন আছে।

১৯১৪ সালে একাদিক্রমে আট বছর ভাইস-চ্যান্সেলারি করবার পর আশুতোষ অবসর নেওয়ার সময় তাঁর কনভোকেশন বক্তৃতায় গভর্নমেণ্টের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষের কথা সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছিলেন। এই ঝগড়া লর্ড লিটনের আমলে চরমে উঠেছিল। অতঃপর আমরা এই বিষয়টির যথাযথ আলোচনায়

* বঙ্গবাণী ১৩৩১

প্রবৃত্ত হব। আশুতোষ চরিত্রের যা কিছু নির্ভীকতা আর তেজস্বিতা তারই একটা বিস্ময়কর অভিব্যক্তি আছে এর মধ্যে। প্রচণ্ড পৌরুষ-সমন্বিত সেই ব্যক্তির বিক্রান্ত মূর্তি সেদিন সরকারী সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে যেভাবে উদ্ভাসিত হোয়ে উঠেছিল, তার তুলনা নেই। "গভর্নমেণ্ট কর্তৃত্ব করবে, অথচ অর্থ সাহায্য করবে না, আর আমি তা সহ্য করব—আশু মুখুজ্যে সে শর্মাই নয়।" এই একটিমাত্র উক্তির মধ্যে যে আশুতোষকে আমরা পাই তিনি আমলাতন্ত্রের সহচর ছিলেন, এ কথা কোনো মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি সরকারী সাহায্যের পরিমাণ পুরো দেড়লক্ষ টাকাও ছিল না। কলেজগুলির পরিদর্শকের বেতন এরই অন্তর্গত ছিল। "এই সামান্য টাকা সাহায্য করেই সরকারের এত আস্ফালন"—কথিত আছে, এইরকম একটা মন্তব্য এইসময়ে একদিনের সিনেটের সভায় করেছিলেন আশুতোষ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তখন তিন হাজার ছাত্রের শিক্ষার ভার বহন করে। অথচ সরকারী সাহায্য মাত্র এক লক্ষ টাকা। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল মাত্র এক হাজার ছাত্রের শিক্ষার ভার নিয়ে ১৯২১-২২ সালে সরকারী সাহায্য পেয়েছিল নয় লক্ষ টাকা। বৈষম্যমূলক এই ব্যবহারেই আশুতোষের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।

সরকারী নীতির সঙ্গে আশুতোষের সংঘর্ষের প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র লিখেছেন: "সিনেটের একশতজন সদস্যের মধ্যে আশীজনই গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত। ইহা ছাড়া পদাধিকারের বলে সদস্যগণের অনেকেই একরূপ গভর্নমেণ্টের তরফেরই লোক। এইরূপ অনুকূলভাবে গঠিত সিনেটের শিক্ষা-বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর তাঁহারা আবার কথা বলার অধিকার রাখিতে চান কেন,—ইহাই ছিল আশুতোষের প্রশ্ন। রাজপুরুষেরা তো শিক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহেন। এইরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষা সম্বন্ধে সিনেটের স্বাধীনতায় তাঁহাদের হস্তক্ষেপ আশুতোষ অন্যায় মনে করিতেন। দেশহিতের জন্য আশুবাবু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সংক্রান্ত সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাহিয়াছিলেন; পাঠ্য-নির্ধারণ, অধ্যাপক মনোনয়ন, শিক্ষার বিষয় স্থিরীকরণ প্রভৃতি খুটিনাটি বিষয়ে রাজপুরুষেরা কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন? শিক্ষা বিষয়ে গৃহীত সিনেটের সিদ্ধান্তকে তাঁহারা কেন ডিঙাইয়া যাইবেন? আসল কথাটা ছিল সাম্রাজ্য

রক্ষা। সুতরাং যখন আশুবাবু শুধু শিক্ষা-নীতি ও তাহার আদর্শ গঠনে ব্যস্ত, তখন কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রনীতির কথা ভুলিতে পারেন নাই। আশুবাবুর সহিত কর্তৃপক্ষের সংঘর্ষ এইখানে।"

এই সংঘর্ষের সূচনা ১৯১৩ সাল থেকেই। তিনজন অধ্যাপকের নিয়োগ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারত সরকারের মধ্যে একটি বিতর্ক দেখা দিল। এ. রসুল, আবদুল্লা সুরাবর্দি ও কে. পি জয়সোয়াল, এই তিনজনকে দু'বছরের জন্য লেকচারার নিযুক্ত করতে সিনেট সুপারিশ করলেন। ব্যারিস্টার রসুল সাহেব একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং একজন জাতীয়তাবাদী মুসলিম রাজনৈতিক নেতা হিসাবে খ্যাত ছিলেন। সুরাবর্দি সাহেবও সুপণ্ডিত ব্যক্তি এবং পরবর্তী কালে ইনি সরকার কর্তৃক 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। তিনিও সমকালীন রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। একজন বিশিষ্ট ভারত-তত্ত্ববিদ্ বা Indologist হিসাবে জয়সোয়ালের খ্যাতি তখন সর্বজন-বিদিত। তাঁর 'ঠাকুর বক্তৃতামালা' মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের উপর নূতন আলোক-সম্পাত করেছিল। নূতন আইনে সিনেট কর্তৃক অধ্যাপক বা লেকচারার নিয়োগের সুপারিশ বা সিদ্ধান্তকে 'On other than academic grounds' বাতিল করে দেওয়ার ক্ষমতা ভারত সরকারের ছিল। হেনরি শার্প তখন ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগের জয়েণ্ট-সেক্রেটারি। বঙ্গভঙ্গের সময়ে নব-গঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে তিনি কিছুকাল শিক্ষা-অধিকর্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সিনেটে তিনি তখন ভারত সরকারের প্রতিনিধিত্ব করতেন। উপরি-উক্ত ঐ তিনটি নিয়োগ তিনিই বাতিল করে দেন।

১৯১৩, ২০শে মে তারিখে রেজিস্ট্রারকে লেখা শার্পের একখানি পত্রের নিম্নলিখিত অংশটুকু উদ্ধৃতিযোগ্য ; "His Excellency does not consider it desirable to appoint as University Lecturers men who have recently taken a prominent part in political movements" সুরাবর্দি সাহেব ইতিপূর্বে লেকচারার নিযুক্ত হয়েছিলেন, সুতরাং তাঁর নিয়োগ সরকার শেষ পর্যন্ত অনুমোদন করলেন। রসুল সাহেব স-পারিষদ গভর্নর-জেনারেলের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করতে উদ্যত হলেন। রেজিস্ট্রার বৃথাই সরকারকে তাঁদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য চিঠি লিখলেন। সিণ্ডিকেটের

আবেদনও নিষ্ফল হয়। তখন সিনেটের একটি বিশেষ সভা আহ্বান করা হয়। এই সভার তারিখ ৫ই জুলাই, ১৯১৩। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ও রাসবিহারী ঘোষ সিনেটের এই সভায় এই মর্মে প্রস্তাব উত্থাপন করলেন— সরকার যেন তাঁদের সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনা করেন। অতঃপর সিনেট গভর্নর-জেনারেল ও চ্যান্সেলারের পুনর্বিবেচনার জন্য একটি স্বতন্ত্র স্মারকলিপি পাঠালেন। ২৩শে জুলাই হেনরি শার্প এক সুদীর্ঘ পত্রে বিশ্ববিদ্যালয়কে স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন যে, সরকার কর্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হয়েই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ঐ পত্রের শেষে একটি সাংঘাতিক রকমের মন্তব্য ছিল। সেটি এই: "The Government of India cannot ignore the mischief which has already been wrought among the pupils of certain schools and colleges in Bengal."

বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্ভাগ্যের সূচনা এইভাবেই হয়েছিল। ১৯১৪ সালের মার্চ মাসেই বুঝা গেল যে, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ভাইস-চ্যান্সেলারির মেয়াদ শেষ হয়ে এলো। এখানে উল্লেখ্য যে, এই মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার ঠিক চারদিন আগে তিনি স্বহস্তে বিজ্ঞান-কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। ২৮শে মার্চ, ১৯১৪। ভাইস-চ্যান্সেলাররূপে আশুতোষ তাঁর অষ্টম কনভোকেশন বক্তৃতা দিলেন। হার্ডিঞ্জ তখন বড়োলাট এবং চ্যান্সেলার। তিনি এই কনভোকেশনে উপস্থিত ছিলেন না, একটি বাণী প্রেরণ করেছিলেন। উক্ত বাণীতে বিদায়ী ভাইস-চ্যান্সেলারের একাদিক্রমে আট বছর কালব্যাপী কাজের প্রশংসা ছিল আর ছিল এই মন্তব্যটি: "He has made his University his own." ঐ বাণীতেই পরবর্তী ভাইস-চ্যান্সেলার কাকে করা হবে সে কথাও বলা হয়েছিল। আশুতোষের স্থলাভিষিক্ত হবেন স্যর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী; ইনি দীর্ঘকাল যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনিই প্রথম বেসরকারী (non-official) উপাচার্য। ইনি সিণ্ডিকেট ও সিনেটের সদস্য ছিলেন এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করতেন। ১৯১২ সালে লণ্ডনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির যে কংগ্রেস হয়, তাতে দেবপ্রসাদ ও প্রফুল্লচন্দ্র দুইজনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। অ্যাবার্ডিন

বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানিত 'ডক্টর অব ল' উপাধিতে ভূষিত করেন। সুতরাং আশুতোষের পরবর্তী ভাইস-চ্যান্সেলার হিসাবে তাঁর নিয়োগ সকলের দ্বারাই অভিনন্দিত হয়েছিল।

আশুতোষের অষ্টম কনভোকেশন বক্তৃতাটি যেমন সুদীর্ঘ তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। আমার বিবেচনায় এইটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ কনভোকেশন বক্তৃতা। যে আট বছরকাল তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল ধরেছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে তিনি সরকারের শিক্ষা নীতির কিম্বা সরকারী হস্তক্ষেপ সম্পর্কে কখনো তেমন বিরূপ সমালোচনা করেননি। এইবারই তিনি খোলাখুলিভাবে এবং একটু স্পষ্ট ভাষায় সরকারী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বললেন এবং সেইসঙ্গে তাঁর আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা আর এযাবৎকাল তাঁকে কী পরিমাণ বিরোধিতার ভিতর দিয়ে কাজ করতে হয়েছে সেই ইতিহাস পরিষ্কার ভাবেই তুলে ধরলেন। তিনি বলেছিলেন: "The last eight years, in truth, have been years of unremitent struggle; difficulties and obstacles kept springing up like the heads of the Hydra, each head armed with sharp and often venomous fangs." এর থেকে বুঝা যায় যে, তাঁর ভাইস-চ্যান্সেলারি জীবন নিষ্কণ্টক তো ছিলই না বরং তা ছিল সমস্যা-সঙ্কুল এবং প্রবল বাধাবিপত্তিতে পরিপূর্ণ। এই অবস্থার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে নূতন করে গড়ে তোলার কাজটা যে প্রকৃতপক্ষে সুকঠিন (আশুতোষের ভাষায় 'Herculean') ছিল তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার বড়ো কম হয়নি, কিন্তু পুরাণের আশুতোষের মতন বাংলার আশুতোষও সেই বিষ স্বীয় কণ্ঠে অবলীলাক্রমে ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর মহত্ব এইখানেই।

এতদিন যে গুরুভার দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নব জীবনের সঞ্চার করবার জন্য তিনি এতকাল যে রকম অতন্দ্রভাবে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন, আজ সেই দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার প্রাক্কালে ভারতের এই নব-নালন্দার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর মনে উদ্বেগ থাকা স্বাভাবিক। তাই তো এই স্মরণীয় বক্তৃতার উপসংহারে আশুতোষ তাঁর হৃদয়ের উৎকণ্ঠিত আবেগ অবারিত করে দিয়ে বললেন: 'যদিও অনেক কিছুই করা হয়েছে, তবু এখনো অনেক কিছু বাকী। কে জানে ভবিষ্যতে কী হবে? সময়ে

সময়ে আমি নিজেকে ক্ষেতের উদ্বিগ্ন চাষীর সঙ্গে তুলনা করি। চাষী প্রথমে নিজের হাতে তার ক্ষেতে লাঙল দিল; তারপর যখন মৃত্তিকার কঠিন স্তর ভেদ করে শ্যামল শস্যের উদ্গম হোল তখন তাই দেখে তার মনে কত আনন্দ। সেই নবোদ্ভিন্ন শস্যাঙ্কুর দেখে তার মনে পড়ে যায় এর পিছনে স্তরে স্তরে কী পরিমাণ শ্রম তাকে নিয়োগ করতে হয়েছে। শ্রমের এই নয়ন-মন তৃপ্তিকর প্রাথমিক ফল দেখে চাষীর শরীর মন আনন্দে ভরে উঠে, কিন্তু এই শ্যামল অঙ্কুর থেকে পীতবর্ণের পক্ব শস্যের উদ্গম না হওয়া পর্যন্ত তার উদ্বেগের শেষ হয় না। আবার মাঠের সেই হরিদ্বর্ণ শস্যের ঐশ্বর্য যতক্ষণ না তুলে এনে সে গোলায় তুলতে পারছে ততক্ষণ তার বিশ্রাম নেই, চিন্তার শেষ নেই। অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টিতে মাঠ ভরা সেই সোনার ফসল নষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। কীট পতঙ্গের উৎপাতে মাঠের পাকা ধান বিনষ্ট হোতে পারে। কৃষক তাই তার সাধ্যমত প্রযাস পায়, কিন্তু বীজ বপনের পর থেকে তাকে ক্রমাগত প্রার্থনা করতে হয় আর ভগবানের ওপর বিশ্বাস রাখতে হয়। আমি আজ মুক্তকণ্ঠেই বলছি, সময়ে সময়ে আমারও অনুভূতি মাঠের চাষীর অনুভূতির মতোই হয়ে থাকে। আমিও—আমরাও—আমি এবং আমার সহযোগীবৃন্দ—এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে ঘর্মাক্ত কলেবরে পরিশ্রম করেছি—কত শ্রমসঙ্কুল দিবস আর কত বিনিদ্র রজনী আমরা যাপন করেছি। গৌরবময় ফসলের জন্য আমরাও প্রত্যাশা করেছি—জাতির সর্বাঙ্গীন পরিপুষ্টি বিধানের জন্য যে ফসলের প্রয়োজন– তার আত্মা ও বুদ্ধিকে উদ্দীপ্ত করবার জন্য যে ফসলের প্রয়োজন। আমরা ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছি এবং আমাদের শ্রমের প্রথম ফল এখন সন্দর্শন করছি। কিন্তু সেই ফসল সুপরিপক্ক শস্যে পরিণত না হওয়ার পক্ষে অনেক কিছুই ঘটতে পারে। কী পরিমাণ বাধা আমাকে অতিক্রম করতে হয়েছে এবং যখন আমি কল্পনা করি যে ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়কে আরো কত বাধা অতিক্রম করতে হবে, তখন এইসব কথা স্মরণ করে আমি একথা বলতে বাধ্য যে, আমার হৃদয় স্বভাবতঃই গভীর উৎকণ্ঠায় ভারাক্রান্ত হোয়ে ওঠে। যে প্রবল বাধার সম্মুখীন আমাদের হোতে হয়েছে, তা আজো আমরা চূর্ণ করতে পারিনি। কিন্তু সেইসব বাধাবিপত্তি যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ দিয়ে আসে তখনই তা সমূহ বিপজ্জনক হোয়ে ওঠে যেখান থেকে

ন্যায়সঙ্গতভাবেই আমরা সহানুভূতি প্রত্যাশা করেছি, সেইখান থেকেই আমরা পেয়েছি প্রবল আঘাত। বিশ্বাস স্থাপন করে আমরা নিরাশ হয়েছি। কিন্তু এই বাধা ও সহানুভূতির অভাবের চেয়েও সরকারী মনোভাবের মধ্যে ধৈর্যের অভাব দেখে আমরা আরো বেশি পরিমাণে উদ্বিগ্ন হয়েছি।”

সর্বশেষে আশুতোষ বললেন. “I dread that pusillanimity which shrinks at the first rough collision with determined hostility, that cowardly spirit of compromise which so often induces the weak man to accept a fraction of the reward for which he has hitherto contended, while one resolute, step in advance, one bold thrust of the arm, might have secured for him the whole glorious prize. All these dangers I vividly realise, and hence my feelings are sometimes not unlike those of the husbandman when he sees dark clouds massing on the horizon and hears the muffled sound of distant thunder. To me also, nothing is left but to hope, to pray, to trust.”

কিন্তু কেবলমাত্র নৈরাশ্যের বাণীই তাঁর কণ্ঠে সেদিন ধ্বনিত হয়নি। চির আশাবাদী আশুতোষ তাই এই বলে তাঁর ভাষণ শেষ করলেন: ‘But far be it from me to close this address of mine on a note of fear and despondency. The spectres of doubt and apprehension which at times crowd round the bravest, even vanish into nothingness when faced with resolution. When all is said and done, there is alive in the depths of my soul the unshakable conviction that I and my helpers have, during these last years, fought a gcod fight; that the light, which has kept beckoning us onward on our rough and dark path was not the fitful gleam of a willo-o-the-wisp, but the steady radiance of a pure and holy flame forever burning

in a glorious temple however far remote—a shrine dedicated to the worship of Truth and Ideal... I thus bid farewel to office and fellow workers, not without anxiety for the future of my University, but yet with a great measure of inward contentment: and—let this be my last word—from the depths of my soul there rises a fervent prayer for the perennial welfare of our *Alma Mater*—for whom it was given to me to do much work and suffer to some extent—and of that greater parental divinity to whom even our great University is a mere hand-maiden as it were—my beloved Motherland.'

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হোল, কিন্তু আশুতোষের চরিত্রের নিগূঢ় মহিমা এবং তাঁর কর্মপ্রতিভার উত্তুঙ্গতাকে উপলব্ধি করবার পক্ষে তাঁর এই ভাষণের উপস হারটুকু বিশেষভাবেই অনুধাবনীয়। লক্ষ্য করবার বিষয়, আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়কে আমার বিশ্ববিদ্যালয়' বলে দাবী করলেন আর সেই সঙ্গে তাঁর প্রিয় জন্মভূমির কথাও বিস্মৃত হোলেন না। ইহা যদি স্বার্থলেশশূন্য দেশপ্রেম না হয়, তবে দেশপ্রেম আর কাকে বলব? তাঁর এই কনভোকেশন বক্তৃতার সমালোচনা প্রসঙ্গে সেদিন 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় এই মর্মে মন্তব্য করা হয়েছিল: "We do not remember to have ever read such a lofty convocation speech from the Vice-Chancellor of any University in India or elsewhere. It throws a flood of light into the inner recesses of Sir Asutosh's unique character and genius." শ্বেতাঙ্গ-সমাজ পরিচালিত একটি পত্রিকায় এ ধরণের মন্তব্য সেদিন সত্যই অপ্রত্যাশিত ছিল। ইংরেজীভাষার উপর তাঁর কী অসাধারণ দখল ছিল, হৃদ্‌গত ভাব প্রকাশের কী অপূর্ব ক্ষমতা ছিল, তার অভ্রান্ত স্বাক্ষর আছে আশুতোষের এই বক্তৃতাটির শেষভাগে। কল্পনা, অনুভূতি, আবেগ এবং শাণিত যুক্তিতে উদ্দীপ্ত এই ভাষণটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে যেমন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, তেমনি দেশের ইতিহাসের অলিন্দেও যুগ যুগ

ধরে প্রতিধ্বনিত হবে বাণীর মন্দিরে একজন একনিষ্ঠ এবং আত্মনিবেদিত পূজারীর হৃদয়ের আকূতি—যে আকূতি শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদীমূলে নয়, তাঁর দেশমাতৃকার বেদীমূলেও চরিতার্থতা লাভ করেছিল।

এইভাবে উপর্যুপরি চারবার ভাইস-চ্যান্সেলার হওয়ার পর আশুতোষ অবসর গ্রহণ করলেন। তাঁর আগে একমাত্র বেলি সাহেব (F. C. Bayley) একাদিক্রমে ছ'বছর (১৮৬৯—১৮৭৫) এইপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আশুতোষ যখন অবসর গ্রহণ করেন তখন তিনি ভাবতে পারেন নি যে আট বছর পরে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের দিনে আবার তাঁকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল ধরতে হবে। ১৯১৪ সালে তাঁর ফেলোশিপ উত্তীর্ণ হয়। প্রায় পঁচিশ বছর কাল যাবৎ তিনি সিনেটের একজন মনোনীত সদস্য ছিলেন। ১৯১৪ সালে তিনি সর্বপ্রথম রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটদের নির্বাচকমণ্ডলী থেকে সিনেটের অন্যতম সদস্যরূপে নির্বাচিত হলেন। তাঁর অবসর গ্রহণ উপলক্ষে স্নাতক ছাত্রবৃন্দের পক্ষ থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষের একখানি পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র উপহার-স্বরূপ প্রদত্ত হয় আর বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক এবং ইউনিভার্সিটি 'ল' কলেজের ছাত্রবৃন্দ সম্মিলিতভাবে আশুতোষের একটি আবক্ষ মর্মরমূর্তি প্রদান করেন। তৎকালীন ছোটোলাট লর্ড কারমাইকেল এই মর্মরমূর্তিটি উন্মোচন করেছিলেন। দ্বারভাঙ্গা-সৌধের সুপ্রশস্ত সোপানাবলির শীর্ষদেশে এই মর্মরমূর্তিটি আজো বিদ্যমান। মনে হয়, এইখানে দাঁড়িয়ে জ্ঞানপথের সেই অতন্দ্র পথিক যেন সবকালের জন্য বিশ্বের জ্ঞান-পথিকদের এইখানে নীরবে আহ্বান করছেন।

স্যর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন। স্মারকগ্রন্থে এই সময়টাকে "The most critical years of the Post-graduate Department of the University, the University itself, the country and the world at large." এই বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই সংকটের কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ১৯১৭ সালটা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ভীষণ অর্থসংকটের সময়। "The year 1917 opened with a bleak outlook."— স্মারকগ্রন্থে বলা হয়েছে এই কথা। ঐ বছরই ভারত সরকার সিনেটের সঙ্গে বিনা পরামর্শেই স্নাতকোত্তর বিভাগটির

কার্যাবলী তদন্ত করবার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করেন। আশুতোষ ছিলেন এই কমিটির চেয়ারম্যান আর সদস্যদের মধ্যে ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সি জে হ্যামিলটন, শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যক্ষ জি. হাওয়েলস, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ ডাব্লিউ সি ওয়ার্ডসওয়র্থ এবং বাংলার শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা হর্নেল সাহেব (W. W. Hornell)। মার্চ মাসের গোড়ায় এই কমিটি একটি সর্ববাদীসম্মত রিপোর্ট দাখিল করেন। ইহাই কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'Post-graduate Enquiry Committee' এবং এই কমিটি-প্রদত্ত রিপোর্ট নূতন আইন অনুসারে সংগঠিত ও নববিধি অনুসারে পরিচালিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে সেদিন বিবেচিত হয়েছিল। মার্চ ও এপ্রিল মাসে সিনেটের পরপর চারিটি সভায় (১৭ই মার্চ, ৩১শে মার্চ, ১৪ই এপ্রিল ও ১৬ই এপ্রিল) এই রিপোর্টের আলোচনা প্রসঙ্গে যে তুমুল বিতর্ক দেখা দিয়েছিল অনুসন্ধিৎসু পাঠক স্মারকগ্রন্থে তার বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করতে পারেন। সেদিনও আশুতোষকে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হোতে হয়েছিল। সিনেটের ১৬ই এপ্রিলের সভায় বিষয়টি চূড়ান্তভাবে আলোচিত হয় এবং কমিটির রিপোর্ট কিছুটা সংশোধিত আকারে গৃহীত হয়। এই প্রসঙ্গে স্মারকগ্রন্থে বলা হয়েছে: "So ended the Herculean struggle for the establishment of a centralised Post-graduate system of teaching, study and research in Calcutta." অতঃপর সমস্ত কলেজ থেকে এম. এ র পঠন-পাঠন উঠে যায় এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় প্রবর্তিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এই সময়কার একদিনের বৈঠকে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ আর্চবোল্ড সাহেব (W. A. J. Archbold) তাঁর বক্তৃতায় "The University is a sick man of India"—এই শ্লেষাত্মক মন্তব্যটি করেছিলেন। ঐ সভাতেই এর সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন দর্শনের অধ্যাপক হীরালাল হালদার।

১৯১৭, ৬ই জানুয়ারি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে চ্যান্সেলাররূপে বক্তৃতা দিলেন লর্ড চেমসফোর্ড। তিনি তাঁর বক্তৃতায় যখন ঘোষণা করলেন যে, ভারত সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যাবলী তদন্তের জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করতে মনস্থ করেছেন, তখন অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন—কেননা, এ ঘোষণা ছিল যেমন আকস্মিক তেমনি অপ্রত্যাশিত। ১৪ই সেপ্টেম্বর কমিশনের নিয়োগ ঘোষিত হোল। লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডক্টর এম ই স্যাডলার, ডক্টর জে. ডাব্লিউ গ্রেগরি, পি জে হার্টগ, অধ্যাপক র‍্যামসে মিউর, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডাব্লিউ ডাব্লিউ হর্নেল, ডক্টর জিয়াউদ্দীন আহম্মদ এবং জি অ্যাণ্ডার্সন—এই আটজনকে নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়েছিল। স্যাডলার সাহেব ছিলেন এর চেয়ারম্যান; সেইজন্য ইহা 'স্যাডলার কমিশন' এই নামে অভিহিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ কমিশন। এই শতাব্দীতে ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষার ইতিহাসেও এই কমিশন সেদিন কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, কারণ কমিশনের সদস্যগণ সাক্ষ্য সংগ্রহের জন্য প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন। তদন্তের পর ১৯১৯, মার্চ মাসে কমিশন ভারত সরকারের নিকট যে রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন, আজ পর্যন্ত কোনো কমিশন এমন বিপুলায়তন রিপোর্ট দাখিল করেছেন কিনা সন্দেহ। রিপোর্টটি পাঁচখণ্ডে সম্পূর্ণ ছিল এবং এর উপসংহার ভাগ আটখণ্ডে রচিত হয়। এই সম্পর্কে স্মারকগ্রন্থে মন্তব্য করা হয়েছে: "No report of any educational commission attracted so much attention, or was written with such clearness of vision and of expression." রিপোর্টখানি যাঁরাই একবার পাঠ করেছেন তাঁরাই এই মন্তব্যের যাথার্থ্য স্বীকার করবেন। তবে এই রিপোর্ট সর্ববাদীসম্মত হোতে পারেনি। রিপোর্টের মূল সুপারিশ সম্পর্কে একমত হলেও কয়েকটি বিষয়ে জিয়াউদ্দীন আমেদ ও ডক্টর গ্রেগরি—এই দুজন সদস্য ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। স্যাডলার কমিশনের রিপোর্টের আনুপূর্বিক আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নেই; সংক্ষেপে কিছু বললেই যথেষ্ট হবে।

দীনেশচন্দ্র লিখেছেন: "সকলেই জানেন, স্যাডলার সাহেব যে কমিশনের নেতা ছিলেন এবং যাহা তাঁহারই নামাঙ্কিত ছিল, তাহা আশুবাবুর দ্বারাই

প্রকৃতপক্ষে নিয়ন্ত্রিত। স্যাডলার গুণগ্রাহী ছিলেন,—তিনি আশুবাবুর প্রকৃত বন্ধুত্বাভিমানী ও তৎপ্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।" এই রিপোর্টে বহু বিষয় আলোচিত হয় এবং সমগ্রভাবে শিক্ষার বিষয়টি আলোচিত হয়। রিপোর্টের একস্থলে বলা হয়েছিল. "No satisfactory re-organisation of the University system of Bengal will be possible unless and until a radical re-organisation of the system of Secondary Education upon which University work depends, is carried into effect. A radical reform is necessary not only for University reform but also for national progress in Bengal.' এর মধ্যে 'National Progress' কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। ১৯০৪ সালে নূতন আইন প্রবর্তিত হওয়ার একযুগ পরে আমূল সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিল এবং সেই সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও অনুরূপ প্রয়োজন দেখা দিল।

স্যাডলার কমিশনের রিপোর্টে যে সব সুপারিশ করা হয়, তার প্রত্যেকটিই উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংগঠনিক ব্যাপারে ধীরে ধীরে প্রয়োজনীয় হোয়ে উঠেছিল। অতঃপর যে কয়টি পরিবর্তন এলো তার মধ্যে লক্ষণীয় ছিল প্রধানত এই কয়টি: ১. ভারত সরকারের এক্তিয়ার থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বাংলা সরকারের এক্তিয়ারের অধীনে নিয়ে আসা ২. বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্তিয়ার থেকে ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসগুলি সরিয়ে নেওয়া ও এগুলি প্রস্তাবিত ইণ্টারমিডিয়েট কলেজগুলির এক্তিয়ারের মধ্যে নিয়ে আসা; ৩. মাধ্যমিক ও ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য বোর্ড গঠন; ৪. ঢাকাতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় (Teaching Universty) স্থাপন করা; ৫. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি পুরোদস্তুর teaching University রূপে পুনর্গঠন করা; ৬. মফঃস্বলস্থ কলেজগুলির পরিচালনের জন্য একটি স্পেশাল বোর্ড গঠন করা; ৭ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত শাসনতন্ত্রের স্থলে নূতন শাসনতন্ত্র রচনা করা; একটি প্রতিনিধিমূলক পরিষদ, একটি কার্যনির্বাহক পরিষদ, একটি অ্যাকাডেমিক পরিষদ এবং একজন বেতনভোগী ভাইস-চ্যান্সেলার—এই বিষয়গুলি প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের

অন্তর্গত থাকবে; ৮. আরো অধিক-সংখ্যক সুশিক্ষিত (trained) স্কুল শিক্ষকের ব্যবস্থা করা এবং ৯. ছাত্র-জীবনের মান উন্নয়ন করা। নিঃসন্দেহে এই সুপারিশগুলি শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি নূতন পরিবর্তনের সূচনা করল।

এই প্রসঙ্গে একজনের নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। তিনি স্যাডলার কমিশনের অন্যতম সদস্য এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ্ স্যর ফিলিপ হার্টগ। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর প্রগাঢ় চিন্তা-ভাবনা আশুতোষকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। বস্তুতঃ এই কমিশনে একত্র কাজ করার সুযোগ পেয়ে উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। উভয়েই সমবয়সী ও সমমর্মী ছিলেন। এই হার্টগ-ই পরবর্তীকালে নব-সৃষ্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলার হিসাবে তাঁর অপূর্ব সাংগঠনিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। ভারতের অতীত ও বর্তমান সময়ের শিক্ষার ধারা সম্পর্কে তাঁর *Some Aspects of Indian Education, Past and Present* শিক্ষা-সংস্কারের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ। হার্টগ আশুতোষের গুণমুগ্ধ ছিলেন। স্যাডলার কমিশনে তাঁর সঙ্গে একত্রে কাজ করার সময় আশুতোষের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটলেও, পরবর্তীকালে তিনি লিখতে পেরেছিলেন: "His mind was open to all ideas from whatever source they came...for him thought meant not only contemplation but action." বস্তুতঃ আশুতোষ-চরিত্রের এই একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য ছিল যে, কোনো বিষয়েই তিনি 'dogmatic' ছিলেন না; যদি কেউ তাঁকে যুক্তি দ্বারা কোনো বিষয় সম্পর্কে বোঝাতে পারতেন, আশুতোষ তখনি মত পরিবর্তনে কিম্বা প্রতিপক্ষের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে দ্বিধা করতেন না।

কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার প্রায় দু'বছর আগে বিশ্বযুদ্ধ যখন শেষ হয় হয়, ঠিক সেই সময়ে (২০ আগস্ট, ১৯১৭) ভারত-সচিব মণ্টেগু ভারতবর্ষের জন্য নূতন শাসন-সংস্কার ঘোষণা করলেন। পর্যায়ক্রমে ভারতবাসীকে দায়িত্বজনক শাসনভার (Responsible Government) দেওয়াই ছিল ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের নীতি। নূতন সংস্কার প্রবর্তন করার পূর্বে মণ্টেগু স্বয়ং

কিছুদিনের জন্যে ভারতবর্ষে এলেন। ভারতবাসীর মনোভাব পর্যবেক্ষণ করাই ছিল তাঁর এই আগমনের উদ্দেশ্য। তাঁর এই ভারত-সফরে তাঁর প্রধান সঙ্গী ছিলেন ভারতের তদানীন্তন গভর্নর-জেনারেল চেমসফোর্ড। পরে এঁরা দুজনে মিলে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে যে সংযুক্ত রিপোর্ট দাখিল করেন তারই ভিত্তিতে রচিত নূতন ভারত-শাসন-আইন (The Government of India Act of 1919) প্রবর্তিত হয়। এলো দ্বৈত-শাসনের যুগ। হস্তান্তরিত বিষয়গুলির মধ্যে শিক্ষা ছিল একটি। বিশ্ববিদ্যালয় চলে গেল দেশীয় মন্ত্রীর অধীনে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর স-পারিষদ গভর্নর-জেনারেলের কর্তৃত্বের অবসান হোল, অতঃপর গভর্নর-জেনারেল আর চ্যান্সেলার রইলেন না। এখন থেকেই প্রাদেশিক গভর্নরের চ্যান্সেলার হওয়ার নিয়ম প্রবর্তিত হয়।

এই পরিবর্তিত পটভূমিকায় ১৯২০ সালের ১১ই জানুয়ারি তারিখে বাংলা সরকারের প্রাইভেট সেক্রেটারি বিশ্ববিদ্যালয়কে এই মর্মে একখানি পত্র লিখলেন যে, ভারত সরকারের নির্দেশক্রমেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠনের জন্য একটি বিল প্রবর্তন করতে বাংলা সরকার মনস্থ করেছেন। সিণ্ডিকেট সেই পত্র সিনেটের বিবেচনার জন্য উত্থাপন করতে মনস্থ করলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁরা ভারত সরকারের নিকট এই মর্মে একখানি পত্র লিখলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক বিষয়টি সম্পর্কে অবিলম্বে তদন্ত হওয়া উচিত। ঠিক এই সময়েই ভারতবর্ষের রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব ঘটে। নূতন শাসন-সংস্কারে ভারতবাসীর মনে জাগে অসন্তোষ—অসন্তোষ থেকে বিক্ষোভ এবং পরিশেষে বিক্ষোভ থেকে শুরু হয় আইন-অমান্য আন্দোলন। গান্ধী ছিলেন এই আন্দোলনের নেতা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামে ছাত্রদের যোগদান করার জন্য আহ্বান জানালেন তিনি। স্কুল-কলেজ বর্জন আইন-অমান্য-আন্দোলনের কর্মসূচীর অন্তর্গত ছিল। ইতিমধ্যে ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিনা পরামর্শক্রমেই স্থাপিত হয়েছে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়। এর ফলে সাতটি কলেজ ও বিহার-উড়িষ্যার অন্তর্গত স্কুলগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তচ্যুত হয়। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার চার বছর পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন, নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন—একটির পর একটি, এইসব

ঘটনার ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয় এবং এক অকল্পিত সংকটের ভেতর দিয়ে একে চলতে হয়।

১৯১৮ সালে দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর স্থলে নিযুক্ত হোলেন নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার ল্যান্সলট স্যাণ্ডার্সন। ইনি তখন কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। বিদায়ী ভাইস-চ্যান্সেলার তাঁর বিদায়-সম্বর্ধনা সভায় বলেছিলেন: "I have piloted the University through the stress and storm of a world revolution...We have strenuous time ahead, but if we keep shoulder to shoulder, no harm shall come to us....But earnest and selfless work will be needed." ল্যান্সলটের পর এলেন স্বনামধন্য চিকিৎসক নীলরতন সরকার—ইনি ১৯১৯ থেকে ১৯২১ এই দু'বছরে দুবারের জন্য ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হয়েছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই সময়কার প্রসিদ্ধ ঘটনা—দানবীর রাসবিহারী ঘোষের দ্বিতীয় দফায় দান। এবার দানের পরিমাণ ছিল প্রায় সাড়ে এগার লক্ষ টাকা। ১৯২০, ৩রা জানুয়ারি সিনেটের এক সভায় ধন্যবাদ সহকারে রাজন্যোচিত এই দান, দাতার ১৯১৩ সালের মূল শর্তানুযায়ী গৃহীত হয়। এই দানগ্রহণ-সূচক প্রস্তাবটি সেদিন উত্থাপন করেছিলেন আশুতোষ স্বয়ং। সেদিন তিনি তাঁর বক্তৃতায় তাঁর পূজনীয় শিক্ষক স্যর রাসবিহারী ঘোষকে "The foremost benefactor of our University" বলে উল্লেখ করেছিলেন। আশুতোষের অভিপ্সীত 'য়ুনিভার্সিটি কলেজ অব সায়ান্স অ্যাণ্ড টেকনোলজি' প্রতিষ্ঠা করার পথ সেদিন এই দানের ফলেই সুগম হয়েছিল। রাসবিহারী ঘোষের এইবারকার দানের দ্বারা ফলিত রসায়ন ও ফলিত পদার্থ-বিদ্যার জন্য দুইটি নূতন অধ্যাপকের পদ সৃষ্ট হয় এবং এই দুইটি পদ লাভের প্রথম সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল তাঁরা হলেন যথাক্রমে হেমেন্দ্রকুমার সেন ও ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ। এই বছরের মে মাসে রাসবিহারী ঘোষ তাঁর 'উইল' মারফৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে Travelling Fellowship স্থাপনের উদ্দেশ্যে আরো আড়াই লক্ষ টাকা দান করেন। বস্তুতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ পর্যন্ত যত মহৎপ্রাণ দাতা অর্থসাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে রাসবিহারী ঘোষের দানের পরিমাণই সবেচেয়ে বেশি। দাতারা মুক্তহস্তে করেছেন

অর্থদান আর সেই অর্থের সাহায্যে আশুতোষ করেছেন শিক্ষাদান। ইংরেজ শাসক কর্তৃত্ব করেছেন, কিন্তু অর্থসাহায্য দানে তাঁরা সেদিন যে বদ্ধমুষ্টি-নীতির অনুসরণ করেছিলেন, আশুতোষ বার বার তার কঠিন সমালোচনা করেছেন। একমাত্র পালিত সাহেব ও ঘোষ সাহেবের দানের কথা বিবেচনা করলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বাঙালীর বিশ্ববিদ্যালয় বলতে বাধা কোথায়? আশুতোষের কৃতিত্ব এই যে, সরকারী কর্তৃত্বের কাঠামোর মধ্যে থেকেও তিনি স্বজাতির দানের সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে তাঁর অভিপ্রেত রূপ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

॥ দশ ॥

মহৎকার্যে মহৎ ত্যাগ চাই। বড়ো জিনিস পেতে হোলে খুব বড়ো রকমের ত্যাগ আবশ্যক। প্রাণ অকৃপণভাবে ঢেলে দিতে না পারলে সিদ্ধিলাভ সুদূর পরাহত। আশুতোষের জীবনে ইহা একটি পরীক্ষিত সত্য। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে তিনি একটি জ্ঞানের তীর্থে পরিণত করেছিলেন আর তাঁর এই মহাতীর্থে সমস্ত জগৎকে তিনি নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেই ১৯০৬ সাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠনে তাঁর বিরাট উদ্যমের ইতিহাস আজো সম্পূর্ণ অনুশীলনের অপেক্ষায় রয়েছে। দীনেশচন্দ্র সত্যই বলেছেন: "আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে শুধু প্রাদেশিক একটা পাঠশালার মতো গড়িতে চাহেন নাই; রাজাধিরাজ হইতে কুটীরবাসী পর্যন্ত সকলে এখান হইতে সসম্মানে ভারতীর প্রসাদ গ্রহণ করিয়া ধন্য হইবেন,—এই গৌরব তিনি ইহাকে দিতে প্রয়াসী ছিলেন। ভারতীর প্রসাদের এই পরিবেশনের অংশ পাইবার জন্য জগতের সমস্ত দিক হইতে হস্ত প্রসারিত হইয়াছিল। তিনি তপস্বীর মতো সাধনা করিয়াছেন, সম্রাটের ন্যায় ব্যয় করিয়াছেন এবং আদেশ করিয়াছেন, মজুরের ন্যায় দিবারাত্রি খাটিয়াছেন। তিনি দৃঢ় বিশ্বাস ও আন্তরিকতার সহিত কার্যক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন।"

গভর্নমেণ্টের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ অনিবার্য ছিল, কারণ তিনি ছিলেন দুর্নিবার, স্বাধীনচেতা মানুষ। সেই সমুন্নত মস্তক কারো কাছে নত হয় নি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করেছিলেন, সেইজন্যই কর্তৃপক্ষ কোনোদিনই আশুতোষকে খুব সুনজরে দেখেন নি, অথচ তাঁকে নইলে বিশ্ব-বিদ্যালয় একরকম অচল। ১৯১৪ সালে ভাইস-চ্যান্সেলারের পদ থেকে অবসর নেওয়ার পর দেখা গেল, "আশুবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার না হইয়াও কর্ণধারই রহিলেন; প্রতি ক্ষুদ্র বৃহৎ কর্ম তাঁহারই ছাপমারা, তাঁহারই ইঙ্গিতে নিয়ন্ত্রিত।

স্থতরাং কর্তৃপক্ষ বুঝিলেন, আশুবাবু যাহা বুঝিবেন তাহাই হইবে, অপরের কোনো নির্দেশ-পালনের জন্য সেই বিশাল শিক্ষা-শালায় তিলমাত্র অবকাশ নাই।" স্থতরাং এ কথা মিথ্যা নয় যে, গভর্নমেণ্ট চেষ্টা করেও আশুতোষকে তাঁদের অনুগত নিজস্ব ব্যক্তি করে গড়তে পারেন নি। সেইজন্যই তাঁকে সরকারী বিরোধিতার ভেতর দিয়ে চলতে হয়েছিল সেদিন। এই বিরোধিতা তাঁর জীবনের শেষপর্বে কী তীব্র হয়ে উঠেছিল, বর্তমান অধ্যায়ে আমরা সেই ইতিহাস আলোচনা করব।

পর-পর কয়েকজন ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত করে কর্তৃপক্ষ দেখলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল প্রকৃতপক্ষে একজনই ধরতে জানেন এবং ধরতে পারেন। তিনি আশুতোষ। তিনি যা করবেন, তা-ই হবে। এমন কি স্যাণ্ডার্সন যখন ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন, তখন অনেকেই ভেবেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষের প্রাধান্য এইবার কিছুটা খর্ব হবে। (এইরূপ ধারণার হেতু স্যাণ্ডার্সন ছিলেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আর আশুতোষ ছিলেন অন্যতম বিচারপতি।) "কিন্তু সিনেটের সেই সময়ের দুই-এক অধিবেশনের পরেই তিনি আশুতোষের এরূপ দুর্দান্ত মূর্তি দেখিতে পাইলেন যে, তিনি একান্তরূপে ভড়কাইয়া গেলেন। সেই হইতে আশুবাবুই যে কর্ণধার, সেই কর্ণধারই রহিলেন।" তাই ১৯২১ সালে আবার তাঁর ডাক পড়ল। দেশে তখন পূর্ণোদ্যমে চলেছে অসহযোগ-আন্দোলন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বিশ্ব-বিদ্যালয়কে 'গোলামখানা' আখ্যা দিয়েছেন; কংগ্রেস থেকে স্কুল-কলেজ বর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই বিপর্যয়ের বন্যা প্রতিরোধ করতে আশুতোষের প্রয়োজন হোল। ছোটোলাট রোনাল্ডসে বড়োলাট চেমসফোর্ডের অনুমোদন ক্রমে আশুতোষকে ভাইস-চ্যান্সেলারের পদ পুনরায় গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করলেন। সেদিন ঐ পদ গ্রহণের প্রাক্কালে তিনি এই চমৎকার উক্তিটি করেছিলেন: "The greater the peril of the task, the greater attractive is the performance of the duty." দেশে তখন নূতন শাসনসংস্কার প্রবর্তিত হয়েছে। কলিকাতার খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন। মন্ত্রী হিসাবে তিনি আশুতোষের নিয়োগ সম্পূর্ণ ভাবে অনুমোদন করলেন। সেই সংকটের দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের

হাল ধরার জন্য কেন আশুতোষের ডাক পড়েছিল তার একটা ইঙ্গিত আছে রোনাল্ডসের বক্তৃতায়।

১৯২১ সালের ২৪শে মার্চ তাঁর কনভোকেশন বক্তৃতায় আশুতোষ সম্পর্কে লর্ড রোনাল্ডসে এই উক্তি করেছিলেন: "No man surely is better qualified so to mould the future of your University as to make of it a national University in the best and truest meaning of the word." আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সত্যিই একটি জাতীয় বিদ্যালয় হিসাবেই গড়ে তুলেছিলেন: তাঁর একাধিক কনভোকেশন বক্তৃতায় তিনি তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। এবং এই কাজটা করতে গিয়ে একদিকে সরকারের সঙ্গে যেমন তাঁর সংঘর্ষ বেধেছিল, অন্যদিকে তেমনি তাঁকে স্বজাতির সমালোচনার সম্মুখীন হোতে হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে একটা প্রবল অভিযোগ এই ছিল যে, পোস্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের জন্য তিনি যথেচ্ছা অর্থব্যয় করতেন এবং বহু বেতনে অধ্যাপক প্রভৃতি নিয়োগ করতেন। আমরা কিন্তু ইহার বিপরীত অভিমত পোষণ করি। আশুতোষ কখনো ভাবের দ্বারা চালিত হোয়ে কিছু করতেন না। তাঁর সুচিন্তিত কর্ম-ধারা বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

আগেই বলেছি, চরম সঙ্কটের দিনে আশুতোষকে পুনরায় ভাইস-চ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত করা হয়। তখন চূড়ান্ত অর্থকৃচ্ছ্রতার ভেতর দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চলছে—অবস্থা ক্রমেই যেন অচল হবার উপক্রম। পোস্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের শিক্ষকদের বেতন বাকী পড়েছে। ব্যবস্থা-পরিষদে বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। স্যাডলার কমিশনের সুপারিশগুলি কার্যে পরিণত করতে হোলে প্রচুর টাকার দরকার। সিনেট বাংলা সরকারকে এককালীন দশ লক্ষ টাকা এবং অধ্যাপকদের বেতন বাবদ এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। সে অনুরোধের বিশেষ কোনো ফল হোলো না। সরকার দিলেন মাত্র দেড় লক্ষ টাকা এই পরিবেশের মধ্যেই আমরা আশুতোষকে শেষবারের মতন ভাইস-চ্যান্সেলারের পদে কিছুকালের জন্য অধিষ্ঠিত দেখতে পাই। এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র লিখেছেন: "এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অবস্থা তাহা বলিবার নহে। অধ্যাপকদের

বহু মাসের বেতন বাকি ; প্রত্যহ এই দুরবস্থাপন্ন অধ্যাপকের দল ভিড় করিয়া আশুতোষের নিকট স্ব স্ব মনোব্যথা প্রকাশ করিতেন। তিনি যেভাবে এই বিপদের দিনে অটল পণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহাতে এই মহাপুরুষের অলোকসামান্য দৃঢ়তা আমাদের চক্ষে দীপ্যমান হইয়াছিল।" কিন্তু ইহাই একমাত্র সঙ্কট ছিল না। আশুতোষের অনুরক্ত দলের মধ্যেও এই সময়ে ভাঙন লেগেছিল। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং নব গঠিত এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সরকারের 'সুয়োরানী নীতি' আশুতোষকে বিচলিত করলো। লক্ষ্ণৌ, কাশী প্রভৃতি স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও জাঁকালো হয়ে উঠেছে। এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকদের উচ্চ বেতন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের পক্ষে প্রবল আকর্ষণের সৃষ্টি করলো। দীনেশচন্দ্র লিখেছেন : "এই আকর্ষণ আশুতোষের অনুরাগী দলের মধ্যে অনেকে প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না। রাধাকুমুদ, রাধাকমল—দুইজন বিশিষ্ট অধ্যাপক লক্ষ্ণৌ চলিয়া গেলেন, রমেশ মজুমদার ঢাকায় কাজ গ্রহণ করিলেন। মেঘনাদ সাহা, হরিদাস ভট্টাচার্য প্রভৃতি খ্যাতনামা অধ্যাপকরাও কলিকাতা ছাড়িয়া গেলেন। সহিদুল্লা ৪০০৲ টাকা বেতন পাইয়া ঢাকায় চলিয়া গেলেন।...এক একজন কৃতী পুরুষ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া গেলেন, আশুবাবুর মনে হইতে লাগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক-একটি হাড় খসিয়া পড়িতেছে। তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন, কিন্তু ধরিয়া রাখার জন্য কোনো আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না।"

১৯২১ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শিক্ষা-সংক্রান্ত বাজেট উত্থাপন করলেন শিক্ষা-মন্ত্রী প্রভাসচন্দ্র মিত্র। তাতে দেখা গেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নয় লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সরকারী অর্থের পরিমাণ কিছুমাত্র বৃদ্ধি করা হয় নি। তখন এই বিশ্ববিদ্যালয় সরকার থেকে পেতেন বাৎসরিক মাত্র এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার টাকা। এই বাজেট বিতর্কের সময় প্রভাসচন্দ্র ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে এই উক্তিটি করেছিলেন : "I am of opinion that the deficit of Calcutta University amounting to nearly five lacks of rupees is due to thoughtless expansion of the University in the past." বলা বাহুল্য, আশুতোষকে লক্ষ্য করেই

তিনি এই সুতীক্ষ্ণ মন্তব্যটি করেছিলেন। প্রভাসচন্দ্রের এই বক্তৃতাটি দীর্ঘ ছিল এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকার পক্ষ থেকে এমন তীব্র সমালোচনা ইতিপূর্বে আর কখনো করা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা সেদিন যে সত্যিই টলটলায়মান হয়ে উঠেছিল, "On the verge of bankruptcy.—ঠিক এই কথাটি শিক্ষা-মন্ত্রী ব্যবহার করেছিলেন। এবং এর জন্য যে সিনেট-সিণ্ডিকেট দায়ী, শিক্ষা-মন্ত্রীর বক্তৃতার ইহাই ছিল মূল বক্তব্য। পরিশেষে তিনি বলেছিলেন: "I have no doubt that the present Vice-Chancellor who is one of the ablest men that we have not only in this province, but in the whole of India, will see the wisdom of my advice and if he makes up his mind, I am sure, things will be easy in the Calcutta University."

"Things will be easy"—এটা শিক্ষা-মন্ত্রী যত সহজ অনুমান করেছিলেন, কার্যতঃ তা সুকঠিন ছিল। তার কারণ—একদিকে সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, অন্যদিকে সিন্দুকের চাবিটি তাঁদের হাতে। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় তখন সিনেটের অন্যতম সদস্য ছিলেন। ৩রা মার্চ ১৯২২, সিণ্ডিকেটের এক সভায় তিনি একটি প্রস্তাবের নোটিস দিলেন। শিক্ষা-মন্ত্রীর বক্তৃতার প্রতিবাদ ছিল তাতে। নীলরতন সরকার শিক্ষা-মন্ত্রীর বক্তৃতার বিশদ আলোচনার জন্য একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব তুললেন। ১৩ই মার্চ সিনেটের এক সভায় নীলরতন সরকারের প্রস্তাব গৃহীত হোল এবং সাতজনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ চৌধুরী, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নীলরতন সরকার, জি হাওয়েলস এবং বিধানচন্দ্র রায় এই কমিটিতে ছিলেন। প্রভাসচন্দ্রের বক্তৃতার একটা যুক্তিপূর্ণ জবাব ছিল এই কমিটি বিরচিত বিবৃতির মধ্যে। এই বিবৃতির মুসাবিদা ছিল আশুতোষের।

১৯২২, ১৮ই মার্চ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভায় চ্যান্সেলার হিসাবে রোনাল্ডসে বক্তৃতা দিলেন। এই বছর আশুতোষের D. L উপাধি পাওয়ার পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়। এই ঘটনাকে স্মরণীয় করবার জন্য আশুতোষকে একটি স্মারকগ্রন্থ

(Silver Jubilee Volume) উপহারস্বরূপ দেওয়া হয় এবং চ্যান্সেলার স্বয়ং ঐটি আশুতোষের হস্তে সমর্পণ করেন। ঐ বক্তৃতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তার-সাধনে তিনি কয়েকটি সুন্দর কথা বলেছিলেন। তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হোল। "Sir Asutosh Mookerjee has been responsible for converting it from a mere examining board into an active centre of teaching and research. The greatest land mark in the history of the University in recent years is undoubtedly the creation of the Council of Post-graduate studies." এই সঙ্গে পোস্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগটি যে সঙ্গত কারণেই ব্যয়বহুল —চ্যান্সেলার সে কথাটি পরিষ্কার ভাষাতেই উল্লেখ করেন।

তারপর ভাইস-চ্যান্সেলাররূপে আশুতোষ তাঁর ভাষণ দিলেন। শিক্ষা-মন্ত্রীর সমালোচনার একটা উত্তর ছিল এর মধ্যে। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা তিনি বলেছিলেন। একটি জাতির জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের যথার্থ উপযোগিতা কোথায়, এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করে সেদিন তিনি যে সারগর্ভ উক্তি করেছিলেন, সেগুলি আজো তাদের মূল্য হারায় নি। আশুতোষ বলেছিলেন: "To my mind the University is a great store-house of learning, a great bureau of standards, a great workshop of knowledge, a great laboratory for the training of men of thought as well as of men of action. The University is thus the instrument of the State for the conservation of knowledge, for the applications of knowledge, and above all, for the creation of knowledge-makers."

ভারতবর্ষের আর কোনো ভাইস-চ্যান্সেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন সংজ্ঞা দিতে পারেন নি।

সিণ্ডিকেট নিযুক্ত একটি কমিটি শিক্ষা-মন্ত্রীর বক্তৃতা-সম্পর্কে একটি সর্ববাদীসম্মত রিপোর্ট দাখিল করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু রিপোর্টের মধ্যে

ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট, কারণ ইহাতে এই প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার একটি নিখুঁত চিত্র ছিল। নির্বিচারে বিস্তার সাধনের যে অভিযোগ শিক্ষা-মন্ত্রী এনেছিলেন, তারো একটা জবাব দেওয়া হয় এবং রিপোর্টের উপসংহারে বলা হোল: "The Committee is of opinion that the University has furnished no occasion for the alleged irritation and record the tone and language of the Minister of Education as unfortunate." ব্যাপার কিন্তু এইখানে মিটল না। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিকাংশ সদস্যই তখন আশুতোষের কর্ম-পন্থার বিরোধী ছিলেন। তাঁরা পরিষদে এই মর্মে একটি প্রস্তাব নিয়ে এলেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ বিষয় তদন্তের জন্য অবিলম্বে একটি কমিটি গঠন করা হোক। এই কমিটিতে থাকবেন দুইজন financial expert, গভর্নমেণ্ট মনোনীত সিনেটের দুইজন সদস্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন তিনজন কাউন্সিল-নির্বাচিত বেসরকারী ব্যক্তি। অধিকাংশের ভোটে এই প্রস্তাব কাউন্সিলে গৃহীত হয়। বাংলা সরকারের কাছ থেকে যথাসময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট এই প্রস্তাব প্রেরিত হোল। ৮ই জুলাই, ১৯২২, সিনেট কর্তৃক নিযুক্ত একটি কমিটিতে এই প্রস্তাব আলোচিত হয় এবং তাঁরা একটি সুদীর্ঘ রিপোর্ট দাখিল করেন। আশুতোষ এই কমিটিতে ছিলেন। একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ সম্পর্কে কাউন্সিলের প্রস্তাব সিনেট মেনে নিলেন। ইতিমধ্যে একাউণ্টেণ্ট-জেনারেল বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা তদন্ত করে দুই খণ্ড সম্বলিত একটি রিপোর্ট গভর্নমেণ্টের নিকট দাখিল করেছিলেন। এই রিপোর্টের দ্বিতীয় খণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯২০-২১ সালের আয়-ব্যয়ের একটি পরীক্ষিত হিসাব দেওয়া হয়। বাংলা সরকারের শিক্ষা-বিভাগ উক্ত রিপোর্টের একটি কপি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। ১৯১১-১২ সাল থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত—এই দশ বছরের আর্থিক অবস্থার চিত্র এই রিপোর্টে পাওয়া যায়। ঐ রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে তখনকার ঘাটতির পরিমাণ সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা। "It was admitted that nearly three lakhs of the total deficit of 5,50,000 was due to circumstances over which the University had no control."

এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র লিখেছেন : "আর একদিন একাউণ্টেণ্ট-জেনারেলের প্রতিকূল সমালোচনা সিনেট সভার তালিকার অন্তবর্তী ছিল। প্রতিপক্ষের দল, বিশেষত অনেক সাহেব সদস্য বলাবলি করিতেছিলেন—'একাউণ্টেণ্ট-জেনারেল বড়ো সহজ ব্যক্তি নহেন, তিনি বড়োলাটের খরচপত্রের উপরেও ছাঁট দেন। এই যে অপব্যয়গুলির সম্বন্ধে তিনি কঠোর মন্তব্য করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে আশুবাবু আজ কি বলিবেন?' সেদিন আশুবাবুর কণ্ঠে যে গর্জন শুনিয়াছিলাম, তাহা ব্যাঘ্র-গর্জন ছাপাইয়া উঠিয়াছিল—তাহা একেবারে সিংহ গর্জন। আশুবাবু বলিলেন, 'একাউণ্টেণ্ট-জেনারেলের কি দুঃসাহস যে, গভর্নমেণ্টে বিধিবদ্ধ এই মহাপ্রতিষ্ঠান—এই সিনেটের বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর সম্যকরূপে আলোচিত ও সুবিবেচিত সিদ্ধান্তের উপর মন্তব্য জাহির করিতে পারেন? সিনেট-সভা হইতে যে সকল ব্যয় মঞ্জুর করা হয়, তাহারই তিনি পরীক্ষা করিতে পারেন—বিনা মঞ্জুরীতে কোনো ব্যয় হয় কিনা তাহাই তিনি দেখিবেন। ব্যয়ের যুক্তিযুক্ততা ও তৎসম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশের তাঁহার কোনো অধিকার নাই। সিনেটের শিক্ষা বিভাগের কি দরকার, কি দরকার নয় তাহার বিচারের জন্য যোগ্য ব্যক্তিগণ আছেন। এসকল বিষয়ে একাউণ্টেণ্ট-জেনারেলের কথা বলিবার অধিকার আছে, এ কথা কেহ স্বীকার করিবেন না। ইহা তাঁহার শুধুই গায়ের জোর।' এই বক্তৃতা যাঁহারা শুনিয়াছিলেন, সেদিন তাঁহাদের চক্ষে এত বড়ো একটা রাজকর্মচারী সামান্য একটা কেরানীরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন।"

একাউণ্টেণ্ট-জেনারেল বুঝিয়েছিলেন—বিশ্ববিদ্যালয় অসতর্ক, বেহিসাবী খরচের দ্বারা দেউলিয়া হয়ে পড়বার মুখে। আশুতোষ মনে করলেন, এ একটা অছিলা মাত্র; এই সূত্র ধরে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা হরণ করতে উদ্যত হয়েছেন। এই সময়ে শিক্ষা-মন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়কে শর্ত-সাপেক্ষ কিছু অর্থসাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ১৯২২ সালের ৮ই ডিসেম্বর সিনেটের সভায় আশুতোষ সরকারী-দাক্ষিণ্যের যে উত্তর দিয়েছিলেন তা একমাত্র আশুতোষের পক্ষেই দেওয়া সম্ভব ছিল। তিনি নিজে স্বাধীনচেতা ছিলেন বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এত তৎপর ছিলেন। এই জগদ্বিখ্যাত বক্তৃতায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যা

বলেছিলেন, তা যুগে যুগে সকল দেশও সকলকালে উৎপীড়িত নর-নারীদের নির্জীব হৃদয়ে তেজ ও শক্তি সঞ্চারণ করবে। একমাত্র রাজা রামমোহনের পর বাংলার ইতিহাসে, পৃথিবীর ইতিহাসে, আর কারো মুখ থেকে এরূপ অপূর্ব স্বাধীনতার বাণী কখনো নিঃসৃত হয়নি। তিনি বলেছিলেন :

"You give me slavery with one hand and money with the other. I despise the offer. I will not take the money. We shall retrench and we shall live within our means. We shall starve. We will go from door to door, all through Bengal I will ask my Post-graduate teachers to starve their families but to keep their independence. I will tell you, as member of the University, stand up for the rights of the University. Forget the Government of Bengal. Forget the Government of India Do your duty as Senators of this University. Freedom first freedom second, freedom always" উদ্দীপনাময়ী এই বাণী আজো বাঙালীর হৃদয়ে ঝঙ্কার তোলে।

সরকারী শর্তগুলি মেনে নিলে হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ-সংকট ঘুচে যেত। কিন্তু আশুতোষের সিনেট দাসত্বের লৌহ-বেড়িতে আবদ্ধ হোতে চাইল না। আমরা আজ কল্পনা করতে পারি যে, সেদিন আশুতোষ যখন তাঁর এই ঐতিহাসিক বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন সেই বক্তৃতার রোষব্যঞ্জক প্রতিটি কথা সিনেট গৃহের সর্বত্র ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হোয়ে উঠেছিল। উপসংহারে তিনি বলেছিলেন . ' কিন্তু আপনারা আমার কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করুন, যে পর্যন্ত আমার দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকিবে, সে পর্যন্ত আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অবমাননার সহযোগিতা করিব না। আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়কে গোলাম তৈরি করিবার যন্ত্রশালায় পরিণত হইতে দিব না···কিছুতেই ইহাকে সেক্রেটারিদের দপ্তরের আত্মসাৎ হইতে দিব না। যে টাকাটা আমাদের দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা কোনো স্থায়ী দান নহে, এমন কি একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাৎসরিক দানও নহে—সাকুল্যে মাত্র আড়াই লক্ষ টাকা। ইহারই জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা চিরতরে বিসর্জন দিতে হইবে। এরূপ করিলে

সমস্ত বাঙালী জাতি আমাদিগকে কি বলিবে? সমস্ত ভারতবর্ষের নিকট আমরা কি কৈফিয়ৎ দিব? আমরা যদি আড়াই লক্ষ টাকা মূল্যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্বাধীনতা বিক্রয় করি, তবে ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা কি আমাদিগকে ধিক্কার দিবে না?"

আবেগ ও জ্বালাময়ী ভাষার এই মর্মান্তিক স্বর কালের প্রান্তর অতিক্রম করে আজও আমাদের অন্তরে কি প্রতিধ্বনিত হয়? এই যে প্রাণঢালা আবেগ ও স্বাধীনতার দাবী—এরই মধ্যে তো বাংলার সেই ব্যাঘ্র-প্রতিম পৌরুষের প্রচণ্ড মূর্তি আমরা সবিস্ময়ে দেখতে পাই—দেখতে পাই সর্বকালের এক অপরাজেয় যোদ্ধার অনমনীয় দার্ঢ্য। এমন ভাস্বর ছবি শতাব্দীর পটে দু'চারিটির বেশি আঁকা হয়নি। এই বিদ্রোহের মূল্য বাঙালী বোধ হয় তেমন ভাবে উপলব্ধি করতে পারে নি, যেমন ভাবে করা উচিত ছিল।

আগেই বলেছি, আশুতোষকে যখন নূতন করে ডাকা হয় তখন দেশের উপর দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল বন্যা বয়ে চলেছে। গভর্নমেণ্টের উৎকণ্ঠার সীমা নেই। দেশের অনেক প্রভাবশালী লোক এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের কারো কারো দৃষ্টি পড়ল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর। বিশ্ববিদ্যালয় উপলক্ষ, তাঁদের প্রকৃত লক্ষ্য ছিলেন আশুতোষ। একটি জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়বার জন্য ধুয়া উঠেছিল সেই সময়ে এবং আশুতোষকে সেই দলে টানবার যে চেষ্টা না হয়েছিল, এমন নয়। দলে দলে ছাত্ররা স্কুল-কলেজ ত্যাগ করছে; বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাস প্রায় শূন্য হবার উপক্রম। আশুতোষ ইচ্ছা করলে বিশ্ববিদ্যালয় ভেঙে নূতন একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে পারতেন। দীনেশবাবু এই প্রসঙ্গে যথার্থই মন্তব্য করেছেন: "সেইদিন আশুতোষ যদি একবার অঙ্গুলী হেলন করিতেন, তবে কোথায় থাকিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কুল-কলেজসমূহ? সেদিন ছাত্ররা অভিভাবকগণের প্রতি ভ্রূকুটি করিয়া অকূলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চাহিয়াছিল। একমাত্র আশুতোষ বিদ্যায়তনগুলির দ্বার আগলাইয়া তাঁহার মন্ত্রসিদ্ধ ভাষায় 'তিষ্ঠ' শব্দ উচ্চারণ পূর্বক এই পিপীলিকা শ্রেণীর মতো বালক-যুবকদের উন্মত্ত, বিক্ষুব্ধ প্রবাহ থামাইয়া দিয়াছিলেন···এই বাংলা দেশকে এক মহাসঙ্কটের অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।"

১৯২৩। ২৪শে মার্চ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে চ্যান্সেলার হিসাবে নূতন লাট লর্ড লিটন তাঁর বক্তৃতায় সরকারী কর্তৃত্বের প্রসঙ্গটা নূতন করে তুললেন। তিনি বললেন : "The connection of Government with the University, and the supervision by Government of the affairs of the University are new things which we are seeking for the first time." গভর্নমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে নূতন বিধি প্রণয়নের পরিকল্পনা করছিলেন। আশুতোষ বুঝলেন যে reform এর নামে বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পূর্ণভাবে কুক্ষিগত করাই নূতন বিধি প্রণয়নের একমাত্র উদ্দেশ্য। ভাইস-চ্যান্সেলার হিসাবে এই বছর তিনি তাঁর শেষ কনভোকেশন বক্তৃতা প্রদান করলেন। সরকারী প্রস্তাবের প্রসঙ্গে তিনি বললেন : "We cannot shut our eyes to the lamentable fact that there have been abundant indications in recent times of the existence of what looks like a determined conspiracy to bring this University into disesteem and discredit" সেদিন লাট লিটনের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি যে দৃপ্ত ভঙ্গিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা দাবী করেছিলেন, তা স্মরণীয় হয়ে আছে। ভাইস-চ্যান্সেলার হিসাবে তাঁর এই সর্বশেষ বক্তৃতাটি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষের ইতিহাসে নানা কারণে চিরস্মরণীয় হোয়ে থাকবে।

বাংলা সরকার তথা লাট লিটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্যক স্বাধীনতা স্বীকার করতে চাইলেন না। এই কনভোকেশনে চ্যান্সেলাররূপে লিটন যে বক্তৃতা করেন তাতে তিনি প্রকারান্তরে এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, এই বিশ্ববিদ্যালয় নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার দাবী করতে পারে না, কারণ প্রতিষ্ঠা হওয়ার সময় থেকেই সরকারী কর্তৃত্বাধীনে এর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে লিটন স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট থেকে এই কয়টি ছত্র উদ্ধৃত করেছিলেন : "ভারতবর্ষের প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সমস্তই সরকার কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের একটি উদ্দেশ্য ছিল, যেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সরকারের প্রদত্ত নির্দিষ্ট ক্ষমতানুসারে স্কুল ও কলেজ-

গুলিকে কতকগুলি নিয়মানুসারে পরিচালনা করিতে পারে। সুতরাং প্রথম হইতেই এই সকল প্রতিষ্ঠান স্বাধীন বিত্তায়তনরূপে উদ্ভূত হয় নাই। সিনেটের সদস্যগণের অধিকাংশই সরকারের মনোনীত লোক এবং তাঁহারা সরকারী আইন-কানুনের অধীন হইয়া প্রদত্ত ক্ষমতার সীমার মধ্যে কার্য করিতে নিয়োজিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের কার্যরীতির উপর সর্বদা সরকারের তত্ত্বাবধান থাকিবে,—ইহাই তাঁহাদের নিয়োগের শর্ত।" এই কথাগুলি উদ্ধৃত করে লিটন তাঁর বক্তৃতায় মন্তব্য করেছিলেন : "সুতরাং বিশ্ববিত্তালয়ের সঙ্গে এই সম্বন্ধ গভর্নমেণ্ট নূতন করিয়া সৃষ্টি করেন নাই,—ইহা চিরদিনই আছে। আমাদের এখন দেখিতে হইবে যে, আমরা বিশ্ববিত্তালয়ের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিয়া এই চিরন্তন সম্বন্ধটি যেন বিশ্ববিত্তালয়ের পক্ষে প্রকৃত হিতকর করিয়া তুলিতে পারি।"

আশুতোষ এর জবাব দিলেন। বললেন : "The University must be free from external control over the range of subjects of study and methods of teaching and research. We have to keep it equally free from the trammels in other directions —political fetters from the State, ecclesiastical fetters from religious corporations, civic fetters from the community and pedantic fe[illegible] from [illegible]t may be called the corporate repressive acti[illegible] University itself." এই প্রসঙ্গে তিনি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ও গ্লাসগো বিশ্ববিত্তালয়ের চ্যান্সেলার রোজবেরির সেই বিখ্যাত ভাষণটি উদ্ধৃত করেছিলেন এবং উপসংহারে বলেছিলেন : "When all is said and done, there standsforth unshaken the conviction that our insistent claim for the freedom of the University is a fight for a righteous cause, a fight for the most sacred and impalpable of national privileges...No human institution is so permanent as a University. Dynasties may come and go, political parties may rise and fall; the influences of men may change, but the University goes

on forever as seats of trust and power, as free fountains of living waters and as undefiled alters of inviolable Truth."

এইভাবেই সেদিন আশুতোষ শিক্ষা-সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করেছিলেন এবং এটা তিনি করতে পেরেছিলেন এইজন্য যে, —"এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তিনি দিবারাত্র প্রাণপাত করিয়া খাটিয়াছিলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ক্ষুদ্র স্বার্থ তাঁহার নিকট স্বীয় দেহের রক্তবিন্দুর মূল্য বহন করিত, এখানে আমাদের ভবিষ্যদ্বংশধরেরা জ্ঞানের নানা পথে ধাবিত হইয়া ভারতবর্ষের গৌরব বৃদ্ধি করিবে, তাহারা শুধু বিদ্যার ক্ষেত্রে জগজ্জয়ী হইবে, এমন নহে, কোনো হুজুগে না মাতিয়া নাগরিকের সুমহান্ কর্তব্য পালন করিতে শিখিবে—এই লক্ষ্যে তিনি পাথর কাটিয়া পথ তৈয়ারি করিতেছিলেন।" সেদিন না তাঁর দেশবাসী, না সরকার কেহই সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন নি যে কি মহাহিতকর লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে আশুতোষ সর্ববিধ প্রতিকূলতার মধ্যে জাতীয় শিক্ষা ও চরিত্র গড়তে প্রাণান্ত চেষ্টা পেয়েছিলেন। সরকারী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে কেন তাঁর কণ্ঠে অমন প্রতিবাদ গর্জে উঠেছিল সেদিন? তার কারণ—"তাঁহার সমস্ত প্রাণের দরদ দিয়া গড়া এই বিশ্ববিদ্যালয়।" এই দরদের একটি দৃষ্টান্ত দিই।

১৯২৩ সালের গোড়াতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দারুণ অর্থসংকট দেখা দিল। অর্থকৃচ্ছ্রতাবশতঃ আশুতোষ অধ্যাপকদের বেতন পর্যন্ত দিতে পারেন নি। রাজশক্তি তখন দুর্জয় অভিমানে তাঁর ভিক্ষাপাত্র প্রত্যাখ্যান করে ফিরিয়ে দিয়েছে। আশা ছিল টাকা পাবেন এবং সেই টাকা দিয়ে অধ্যাপকদের বেতন মিটিয়ে দিতে সক্ষম হবেন। শিক্ষকদের তিনি নিরন্ন দেখতে পারতেন না। প্রতিশ্রুতিও তিনি দিয়েছিলেন তাঁদের। আশুতোষের মুখের কথাই যথেষ্ট, এ তাঁরা জানতেন। তাই তাঁরাও নিশ্চিন্ত ছিলেন। অবশেষে মে মাসে সরকারী প্রত্যাখ্যানের ফলে যখন আত্ম-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হোল, তখন, কথিত আছে, পুরুষসিংহ আশুতোষ নির্জন নিশীথে অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন। একেই বলে অনুরাগের দায়। তাঁর অন্তরের এই অনুরাগ তিনি অকৃপণভাবে উজার করে দিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদীমূলে। বাইরে থেকে অনেকেই তাঁর এই

অনুরাগটা বুঝতে পারত না বলেই তারা বলতো—বিশ্ববিদ্যালয় যেন আশু মুখুজ্যের জমিদারি। এ কটুক্তিও তিনি সেদিন নীরবে সহ্য করেছেন।

আসল কথা, সেদিনকার উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে লর্ড লিটনের গভর্নমেণ্ট তথা তাঁর শিক্ষা-মন্ত্রী প্রভাসচন্দ্র মিত্র একটি গভীর রাজনৈতিক চক্রান্তে লিপ্ত হয়েই শিক্ষাকে রাজনীতির স্তরে নামিয়ে আনতে উদ্যত হয়েছিলেন। আশুতোষের প্রাধান্য খর্ব করাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য, 'বিল'টা ছিল উপলক্ষ মাত্র। আশুতোষের দুর্ভাগ্যক্রমে কয়েকজন নিতান্ত আশ্রিত প্রতিপালিত ও পরম স্নেহভাজন ব্যক্তির প্ররোচনায় ও চক্রান্তে এই সময়ে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে যে রকম নির্যাতিত হতে হয়েছিল তা তাঁর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। কাল-মাহাত্ম্যে এই চক্রান্ত এতদূর গুরুতর হয়ে উঠেছিল যে সরকার পর্যন্ত তাতে সংশ্লিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। সে ইতিহাস অন্তরালেই রয়ে গেছে। সরকারী বিরোধিতার ফলে সেদিন এমন আগুন জ্বলে উঠেছিল যে দেশের লোক ভাবলো যে আর বিশ্ববিদ্যালয় রক্ষা হয় না। আশুতোষের তখন যে কি মানসিক যন্ত্রণা কি তীব্র উদ্বেগ, কি ভীষণ পরীক্ষা তা জানতেন তাঁর অন্তরঙ্গস্থানীয়েরা। এই প্রসঙ্গে হেমেন সেন লিখেছেন :

"আমি ঐ সময়ে (১৯২৩) একদিন সন্ধ্যায় উপস্থিত হয়ে দেখি মহাপুরুষ দুই ভয়ঙ্কর কর্তব্যের ভয়ঙ্কর পীড়নে ছটফট করছেন। আমাকে ডেকে বললেন—কিরূপ ব্যাপার, কিরূপ নির্যাতন সব দ্যাখো। আমায় সব correspondence দেখালেন। যেরূপ ঘোর অবিচার ঘোর অন্যায় ঘোর ষড়যন্ত্রের ব্যাপার, তা দেখে স্তম্ভিত হলাম। বললেন—চলো, মাঠে যাই। আমরা দুজনে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনের মাঠে, মোটর থেকে নেমে বেড়াতে লাগলাম। সন্ধ্যা হয়ে রাত্রি প্রায় ন'টা পর্যন্ত সেইখানে কাটিয়ে বাড়ি এলাম। সকলে শুনে স্তম্ভিত হবেন যে আশুতোষ নিজের রক্ত দিয়ে গড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান রক্ষার জন্য, আপন চরিত্রের গৌরবের জয়ডঙ্কা বাজিয়ে, আত্মসম্মানের হানিজনক কোনোরূপ প্রলোভনে লুব্ধ না হয়ে ভাইস-চ্যান্সেলারি পদ পরিত্যাগ করে যে জগদ্বিখ্যাত পত্র লিখেছিলেন, সে পত্র যখন তিনি লেখেন, তখন তাঁর একমাত্র প্রিয়তমা কন্যা কমলা মৃত্যুর দ্বারে।"

এইবার বলি আশুতোষের জীবনের সেই প্রসিদ্ধ কাহিনী—যার সমতুল্য কাহিনী বাংলা তথা ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসে বিরল।

৩রা এপ্রিল, ১৯২৩।

ভাইস-চ্যান্সেলার হিসাবে আশুতোষ ঐ দিন সিনেটের এক সভায় সভাপতিত্ব করলেন। সেই সভায় সিনেটের অন্যতম সদস্য কামিনীকুমার চন্দ আশুতোষকে জিজ্ঞাসা করলেন: "শোনা যাচ্ছে আপনাকে নাকি কয়েকটি শর্তাধীনে আর এক term এর জন্য ভাইস-চ্যান্সেলার করার কথা হয়েছে আর আপনি নাকি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন।" আর একজন সদস্য বললেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই সঙ্কটজনক সময়ে আপনি কেন এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন তা জানবার জন্য সিনেটের উৎকণ্ঠার সীমা নেই।"

আশুতোষ উত্তর দিলেন: "গত ২৪শে মার্চ, আমি যখন কনভোকেশন থেকে বাড়ি ফিরি, তখন দেখি বাংলার লাট সাহেব আমার উদ্দেশে একখানি চিঠি লিখেছেন। মনে হয়, এই চিঠি কনভোকেশনের পূর্বেই লেখা। এতে কনভোকেশনের কোনো উল্লেখ ছিল না এবং কনভোকেশন শেষ হবার পূর্বেই ঐ চিঠি আমার বাসভবনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

অতঃপর তিনি, লিটন এবং তাঁর মধ্যে যে পত্র বিনিময় হয়েছিল—ঐ সভায় সেই পত্রখানি পাঠ করে শোনালেন। এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র লিখেছেন: "লাট লিটন আশুতোষকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহা সেই সময়ের শাসকবর্গের মনোভাবের একটা স্পষ্ট প্রকাশ মাত্র। লাট লিটনের চিঠিতেই জানিতে পারা যায় যে, আশুতোষের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও অসামান্য কর্মশক্তির উপর তাঁহার বিশ্বাস ছিল,—তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, তিনি কর্তৃপক্ষের কথা শুনিয়া কাজ করেন,—তাহা হইলে তাঁহার মতো যোগ্য ব্যক্তিকে আসন-চ্যুত করা তিনি কিছুতেই উচিত মনে করিবেন না। চিঠিখানি একটু ত্রস্ততার সহিত লেখা হইয়াছিল,—একটু সাবধান হইয়া লিখিলে এরূপ অনর্থ হইত না।"

কথাটি সত্য। সতর্কতার অভাব অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল লিটনের এই সুদীর্ঘ পত্রে। শিষ্টাচারের অভাব আরো সুস্পষ্ট। তিনি লিখেছিলেন: "আপনি এপর্যন্ত আমাদের কোনো সাহায্য করেন নি, বরঞ্চ আমাদের প্রতি কাজে বাধা জন্মিয়েছেন,—আপনি আমাদের যে সব সমালোচনা করেছেন, তা আদৌ

গঠনমূলক নয়, বরং আরব্ধ কাজের বিঘ্নকর। আপনি আমাদের 'বিলের' বিরুদ্ধে আসাম সরকারকে ও স্যর মাইকেল স্যাডলারকে আবেদন-নিবেদন করেছেন, এবং কতকগুলি পত্রিকাকে দিয়ে এরূপ প্রবন্ধ লিখিয়েছেন, যার ফলে আমাদের শাসন সম্বন্ধে লোকের মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হোতে পারে।"

নিঃসন্দেহে এই কথাগুলি কড়া ছিল এবং একজন চ্যান্সেলার একজন ভাইস-চ্যান্সেলারকে পত্র লিখলে তাতে যে সৌজন্য ও শিষ্টাচার থাকা উচিত, তার অভাব আছে এই পত্রে। একজন লাট-সাহেবের মুখেও এমন কথা অশোভন বৈকি। তথাপি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আশুতোষের প্রতি এইরূপ বিরূপ মনোভাব পোষণ করেও লিটন আশুতোষকে ভাইস-চ্যান্সেলারের পদ দিতে চেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, সনির্বন্ধ অনুরোধও জানিয়েছিলেন যেন তিনি সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেন, তাঁদের কথা অনুযায়ী কাজ করেন।

আত্মসম্মানবোধের মূর্ত অবতার আশুতোষ কি করলেন?

স্বাধীনতাপ্রিয় এবং চির অকুতোভয় সেই মানুষটির পক্ষে যা করা উচিত ছিল, সেদিন তিনি তাই করেছিলেন। হুঙ্কার করে উঠেছিলেন—কী, এত বড়ো স্পর্ধা তোমার! শর্তাধীনে ভাইস-চ্যান্সেলারি দিতে চাও আমাকে—আশু মুখুজ্যেকে? উদ্ধত লিটন তাঁর পত্রের সমুচিত জবাব পেয়েছিলেন। সে জবাব শুধু আশুতোষের ছিল না—ছিল আত্মমর্যাদায় উদ্বুদ্ধ সমগ্র জাতির। বড়োলাট কার্জনের গগনস্পর্শী স্পর্ধা যাঁকে টলাতে পারেনি, তিনি নতজানু হবেন লাট লিটনের কাছে? নর-শার্দুল আশুতোষ লাট-বেলাটের দুর্বাক্য শুনতে আদৌ অভ্যস্ত ছিলেন না—ইংরেজের রাজ্যে বাস করেও তিনি কারো কাছে মাথা হেঁট করতে প্রস্তুত ছিলেন না। এখানে তিনি বিদ্যাসাগরের সমগোত্র। এ কথা সকলেই জানেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে প্রিয়তম জিনিস আশুতোষের কিছু ছিল না। তবু এই প্রতিষ্ঠানের খাতিরেও তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন লিটনের অনুরোধ, সহ্য করলেন না তাঁর অশোভন এবং উদ্ধত কথা।

লিটনের চিঠির উত্তরে (এই চিঠির তারিখ ২৬শে মার্চ, ১৯২৪) আশুতোষ

লিখলেন : "আপনি লিখেছেন, আমি সংবাদপত্রগুলিকে সরকারের বিরুদ্ধে লিখতে উত্তেজিত করেছি—এই উক্তি মানহানিকর। আপনাকে আমি আহ্বান করছি, আপনি এই অভিযোগ উপযুক্ত প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করুন। আপনি লিখেছেন, আমি আপনার 'বিলের' বিরুদ্ধে কাগজপত্র, স্যাডলার সাহেব ও আসাম গভর্নরের কাছে পাঠিয়েছি। হঁ্যা। পাঠিয়েছি। একজন সিনেটের সদস্য, তাঁর কাছে এই সব কাগজপত্র আমরা পাঠাতে বাধ্য। অপর একজন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খুটিনাটি সমস্ত অবগত হোয়ে এর ইষ্টের জন্য বহু পরিশ্রম করেছেন ; তাঁর কাছে এইসব কাগজপত্র না পাঠালে তা সিনেটের পক্ষে অশোভন হোত।"

আশুতোষ তাঁর চিঠিতে লিখেছিলেন যে, লর্ড মিণ্টো, লর্ড হার্ডিঞ্জ, লর্ড চেমসফোর্ড তাঁকে সাদরে ডেকে এনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার দিয়েছেন এবং তিনি অনেক সময়েই কর্তৃপক্ষের কাজের প্রতিবাদ করেছেন—এ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের হিতকল্পেই করেছেন। তাঁরা একবাক্যে তাঁর স্বাধীন মনোবৃত্তির প্রশংসা করেছেন। অনেক বছর ধরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন এবং তাঁর পূর্ববর্তী ভাইস-চ্যান্সেলারদের কাজ লক্ষ্য করেছেন। এই স্বাধীন মনোবৃত্তি তাঁর নিজের একটা খেয়ালমাত্র নয়—তাঁর পূর্ববর্তিগণের পথেই তিনি চলেছেন। সরকারের ইচ্ছাধীন হোয়ে কাজ করতে হবে, এই কথা শুনলে পূর্ববর্তী ভাইস-চ্যান্সেলাররা বিস্মিত হোতেন। পত্রে তিনি স্বীকার করলেন, তিনি লাট সাহেবের এবং তাঁর মন্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য কিছুমাত্রও চেষ্টা করেননি। কিন্তু সরকার যাতে তাঁদের অন্যায় পন্থা থেকে বিরত হন, বিশ্ববিদ্যালয়ের হিতার্থে তিনি সর্বতোভাবে সেই চেষ্টা করেছেন ; কিন্তু তাতে কোনো ফলোদয় হয়নি, তাঁরা তাঁর প্রতিবাদ গ্রাহ্য করেননি কিম্বা তাঁর সৎপরামর্শে কর্ণপাত করেননি। উপসংহারে আশুতোষ লিখেছিলেন :

"আপনি এবং আপনার মন্ত্রী যে আমাকে সহ্য করতে পারছেন না, তাতে আমি বিস্মিত হইনি। আপনি দেশবাসীকে মানুষ হওয়ার জন্য মুখে উদ্বোধিত করেন। আপনাদের সম্মুখে এইখানেই একজন আছেন, যাঁর স্বীয় বিশ্বাসানুসারে কথা বলবার সাহস আছে এবং তিনি যা ভাল বোঝেন, তা করতে সর্বদাই চেষ্টা করেন—কিন্তু আপনারা তাঁকে দেখতে পারেন না। এ দেশে

এরূপ একজন ভাইস-চ্যান্সেলার পাওয়া আপনাদের পক্ষে অসম্ভব হবে না, যিনি আপনাদের বশম্বদ হোয়েই আদেশ প্রতিপালন করবেন এবং সিনেটে গুপ্তচরের কাজ করবেন ; তিনি সহজেই আপনাদের প্রিয় হবেন। কিন্তু তাদৃশ ব্যক্তিকে জনসাধারণ এবং সিনেটের সদস্যগণ কখনই বিশ্বাস করবেন না। আমরা নবাগত এইরূপ একজন ভাইস-চ্যান্সেলারের প্রতীক্ষায় রইলাম। তিনি সিনেটের চিরাচরিত পন্থা ত্যাগ করে কিরূপ নব-প্রণালী অবলম্বন করবেন, তা দেখবার জন্য কৌতূহল জাগছে। আমি আপনার পত্রের উত্তরে যা বলব, তা যাঁর আত্মসম্মানবোধ আছে, তাঁর একমাত্র উত্তর এবং আমার বিশ্বাস তাই-ই আপনি ও আপনার মন্ত্রিগণ আমার নিকট প্রত্যাশা ও ইচ্ছা করেন—আপনি যে অপমান-সূচক প্রস্তাব করে ভাইস-চ্যান্সেলারের পদ আমাকে দিতে চেয়েছেন, তা আমি প্রত্যাখ্যান করছি।"

আশুতোষের এই পত্রখানি* একটি জাতীয় 'দলিল' হিসাবে গণ্য হবার দাবী রাখে। সমগ্র জাতির আত্মমর্যাদাবোধ যেন এর ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। একটা পরাধীন জাতির অন্তর্বেদনা এবং সেইসঙ্গে উদ্ধত শাসকজাতির উপেক্ষা ও অবিচার এর আগে আর একবার মাত্র উদ্ঘাটিত হতে আমরা দেখেছি চেমসফোর্ডকে লেখা রবীন্দ্রনাথের সেই ঐতিহাসিক পত্রে—যে পত্রে তিনি পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে অনুষ্ঠিত সেদিনকার নৃশংস অত্যাচারের অকুণ্ঠ নিন্দা করে রাজদত্ত সম্মান 'নাইটহুড' ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আশুতোষের এই আত্মমর্যাদাজ্ঞানের মূল্য সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই না, আশুতোষের মৃত্যুর পর তিনি লিখেছিলেন: "Ashutosh herorically fought against heavy odds for winning freedom for our education." রবীন্দ্রনাথ কিম্বা আশুতোষ এঁরা কেউই দেশের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নি সত্য, কিন্তু চেমসফোর্ডকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি আর লিটনকে লেখা আশুতোষের চিঠি, সেদিনের রাজনীতিতে পরোক্ষ ভাবে যে প্রেরণা জুগিয়েছিল, তখনকার যে কোনো বিখ্যাত রাজনৈতিক বক্তার যে কোনো বক্তৃতার চেয়ে তার মূল্য কম ছিল না। দেশবন্ধুর *Forward* পত্রিকায় লিটন-আশুতোষের এই বিখ্যাত পত্রদুটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

* সম্পূর্ণ পত্রখানি পরিশিষ্টে দেওয়া হোল।

দেশবাসীর মনে যে উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল তার স্মৃতি আজো হয়ত অনেকের মনে জাগরূক আছে। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী তাঁর *Servant* পত্রিকায় একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে আশুতোষের এই পত্রখানির প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন : "Sir Asutosh has vindicated the honour of this country in a manner which is unprecedented in the annals of our history. His words will ring from soul to soul for generations to come." এর প্রত্যেকটি কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

দীনেশচন্দ্র লিখেছেন : "আশুতোষের সঙ্গে লাট লিটনের এই দ্বন্দ্ব লইয়া সমস্ত পত্রিকা মহলে খুব হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। সমস্ত দেশীয় পত্র এই ব্যাপারে লাট লিটনের নিন্দায় মুখরিত হইয়াছিল; 'ইংলিশম্যান' ও 'স্টেটসম্যান' লাট সাহেবকে সমর্থন করিয়াছিল। অতি শান্ত, শিষ্ট এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিরাও লাট-সাহেবের চিঠির ভাষায় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্যর জগদীশ ও স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতো ব্যক্তিরাও যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায় যে, যদি সত্য সত্যই আশুতোষ 'বাংলার ব্যাঘ্রবৎ' হইয়া থাকেন, তবে লাট লিটনও গায়ে পড়িয়া তাঁহাকে উস্কাইয়া তুলিয়াছিলেন।"

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ্য। ১৯২২ সালে লর্ড লিটন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'reformed University" আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'unreformed University' আখ্যা দিয়েছিলেন। ঐ বছরের কনভোকেশন বক্তৃতায় আশুতোষ তার সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন। শাসকজাতির একজন প্রতিভূর কাছে সেই নির্ভীক উত্তর ছিল নিতান্ত অপ্রত্যাশিত। "You have not showed sufficient loyalty to your Chancellor"—এই কথা সেদিন লিটন বলেছিলেন আশুতোষকে। তার উত্তরে আশুতোষ তৎক্ষণাৎ বলেছিলেন : "আমি কারো প্রতি শ্রদ্ধায় ন্যূন নই। আমি বিশ্ববিদ্যালয় এবং যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিতাকাঙ্ক্ষী, তাঁদের প্রতি সর্বদা শ্রদ্ধাশীল ও অনুরক্ত।"

বিশ্ববিদ্যালয়কে আশুতোষ ভালোবাসতেন—সেই ভালোবাসার উচ্চ মূল্যই তিনি দিয়ে গেছেন তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ে এবং ইহাই সেই মহাপুরুষের চরিত্রকে চিরকালের মতন মহিমামণ্ডিত করে রাখবে। এই বিদ্যাপীঠের তিনি

যে একজন কতবড়ো পূজারী ছিলেন তার পরিচয় আছে তাঁর একটি উক্তির মধ্যে। তাঁর মৃত্যুর অল্পদিন পূর্বে যখন দীনেশচন্দ্র সেন একদিন তাঁকে বললেন : "আপনি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় অচল—কায়াহীন ছায়া মাত্র।" তখন তার উত্তরে আশুতোষ বলেছিলেন : "বিশ্ববিদ্যালয় আশু মুখুজ্জ্যে থেকে ঢের বড়ো; আশু মুখুজ্জ্যে একদিন না একদিন মরে যাবে—কিন্তু বাঙালীজাতি যত দিন টিকে থাকবে, ততদিন এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যমান থাকবে।"

ইহাই ভাইস-চ্যান্সেলার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

॥ এগারো ॥

এইবার বিচারপতি আশুতোষের কথা বলবো।

আশুতোষের বাল্যের স্বপ্ন ও যৌবনের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হবেন। ১৮৮৮ সালে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতিতে ভর্তি হন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী ডক্টর রাসবিহারী ঘোষের শিক্ষানবিশ (Articled clerk) ছিলেন। ১৮৯৪ সাল তিনি 'ডক্টর অব ল' উপাধি লাভ করেন এবং ১৮৯৮ সালে ঠাকুব আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁর এই সময়কার বক্তৃতা 'Law of Perpetuities in British India' অনেকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ওকালতিতে প্রবিষ্ট হবার এক বছর পরে তিনি সিনেটের সদস্য নিযুক্ত হন। ওকালতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ তিনি সমান নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গেই করতেন। একথা সর্ববাদীসম্মত যে ব্যবহারশাস্ত্রে আশুতোষ ছিলেন একপত্রী। কূট গণিত বিদ্যায় তিনি যেমন নূতন তথ্য দিয়ে গিয়েছেন, আইনজ্ঞ হিসাবেও তেমনি তিনি অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

ওকালতি ব্যবসায়ে আশুতোষ পনর বছর নিযুক্ত ছিলেন এবং এই ব্যবসায়ে শেষের দিকে তাঁর মাসিক উপার্জন দশ হাজার টাকায় দাঁড়িয়েছিল। উত্তরকালে হয়ত এই উপার্জনের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পেত, কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দাবীর কাছে ব্যক্তিগত স্বার্থ তুচ্ছ হয়ে গেল। ১৯০৪ সালে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদে নিযুক্ত হলেন। এই পদ তিনি গ্রহণ করেছিলেন এইজন্য যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে প্রচুর অবকাশ পাবেন। পুত্র হাইকোর্টের জজ হয়, মাতা জগত্তারিণীর সেরূপ ইচ্ছা ছিল না। স্বামী গঙ্গাপ্রসাদ যেমন ছিলেন স্বাধীনচেতা, তাঁহার সহধর্মিনী এই মহীয়সী মহিলাও ছিলেন তেমনই স্বাধীনচেতা। এই প্রসঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ লিখেছেন :

"আশুতোষ জজিয়তির সরকারী নিয়োগ-পত্র হস্তে তাঁহার মাতার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে সেই সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। সেকালে হাইকোর্টের জজিয়তি ভারতবাসীর গুণ-গরিমার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার বলিয়া লোকদের ধারণা ছিল কিন্তু এই বর্ষিয়সী মহিলা কিছুতেই এই কাজের গৌরব বুঝিতে পারিলেন না। যত বড়ো চাকুরিই হউক না কেন, তাহা চাকুরি তো বটেই ; তাঁহার পুত্র যে সেই চাকুরি গ্রহণে স্বীকৃত হইবেন, একথায় কিছুতেই মাতা প্রীতি-সহকারে সম্মতি দিতে পারিলেন না। আশুতোষ অনেক করিয়া বুঝাইলেন যে তাঁহার পিতা (গঙ্গাপ্রসাদ তখন জীবিত ছিলেন না) বারংবার বলিয়াছেন যে, তাঁহার পুত্রের যদি চাকুরি নিতেই হয়, তবে হাইকোর্টের জজিয়তির নীচে কোনো কাজ যেন তিনি না গ্রহণ করেন। এই কাজ তাঁহার অল্পবয়সেই হইয়াছে (আশুতোষের বয়স তখন মাত্র চল্লিশ বছর) এবং ইহাতে তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়কে সেবা করিবার প্রচুর অবকাশ থাকিবে। অনেক বলা-কহাতে মাতা অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজী হইলেন। স্থতরাং এই পদ গ্রহণ করিয়া আশুতোষ সরকারে নিকট চিঠি লিখিলেন; কিন্তু মাতার মনের অস্বস্তি ঘুচিল না। তাঁহার সারা রাত্রি ঘুম হইল না এবং রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্বেই পুত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া অতি দৃঢ়ভাবে বলিলেন যে, তাঁহার সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছে। এ কাজ আশুতোষের কিছুতেই লওয়া হইবে না। আশুতোষ বলিলেন যে, তিনি পদ গ্রহণ করিয়া চিঠি পাঠাইয়াছেন এবং সে চিঠি সিমলায় রওনা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মাতা বলিলেন—'এখনই উহা প্রত্যাহার করিয়া 'তার' করা যাউক, চিঠি পৌছিবার পূর্বেই তার' সিমলায় পৌছিবে।' আশুতোষ বুঝাইয়া বলিলেন যে, এরূপ একটা কাজ করিলে তাঁহার মুখ থাকিবে না, উহা তাঁহার পক্ষে বড়োই অশোভন হইবে। অগত্যা মাতা নিরস্ত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন এবং আশুতোষ জজের পদ গ্রহণ করিলেন।"

১৯০৪ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত আশুতোষ হাইকোর্টের জজের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ১৯২০ সালে কয়েকমাসের জন্য তিনি প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ লিখেছেন যে, "আশুতোষের বিচার-বুদ্ধি ও ব্যবহার-শাস্ত্রের সাজ-সরঞ্জাম বিপুল ছিল। রোমান সময় হইতে নিতান্ত আধুনিক সময় পর্যন্ত আইনের বিকাশ এবং তাহার বিরাট ইতিহাস তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত

ছিল। প্রত্যেক দেশের বিচার-পদ্ধতি এবং আইন-কানুন তিনি অবগত ছিলেন। কি সূত্র এবং নজিরে কোন্ বিচার-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে, তাহার ব্যপদেশে আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট ও তদন্তর্গত ছোটো ছোটো কোর্টের বিচার ও আইনাদি সম্পর্কেও তিনি তাঁহার পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানের পরিচয় দেখাইতেন। ব্রিটিশ ও অপরাপর ঔপনিবেশিক দ্বীপগুলির এবং প্রাচীন ভারতের আচার-নিয়ম, আইন প্রভৃতির তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবহিত ছিলেন। সুতরাং তিনি যে সকল বিচার করিতেন, সেই বিচার-সিদ্ধান্তে সমস্ত জগতের ব্যবহারশাস্ত্রের মূল নীতিগুলির আলোক পড়িত।"

বিচারপতি আশুতোষ সম্পর্কেই একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লেখা যেতে পারে। *Calcutta Weekly Notes* নামক পত্রিকার মধ্যেই তাঁর দু'হাজারের অধিক 'রায়' পাওয়া যায়; এছাড়া অন্যান্য বিচারপতিদের সহযোগে তিনি যেসব 'রায়' দিতেন, তারমধ্যে একমাত্র তিনিই যেসব 'রায়' লিখতেন তার সংখ্যা বোধ হয় আরো বেশি। আশুতোষ একবার দীনেশচন্দ্র সেনকে বলেছিলেন: "এ বছর আমরা তিনজন জজ একত্র হোয়ে যতগুলি মোকদ্দমার বিচার করেছি জানেন? ৮০৩টি, এর মধ্যে ৮০০ মোকদ্দমার Judgment আমি লিখেছি আর আমার সহযোগী দুজনে তিনটি লিখেছেন।" এই প্রসঙ্গে আশুতোষের এক প্রধান সহযোগী বিচারপতি একদিন শ্যামাপ্রসাদকে বলেছিলেন: "তিনি একাই বেশি 'রায়' লিখতেন, এই প্রসঙ্গ একবার উত্থাপন করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—যৌবনের উদ্যমে এই অপরিমিত পরিশ্রমের উচ্চ আদর্শ অবলম্বন করেছেন, কিন্তু পরিণত বয়সে কি এমন সামর্থ্য থাকবে, যাতে আপনি এই উচ্চ আদর্শ রক্ষা করতে পারবেন? উত্তরে আশুতোষ আমাকে বলেছিলেন—'যেদিন আমার উচ্চ আদর্শ রক্ষা করতে পারব না, একইভাবে পরিশ্রম না করে অর্জিত প্রতিষ্ঠা নষ্ট করব, সেদিন যদি সত্যসত্যই আসে, তবে, তারপর একদিনও যেন বিচারপতির আসনে না থাকি।"

বিচারপতি আশুতোষকে বুঝবার পক্ষে তাঁর এই একটি উক্তিই যথেষ্ট। তাঁর চরিত্রের একটা বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি কখনো কোনো বিষয়ে পেছনে পড়ে থাকার মানুষ ছিলেন না। জীবনের যে ক্ষেত্রেই তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন, সেখানেই তিনি শীর্ষস্থানে থাকতেন। আইনব্যবসায়েও তাঁর সেই

শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখেছেন, "বিচারক ও সূক্ষ্মদর্শী ব্যবহারজ্ঞ বলিয়া স্যর আশুতোষ যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, তাহা এত সুপরিচিত যে, সে সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। দীর্ঘকাল তিনি বাংলাদেশের প্রধান ধর্মাধিকরণে ব্যবহার-দর্শন করিয়া এই সেইদিন অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি যে অসাধারণ খ্যাতি, প্রতিপত্তি এবং বিচারক ও ব্যবহারজীবী সকলের কাছে যে শ্রদ্ধা-প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন তাহা খুব অল্প বিচারকের ভাগ্যেই ঘটে।"

কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা বিচারপতি স্যর লরেন্স জেনকিনস্ আশুতোষের মৃত্যুর পর বলেছিলেন: "Sir Asutosh may justly be said to be one of the brightest ornaments of the Bench of the High Court of Calcutta." কলিকাতার শ্বেতাঙ্গ সমাজের মুখপত্র 'ইংলিশম্যান' লিখেছিল: "আশুতোষের কতকগুলি 'রায়' স্মৃতিশাস্ত্রের চিরন্তন সম্পদরূপে গণ্য হবে।" আরো বহু বিশিষ্ট অভিমত উদ্ধৃত করা যেতে পারে। স্যর গুরুদাস, দ্বারকানাথ মিত্র প্রমুখ তাঁর পূর্ববর্তী বিচারপতিগণ হাইকোর্টের ঐতিহ্যকে যেভাবে সমৃদ্ধ করেছিলেন, বিচারপতিরূপে আশুতোষ সেই ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ তো রেখেছিলেনই, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি এমন স্বাধীন বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন যার পূর্ব-দৃষ্টান্ত ছিল না। স্মৃতিশাস্ত্রে পারঙ্গম ব্যক্তি ভিন্ন একজন সাধারণ জীবনচরিত লেখকের পক্ষে বিচারপতি আশুতোষের কথা সম্যকরূপে অনুধাবন করা কিম্বা লেখা অত্যন্ত সুকঠিন কাজ। সাধারণ পাঠকের সাধারণ বুদ্ধিগ্রাহ্য করে আমরা আশুতোষ-প্রতিভার এই দিকটি সংক্ষেপে আলোচনা করব।

বিচারপতি আশুতোষকে বুঝতে গেলে তাঁর প্রদত্ত রায়গুলি (যার অনেক-গুলিকেই 'monumental judgment' বলা হয়ে থাকে) অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করতে হয়। তাঁর সেই বিপুলায়তন রায়গুলির ছত্রে ছত্রে যে মনীষা অভিব্যক্ত হয়েছে তা একমাত্র আইনজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেই অনুধাবন করা সম্ভব, সাধারণের পক্ষে নয়। বহু জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ মোকদ্দমার তিনি

বিচার করেছেন, আইন-ঘটিত বহু সুকঠিন এবং জটিল প্রশ্নের তিনি সমাধান করেছেন; উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় বহু সমস্যা তিনি নির্ভুলভাবে আলোচনা করেছেন। সর্বক্ষেত্রেই তাঁর মৌলিক চিন্তার ছাপ সুস্পষ্ট এবং সর্ব বিষয়েই তিনি একজন যথার্থ আইন-বিশারদ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। এই জন্যই আইনের জগতে তিনি বৃহস্পতিতুল্য আইনজ্ঞ ব্যক্তি হিসাবে আজো সম্পূজিত হয়ে থাকেন। কলিকাতা হাইকোর্টের সুদীর্ঘ ইতিহাসে 'বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়' এই নামটি তাই আজো শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়ে থাকে। তাঁর সময়ে বিচারপতিদের মধ্যে তিনিই ছিলেন মধ্যবিন্দু—যেন তারকাবেষ্টিত চন্দ্র। সকলেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল এই একজন বিচারপতির উপর। এ কম প্রতিভার পরিচায়ক নয়। আইন একটি জটিল এবং নীরস বিষয় এবং নিতান্তভাবে একমাত্র বিজ্ঞজনেরই আলোচনার বিষয়। তথাপি আশুতোষ-প্রদত্ত রায়গুলি পাঠ করবার জন্য সাধারণ লোকেরও আগ্রহের সীমা থাকত না। এর থেকেই বুঝা যায় একজন ন্যায়বান বিচারপতি হিসাবে আশুতোষ কী পরিমাণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর ডসন মিলার তাই বলেছিলেন: "The name of Sir Asutosh Mookerjee is a household word throughout the High Courts of India. His judgments were invariably lucid, and a masterful exposition of law on every subject with which they deal. They have only to be quoted to command universal respect"

তাঁর কোন্ রায়টা বিখ্যাত আর কোন্টা বিখ্যাত নয়, তা নির্ধারণ করা শক্ত। কেবলমাত্র আইনের ব্যাখ্যার নিপুণতার জন্য নয়, তার অন্তর্নিহিত সাবলীল অভিব্যক্তি এবং প্রমাণ-প্রয়োগের কৌশলের গুণেই আশুতোষের প্রত্যেকটা রায়ই ছিল প্রাণবন্ত। কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দিলাম। তাঁর জজিয়তির শেষের দিকে তাঁর এজলাসে একবার একটি মোকদ্দমা আসে—'চন্দ্রকান্ত ঘোষ বনাম কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট।' এই মামলাটি সেই সময়ে জনসাধারণের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল; সংবাদপত্রেও এই নিয়ে খুব আলোচনা হয়। কারণ এই মামলাটির সঙ্গে জনসাধারণের স্বার্থ জড়িত ছিল।

কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট তখনকার দিনে একটি শক্তিশালী সংস্থা হিসাবে পরিগণিত ছিল। সরকার এবং শ্বেতাঙ্গ জনসাধারণ ও তাদের সংবাদপত্র প্রবলভাবে এই সংস্থাটির আনুকূল্য করত। এর চেয়ারম্যান সি. এইচ. বোমপাস একজন জবরদস্ত লোক ছিলেন। ন্যায়ত হোক আর অন্যায়ভাবেই হোক ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট চন্দ্রকান্ত ঘোষ নামক এক ব্যক্তির জমি দখল করতে সিদ্ধান্ত করে। চন্দ্রকান্ত ঘোষ ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের এই অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে একটি মামলা রুজু করেন। তিনি কারণ দেখালেন যে, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের যেখানে কাজ হচ্ছে তার নিরাপদ ব্যবধানেই তাঁর জমিটি অবস্থিত এবং ট্রাস্ট কিছুতেই উহা দাবী করতে পারে না। বিচারপতি গ্রীভস-এর এজলাসে প্রথমে এই মামলাটি আসে এবং তিনি ট্রাস্টের স্বপক্ষেই রায় দিয়েছিলেন। এই ডিক্রির বিরুদ্ধেই চন্দ্রকান্ত ঘোষ আপিল করেন। যথারীতি এ্যাপিলেট বেঞ্চে এই মামলার শুনানী হয় এবং বিচারপতি আশুতোষ ছিলেন ঐ বেঞ্চের সভাপতি। তিনি মামলার সমগ্র বিষয়টি বিশদভাবে বিবেচনা করেন এবং গ্রিভসের রায় খারিজ করে দরিদ্র এবং অসহায় চন্দ্রকান্তের স্বপক্ষে রায় দেন। শক্তিশালী ট্রাস্টের বিরুদ্ধে রায় দেওয়া সেদিন বড়ো সোজা কথা ছিল না। কলিকাতার জনসাধারণ সেদিন এই মামলার রায় শুনবার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল এবং যেদিন আপিলের রায় বেরুলো সেদিন সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল। সেদিন এই মামলাটি একটি মর্যাদার লড়াই ছিল—ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট তার প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্য তার সমস্ত অর্থবল ও প্রভাব নিয়োগ করেছিল; অন্যদিকে একজন দরিদ্র ব্যক্তি বাস্তুচ্যুত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। আশুতোষের এই রায়ের বিরুদ্ধে ট্রাস্ট প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করেন এবং সেখানে তাঁরা জয়লাভ করেন। দেশীয় সংবাদপত্রগুলি কিন্তু প্রিভি কাউন্সিলের এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করে এবং আশুতোষের সিদ্ধান্তকেই যথার্থ ও ন্যায়সঙ্গত বলে ঘোষণা করে।

হিন্দু আইনশাস্ত্রে উত্তরাধিকার আইন (Law of succession বা inheritance একটি জটিল বিষয়। হিন্দু আইনে আশুতোষের কী অসামান্য

দখল ছিল তা প্রথম জানা গেল উত্তরাধিকারের দাবী সংক্রান্ত একটি মামলায়। ইহাই 'মনোহর মুখোপাধ্যায় বনাম রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায় নামক মামলা। উত্তরপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ এবং সম্ভ্রান্ত এক পরিবারের এই মামলাটি সেদিন হিন্দু সমাজে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। হিন্দু সমাজে রক্ষিতার সন্তানেরও যে উত্তরাধিকার থাকতে পারে, ইহাই ছিল এই বিখ্যাত মামলাটিতে বিচারপতি আশুতোষের 'রুলিং' এবং তাঁর এই নির্দেশ আইনশাস্ত্রে স্থায়ী স্বীকৃতি লাভ করেছে। কৌতূহলী পাঠক এই মামলায় প্রদত্ত আশুতোষের সমগ্র রায়টি পড়ে দেখতে পারেন।

এ্যাপিলেট বেঞ্চে আর একটি মামলার বিবরণ উল্লেখ্য। হাওড়ার জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি—ইনি একজন সরকারী ইঞ্জিনিয়ার (P. W. D.) ছিলেন পুলিস কর্তৃক লাঞ্ছিত হন; তাঁর অধীনস্থ কয়েকজন কর্মচারীও প্রহৃত হয়। বিষয়টি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হোলে জনসাধারণের মনে পুলিসের এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তুমুল উত্তেজনার সঞ্চার হয়। উক্ত ভদ্রলোক পুলিসের বিরুদ্ধে মারপিঠের অভিযোগ নিয়ে আসেন এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেন। বিচারে পুলিসের কয়েকজন ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হয় এবং তারা সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। পুলিসের পক্ষ থেকে আপিল করা হয় এবং দণ্ড হ্রাসের জন্য প্রার্থনা করা হয়। বিচারপতি আশুতোষ এই আবেদন অগ্রাহ্য করেন এবং দণ্ড হ্রাস করতে অসম্মত হন। তিনি তাঁর রায়ে উল্লেখ করেন যে, অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় নিম্ন আদালত যে দণ্ড দিয়েছেন তা নিতান্তই লঘু—অপরাধীদের ইহা অপেক্ষা কঠোর দণ্ড প্রাপ্য এবং তিনি অভিযোগকারী ইঞ্জিনিয়ারের এই বলে প্রশংসা করেন যে, প্রবলপ্রতিপত্তিশালী পুলিসের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা এনে তিনি শুধু জনসাধারণের কর্তব্য পালন করেননি, প্রকৃত সৎসাহস দেখিয়েছেন। তাঁর রায়ে পুলিসের সম্পর্কে যে সুতীব্র মন্তব্য ছিল, তা বোধহয় আজো অনেকের স্মরণে আছে।

মুসলমান পাড়া বোমার মামলার কথা অনেকের স্মৃতিতে এখনো বিদ্যমান। এই মামলাটির বিচারের জন্য তিনজন বিচারপতিকে নিয়ে একটি স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল গঠিত হয়। এই ট্রাইবুন্যালে ছিলেন আশুতোষ ও আর দুইজন শ্বেতাঙ্গ বিচারপতি—হুলমৃহড ও স্যর জেঙ্কিনস। এই মামলাটি সেদিন শহরে

যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। এই সম্পর্কে তাঁর এক জীবনীকার লিখেছেন : "The case was of peculiar significance and of particular importance, coming as it did in wake of similar other cases ; it was construed to be directly due to, and proof positive of, a well-organised and widespread revolutionary movement of criminal patriotism or anarchism, working underground and taking to bombs and pistols indescriminately, as it deserved, the case was elaborately prepared, ably conducted and stoughtly fought by the Government." এই মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তি একজন শিক্ষিত বাঙালী যুবক ; তাঁর পক্ষ সমর্থন করেছিলেন ল্যাংফোর্ড জেমস। স্পেশাল ট্রাইবুন্যালের বিচারে অপরাধী বেকসুর খালাস পায় এবং তাকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার আদেশ দেওরা হয়। পুলিসের নিকট এটা ছিল নিতান্ত অপ্রত্যাশিত। সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন দমনে সিদ্ধহস্ত পুলিসের পক্ষ থেকেই উক্ত যুবককে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়। এই মামলায় আশুতোষ মাত্র কয়েকটি কথায় যে রায় দিয়েছিলেন তাকে 'স্টেটসম্যানের' মতো কাগজ 'Crushing Judgment' বলে অভিহিত করে। এই স্মরণীয় রায়ে আশুতোষ পুলিসের মুখোশ খুলে দিয়েছিলেন। একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে অপরাধী প্রতিপন্ন করবার জন্য পুলিস সাধারণত যেসব অন্যায় পন্থা অবলম্বন করে থাকে সেই কথাব উল্লেখ করে আশুতোষ তাঁর রায়ে লিখলেন : "The attempt of the police to connect an innocent youth wth a dastardly crime has absolutely failed." তাঁর এই স্বল্পতম কথায় রচিত রায় সম্পর্কে একটি সংবাদপত্রে এই মন্তব্যটি প্রকাশিত হয় : "This short judgment, one of the very shortest, is characteristic of the man and indicative of his firm attitude at the inefficiency and high-handedness of the executive and the police, of his stern,, un-bending independence and his uncompromising and absolutely fearless nature." বলা বাহুল্য, ট্রাইবুন্যালের রায় সর্ববাদীসম্মত হয়েছিল।

অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে শাঁখারীটোলা পোস্ট অফিস খুনের মামলায় আশুতোষ যে রায় দিয়েছিলেন তা তঁার অনেক প্রসিদ্ধ রায়ের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। আইনশাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য কি বিশাল এবং গভীর ছিল তার অভ্রান্ত প্রমাণ বহন করে এই মামলায় প্রদত্ত রায়টি। সমসাময়িক কালে ইহা জনসাধারণের মনে যে কী পরিমাণ আগ্রহের সঞ্চার করেছিল তার স্মৃতি বোধহয় আজো অনেকের মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। এই রায়ে কেবল যে তাঁর পাণ্ডিত্য প্রকাশ পেয়েছিল তা নয়, সেইসঙ্গে তিনি অনন্যলব্ধ নির্ভীকতার পরিচয়ও প্রদান করেছিলেন। বিচারক, অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং আসামীপক্ষের কৌঁসুলী—প্রত্যেকের আচরণের তিনি কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। হাইকোর্টের নথীপত্রে শাঁখারীটোলা পোস্ট অফিস খুনের এই বিখ্যাত মামলাটি "সম্রাট বনাম বরেন্দ্রকুমার ঘোষ' এই নামেই পরিচিত হয়। আসামী একজন সদ্য বিবাহিত অল্পবয়স্ক তরুণ ছিল, তার বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ আনা হয় যে সে রিভলভার দ্বারা শাঁখারীটোলা ডাকঘরের পোস্টমাস্টারকে খুন করেছে; একা খুন করেনি, তার সঙ্গে অজ্ঞাতপরিচয় আরো তিন-চারজন লোক ছিল। আসামীকে হাইকোর্ট সেসনে সোপর্দ করা হয় এবং বিচারপতি পেজের এজলাসে এই মামলার বিচার আরম্ভ হয়। বিচারে আসামীর প্রাণদণ্ড হয়। বিচার আরম্ভ হওয়ার আগে আসামী পক্ষের কৌঁসুলী জজের খাসকামরায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করেন। কৌঁসুলী তাঁকে বলেন যে, তাঁদের বিবেচনায় এই মামলাটি কঠিন এবং জিজ্ঞাসা করেন যে যদি আসামী প্রধান অভিযোগ স্বীকার করে তা হোলে তিনি তার সম্পর্কে একটু সদয় ভাব প্রদর্শন করবেন কি না। বিচারপতি বিশেষ কোনো ভরসা দিতে পারেন না অথবা বিচারে তিনি কি রকম attitude নেবেন তা বলতে পারেন না।

অতঃপর মামলাটির পুনর্বিবেচনার জন্য Letters Patent-এর ২৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী অ্যাডভোকেট জেনারেলের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নেওয়া হয় এবং হাইকোর্টের একটি ফুলবেঞ্চে পুনর্বিবেচনার দরখাস্তের শুনানী হয়। এই ফুলবেঞ্চের সভাপতি ছিলেন আশুতোষ। তিনি একটি সুদীর্ঘ রায় দিলেন। এই রায়ের সম্পর্কে তাঁর এক জীবনীকার এই মন্তব্যটি করেছেন: "This last

and most remarkable judgment of Sir Asutosh reveals at once the judge, the jurist and the man in the proper perspective. As a Judge he was bound to move within the four corners of Law, as a jurist he outstript its narrow limits, but went far beyond the four corners of Law—the particular Indian Law that it was his duty to abide by—and investigated into the sources and precedents, instituting comparisons and analogies from far and near ; in a comprehensive survey and critical review of these, he not only took cognizance of the relevent judgments and findings of all the High Courts and Chief Courts of India and Burma, but of those of British and American Courts. And he did not even stop there, he went so far as to offer his comments and criticisms on the important provisons and procedure of law as it stands at present."

আশুতোষ কিন্তু এই করেই নিরস্ত হননি। এই মামলায় যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের আচরণের তিনি কঠোর সমালোচনা করেন। অ্যাডভোকেট জেনারেল পর্যন্ত রেহাই পান নি। ইনি ইংরেজ ছিলেন এবং হাইকোর্টে একদা তাঁরই সতীর্থ ছিলেন। তাঁর এই সমালোচনাকে 'স্টেটস্‌ম্যানের' মত কাগজ 'Strict, striking, dignified and impartial' বলে অভিহিত করেছিল। বিচারক আশুতোষকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন মানুষ আশুতোষ এবং সেই সমালোচনা পাঠ করে সবাই বুঝেছিল কি উপাদান দিয়ে গঠিত ছিলেন মানুষ আশুতোষ। যাঁরাই তাঁর এই সুবিখ্যাত রায়টি পাঠ করেছেন তাঁরাই জানেন যে উচ্চপদস্থ ও সম্মানিত ব্যক্তির প্রতি ন্যায়বিচার প্রদর্শনে তিনি যেমন উদার ছিলেন, তেমনি তাঁদের অন্যায় আচরণের সমালোচনা করতেও তিনি কুণ্ঠিত হতেন না। আশুতোষের সেই সমালোচনার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম :

"This much appears to me to be incontestable that it is

not the duty of the defending Counsel to approach the trial judge and to apprise him that in his opinion the man whose fate has been entrusted to his care has no defence to make. I venture to add, that if, as trial Judge, I had been placed in such predicament, I would, without hesitations, have reported the Counsel concerned to the Chief Justice, for disciplinary action, and would have asked to be relieved of the duty of participating in the trial and in passing sentence upon a man whose Counsel has previously assured me that there was no defence to make ..The fact remains that statements were made in the petition presented to the Advocate General, which are either inaccurate or are not supported by the evidence on record.. in my view, the certificate of the Advocate General granted under clause 26 of the Letters Patent should be granted after he has heard the representatives of the petitoner and of the Crown and has carefully considered all the available materials whose accuracy has been verified by Counsel or other responsible persons. If this course has been pursued in the present case before the certificate was granted, there would have been no occasion for an unseemly dispute as to the weight to be attached to the certificate."

এই মামলায় আশুতোষের সুদীর্ঘ রায়ের সর্বপ্রধান অংশ ছিল যেখানে তিনি ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৪ নং ধারাটি সম্পর্কে সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম বিচার ও বিশ্লেষণ করেন। সকলেই জানেন, এই বিচার ও বিশ্লেষণ অদ্যাবধি একটি অতুলনীয় দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। বিচারপতি পেজ এই ধারাটির ব্যাখ্যান ও বিশ্লেষণে একটা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন। মামলার পুনর্বিচারের আবেদন তো অগ্রাহ্যই হয় এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির এই ৩৪ নং ধারার কি

প্রকৃত তাৎপর্য সেইটিই আশুতোষের রায়ে চিরকালের মত ব্যাখ্যাত হয়েছিল সেদিন।

ব্যবহারশাস্ত্রে এমন প্রতিভা পরবর্তীকালে আর দেখা যায়নি। তাঁর সুদীর্ঘকালব্যাপী বিচারপতি-জীবনে আশুতোষ যেসব মামলায় রায় দিয়েছেন, তার প্রত্যেকটিতে যে পরিমাণ পাণ্ডিত্য, প্রখর বুদ্ধি ও ন্যায়বিচারের প্রতি ঐকান্তিক ইচ্ছা অভিব্যক্ত হয়েছে, তা পৃথিবীর সমস্ত বিচারশালার নজীর-স্বরূপ অবলম্বনীয়। এ অভিমত প্রকাশ করেছেন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণ। ১৯২৩, ২১ শে ডিসেম্বর। হাইকোর্টের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করলেন আশুতোষ। এই উপলক্ষে এক বিদায় অভিনন্দনের ব্যবস্থা হয়। প্রধান বিচারপতির কক্ষে এই অনুষ্ঠান হয়েছিল। হাইকোর্টে যাঁরা তাঁর সতীর্থ ছিলেন তাঁরা সকলেই এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন; আইনজীবিগণ এবং শহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন। সকল দিক দিয়েই ইহা সেদিন একটি অতুলনীয় বিদায়সভা হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। ব্যবহারজীবী সমিতির (Vakils Association) পক্ষ থেকে সভাপতি বসন্তকুমার বসু তাঁর ভাষণে বলেছিলেন: "Your career as a Judge has been characterised throughout by profound learning, great ability, marked independence, unerring patience and uniform courtesy." অ্যাডভোকেট জেনারেল বি এল. মিত্র বলেছিলেন: "In the maze and labyrinth of adjudged cases, you ever walked with a firm step, holding aloft the torch of justice." প্রধান বিচারপতি স্যাণ্ডার্সন সতীর্থগণের পক্ষে বললেন: "Sir Asutosh has been an outstanding personality not only in the Court but also in Bengal and I think I may say with propriety that his name has been known and his influence felt throughout the whole of India."

জজিয়তি থেকে স্যর আশুতোষের অবসর গ্রহণ উপলক্ষে *Indian Daily News* পত্রিকায় (২২শে ডিসেম্বর, ১৯২৩) যে সম্পাদকীয় নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল তারো কয়েকটি লাইন এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য। উক্ত সম্পাদয়কীয়তে বলা হয়েছিল: "Sir Asutosh as a Judge ceases to exist from

today but his great work on the Bench will endure for ever. If it is true that Judge-made law is, after all, the best law, Sir Asutosh's contributions in this respect have been simply invaluable." দেশবন্ধুর *Forward* পত্রিকায় লেখা হয়েছিল : "Between them (Sir Rash Behari, his guru and Sir Asutosh) they have fully maintained the premier position of Bengal in the intellectual aristocracy of India. A walking encyclopaedia of legal knowledge, Sir Asutosh combine in him all the qualities that go to make a great Judge···He never allowed himself to forget that the spirit of the law is greater than the letter of it and justice divorced from equity is no justice at all." যোগেশ চৌধুরীর 'ক্যালকাটা উইকলি নোটস' পত্রিকাতেও আশুতোষকে ভারতবর্ষের বিচারপতিদের অগ্রগণ্য বলা হয়েছিল।

বস্তুত সেদিন হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে আশুতোষ ন্যায়ের মহিমাকে স্বীয় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও সদ্বিবেচনার দ্বারা যেভাবে মহিমান্বিত করে গিয়েছেন, আইনের কূট মীমাংসায় যে অপূর্ব ধীশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, তার প্রতিক্রিয়া সমকালীন বাঙালী সমাজে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার রূপে যেমন, হাইকোর্টের বিচারপতিরূপেও তেমনি তিনি যে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন শুধু তাই নয়, সেইসঙ্গে বাংলার intellectual life-কে তিনি যে কি পরিমাণে উন্নত এবং সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন, বাঙালীর intellectual আভিজাত্যকে তিনি কি নূতন ব্যঞ্জনা দিয়েছিলেন—সেইসব কথা যখন আমরা একবার স্মরণ করি এবং আলোচনা করি তখন বুঝতে পারি আশুতোষ বাঙালীর কী ছিলেন, আর বাংলার কতখানি ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর দেখা গিয়েছিল যে সমগ্র বাংলা তাঁর নেতৃত্ব আকাঙ্ক্ষা করেছে।

॥ বারো ॥

ইংরেজিতে যাকে বলে 'Intellectual giant', আশুতোষ ছিলেন সেই শ্রেণীর একজন বিরাট প্রতিভাধর পুরুষ। বস্তুত তাঁর সমকালীন বাংলা তথা ভারতবর্ষে তাঁর তুল্য প্রতিভাবান ব্যক্তি আর কেউ ছিলেন কি না সন্দেহ। আমার এই মন্তব্যকে কেউ যেন অত্যুক্তি মনে না করেন এবং আশুতোষ যে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা প্রতিভাশালী ছিলেন, আমার এই মন্তব্যের মধ্যে আমি সেরূপ কোনো ইঙ্গিত করছি না। তেমন ইঙ্গিত করার হেতুও নেই। রবীন্দ্র-প্রতিভা, বা জগদীশচন্দ্র কিম্বা প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিভা অথবা আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বহুভাষাবিদ্ হরিনাথ দে ও চন্দ্রশেখর রমণ প্রভৃতির প্রতিভা আর আশুতোষের প্রতিভা ঠিক সমগোত্রীয় নয়। এঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে যে প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন তা নিঃসন্দেহে জাতির চিরকালের গর্বের জিনিস হয়ে থাকবে। এঁদের প্রতিভার সঙ্গে আশুতোষের প্রতিভার একটা মূল পার্থক্য এই ছিল যে, এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন এক-একটি ক্ষেত্রে দিক্‌পাল আর আশুতোষ ছিলেন সত্যই একজন 'ইনটেলেকচুয়াল জায়াণ্ট।' সাধারণ লোকের পক্ষে তো বটেই, এমন কি অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষেও আশুতোষের গগনস্পর্শী প্রতিভার পরিমাপ করা নিতান্তই দুঃসাধ্য। এই প্রতিভার একটা লক্ষণ এই ছিল যে তিনি তাঁর সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন—"he was much ahead of his time" এবং বর্তমান কালকে দূর-দূরান্ত কালের মধ্যে সম্প্রসারিত করে দেওয়া একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল।

শিক্ষার কথাটাই ধরা যাক না। "শিক্ষা—শিক্ষা—শিক্ষাই ছিল তাঁর মূলমন্ত্র। কেমন করিয়া আমাদের দেশের সর্বত্র জ্ঞান-বিস্তার হয়, সুদূর পল্লীর নিভৃত কুটীরের দীন কৃষকও শিক্ষালাভ করে, ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র সাধনা।" ঢাকা জগন্নাথ কলেজের সেক্রেটারি চন্দ্রকুমার দত্ত একবার

আশুতোষকে পাশের হার কমিয়ে দেওয়ার কথা বলেছিলেন। "পাশ না কমালে ত আর রক্ষা নেই"—বলেছিলেন তিনি। এর উত্তরে সেদিন আশুতোষ তাঁকে বলেছিলেন ; "দশটা কলেজ করুন না। আমি চাই দেশে শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ুক ; ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করেনি, বাংলা দেশে এমন কেউ যেন না থাকে। আমাদের দেশের ঘরে-ঘরে, পল্লীতে-পল্লীতে শিক্ষা বিস্তার করতে হবে।"

"শিক্ষা বিস্তার করতে হবে"—এই যে চিন্তা, এ বড়ো সহজ চিন্তা নয়। দূর কালকে কত পরিষ্কারভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারলে এই কথা ভাবা যায় এবং বলা যায়, তা আমরা একমাত্র আশুতোষের মধ্যেই পাই। তিনি যে একজন প্রতিভাধর পুরুষ ছিলেন, তার এই একটা নজীর। রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটি মনে পড়ে—

চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণ-তলে দিবস-শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি'
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎস-মুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়।

তিনি যদি সত্যই একজন প্রতিভাধর পুরুষ না হোতেন, তাহলে আশুতোষের কল্পনা কখনই এইরকম ভাব নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনকার্যে প্রযুক্ত হোত না। সকলেই জানেন তিনি এই বিদ্যাপীঠে এসে জ্ঞানানুশীলন করার জন্য পৃথিবীর সর্বজাতিকে আহ্বান করেছিলেন এবং এই দেশের ছাত্রদের মধ্যে নানাবিষয়ের জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি নানা দেশীয় অধ্যাপক নিযুক্ত করেছিলেন। দেশ-বিদেশের সুধিগণ আশুতোষের নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে এখানে এসেছিলেন—সে ইতিহাস তো সেদিনের কথা। সেদিনের সেই মহামিলনের একটি সুন্দর চিত্র দিয়েছেন দীনেশচন্দ্র সেন। তিনি লিখেছেন : "একদিকে অধ্যাপকগণের মধ্যে জাপানী, চৈনিক, দ্রাবিড়ী, সিংহলীয়, মারহাট্টা, তিব্বতীয় প্রভৃতি নানাদিগদেশাগত পণ্ডিতেরা তো

আমাদের বিদ্যাপীঠ অবিরত কলরবে মুখরিত করিতেছেন। কনভোকেশনের সময় সে কি দৃশ্য! কাহারও উষ্ণীষে রামধনুর বর্ণ খেলিতেছে, কাহারও কৃষ্ণটুপি মন্দিরের চূড়ার মতো উঁচু হইয়া আছে, একদিকে পার্বত্যলামার রোমাকৃত শিরোভূষণের পার্শ্বদেশ চুম্বন করিয়া সিরাজাগত মৌলভির প্রকাণ্ড পাগড়ির স্বর্ণখচিত রেখাগুলি দেখা যাইতেছে।"

এই যে এত বিচিত্র রকমের ও এত বিভিন্ন দেশের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিকে আকর্ষণ করা—একমাত্র প্রতিভাধর ব্যক্তি ভিন্ন আর কারো পক্ষে কি তা সম্ভব? তাঁর পূর্বে ও পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন বহু গুণী এবং যোগ্য ব্যক্তি—কিন্তু তাঁব উত্তুঙ্গতাকে আজ পর্যন্ত কেউ কি স্পর্শ করতে পেরেছেন? এই প্রসঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখেছেন: "আশুতোষেব পূর্বে আরো দু'চারজন বাঙালী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই এমন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তিনি কর্মী ছিলেন—কাল্পনিক ছিলেন না। তাঁহার দৃষ্টি শুধু সম্মুখেই ছিল না, বহুদূরে ছিল। আলোক যেমন পলক মধ্যে নিবিড় অন্ধকারকে দূর করিয়া দিয়া সম্মুখের দিকটা দীপ্ত করিয়া তোলে তেমনি আশুতোষের দৃষ্টি—কোন সুদূর ভবিষ্যতের প্রতি নিবদ্ধ রাখিয়া ধীরে ধীরে গঠনকার্যে নিয়ত থাকিত। বহুদূর ভবিষ্যতের অন্ধ জগৎও সে দীপ্ত মহিমার আলোকে আলোকিত হইয়াছিল।"

এ হেন ব্যক্তি যদি প্রতিভাধর বলে সম্পূজিত এবং স্বীকৃত না হন তবে সে গৌরব আর কার প্রাপ্য?

আশুতোষেব প্রতিভার অন্যদিকও আছে। প্রচণ্ড কর্মীপুরুষ ছিলেন তিনি। বিচারপতি র‍্যাঙ্কিন (ইনি হাইকোর্টে আশুতোষের একজন সতীর্থ ছিলেন) বলেছিলেন: "The daily out turn of Sir Asutosh's work was a moral to others, to one and all." ইংরেজিতে একটা কথা আছে 'man of action'—এই কথাটির নিগূঢ় মর্ম যাঁরা উপলব্ধি করেছেন তাঁরাই বুঝবেন যে কর্মীপুরুষ হওয়া বড়ো সহজ কথা নয়। আশুতোষের কর্মস্পৃহা ও

কর্মোদ্যম দেখে সাধারণ লোক রীতিমত বিস্মিত হোত। নানা বিচিত্র ও দীর্ঘকালস্থায়ী কর্মের মধ্যে তিনি সর্বদা ডুবে থাকতেন—আক্ষরিক অর্থে ডুবে থাকতেন। যাঁরা না দেখেছেন তাঁরা কিছুতেই ধারণা করতে পারবেন না আশুতোষের কর্মের বহুমুখীনতা, ব্যাপকতা এবং জটিলতা কি রকম ছিল। কর্মের ও ইচ্ছাশক্তির তিনি যেন একটি অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিলেন। দীনেশচন্দ্র সত্যই বলেছেন :

"নিবিড় কর্ম-স্রোতের মধ্যে তাঁহার বৃথা অপব্যয় করিবার মত তিলমাত্র সময় ছিল না। অথচ প্রত্যহ প্রায় অর্ধশত লোক তাঁহার রসারোডের বাড়ির বাহিরের ঘরটার বারান্দায় অপেক্ষা করিত। কোন কার্ড দিয়া কাহাকেও ঢুকিতে হইত না। ধনী, দরিদ্র, সাহেব, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, রাজা, মহারাজা প্রভৃতি অনেকেই যাইতেন—এই দর্শন-উৎসবে কাণা, খোঁড়া, গরীব ও সচ্ছল অবস্থার লোকের কোন ভেদ ছিল না। আশুবাবু বাহিরের ঘরটায় ঢুকিয়াই যাঁহারা আসিয়াছেন, তাহাদের সকলের উপর একবার চক্ষু বুলাইয়া লইতেন ; তারপর বড় চেয়ারে বসিতেন। যাঁহাদের সঙ্গে একটু বেশি কথা কওয়ার দরকার, তাঁহাদিগের প্রতি প্রথমত মনোযোগ দিতেন না। অতি বিশিষ্ট ব্যক্তি হইলে নিভৃতে লইয়া গিয়া আলাপের পর তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিতেন। কিন্তু কাহারো সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা কহিবার প্রয়োজন হইত না, ঠিক কাজের কথা জানিতে চাহিতেন, দীর্ঘ প্রস্তাবের সুযোগ দিতেন না। তারপর এক-একটি লোককে তাহার বড় চেয়ারটার কাছে ডাকিয়া আনিতেন এবং দুই-এক মিনিট মধ্যে ঠিক কাজের কথা শুনিয়া তাঁহার সংক্ষিপ্ত ও একান্ত বাহুল্য-বর্জিত উত্তর দিয়া তাহাকে বিদায় দিতেন। এইভাবে এক-একটি করিয়া সকলের কথা শুনিতেন এবং সকলেরই কথার জবাব দিয়া তাহাদের যাত্রা সার্থক করিতেন। কেহ এমন কিছু বলিবার সুবিধা পাইতেন না যে, আজ বড় ভিড়, কোন কথা পাড়িবার সুযোগ হইল না। তাঁহার গৃহটি ঠিক কর্মক্ষেত্র ছিল—উহা বাজে কাজে বা বাজে কথার আড্ডা ছিল না।…বড় চেয়ারটার এত কাছে এবং এত মৃদু স্বরে কথা বলিতেন যে, একজনের সঙ্গে কি কথা হইল, তাহা অপরে জানিতে পারিত না। এইভাবে এতবড় ভিড় তিনি সামলাইয়া লইতেন। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তির গুণে তিনি এত

লোকের মধ্যে একটি লোকেরও কথা ভুলিয়া যাইতেন না, যাহাকে যাহা বলিতেন, ঠিক সময়ে ঠিক তাহা করিতেন—তাঁহার কথা অব্যর্থ ছিল। তাঁহাকে কখনো বলিতে শুনি নাই, 'মহাশয়, আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, আর একদিন আসিবেন।' যিনি কর্মের মধ্যে একরূপ ডুবিয়াই থাকিতেন, তিনি কতই না অজুহাত দিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সেরূপ অজুহাত দিয়া প্রার্থীদিগকে কখনো দ্বিধার মধ্যে রাখিয়া প্রতারিত করিতেন না। মিষ্ট কথা ও ছদ্মবেশী সৌজন্য অপেক্ষা এই আপাত কঠোর অথচ প্রকৃত হিতেচ্ছা ও স্পষ্ট কথার মূল্য যে কত বেশি, তাহা ভুক্তভোগীরা সহজেই বুঝিবেন।"

এইখানে আশুতোষের যে চিত্র আমরা পাই তা একজন প্রথম শ্রেণীর ইনটেলেকচুয়ালের নিখুঁত আলেখ্য। এমন প্রতিভা কয়জন দেখাতে পেরেছেন? রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, রমেশচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথের পর বাংলার আর কোন্ জননায়ক সম্পর্কে আমরা এই ধারণা করতে পারি? এই আশুতোষের কথা যখন আমরা স্মরণ করি তখন আমরা এই কথা স্বীকার না করে পারি না যে, "In the inner depths of the towering personality and hero of incessant action that Sir Asutosh was, in the man of many-sided activities and varied interests, in the prominent public man and complex character, lived the intellectual giant and profound thinker, the lifelong devotee of knowledge and seeker of Truth." বস্তুত জ্ঞান-তাপস এবং সত্যান্বেষী ব্যক্তি ভিন্ন আর কারো পক্ষেই যথার্থ প্রতিভাধর পুরুষ হওয়া সাজে না।

আশুতোষের প্রতিভার একটা বিশেষত্ব এই ছিল যে তিনি জীবনের আরম্ভ থেকেই জ্ঞানার্জনে সমুৎসুক ছিলেন। বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়েই তাঁর আশ্চর্য দখল ছিল। তাঁর রসারোডের বাড়িতে তাঁর বিরাট গ্রন্থাগারটি দেখবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল, তাঁরাই জানেন, পৃথিবীর সম্ভাব্য সকল বিষয় সম্পর্কিত এমন মূল্যবান সংগ্রহ কোনো সাধারণ পাঠাগারেও বিরল। পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের এই লাইব্রেরি নিতান্ত লোক-দেখানো জিনিস

ছিল না, আশুতোষের মন সর্বদা এই বিরাট গ্রন্থাগারের সর্বত্র স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতো—কোথায় কোন বইটা আছে, তা নির্দেশ করতে তাঁর ক্ষণমাত্র বিলম্ব হোত না। তাঁর এক জীবনীকার লিখেছেন: "The range of his reading, the extent of his studies and the variety of his cultural tastes and interests were greater than almost all other men of his generation." তিনি যথার্থই জ্ঞান-বারিধি ছিলেন। ভাষাবিদও ছিলেন। ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত ও পালি ভিন্ন তিনি ফরাসী, জার্মান, আরবী ও পারসিক ভাষাও অনেকখানি আয়ত্ত করেছিলেন। প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র, হিন্দুর ষড়্ দর্শন—সংস্কৃত ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কাব্য ও নাটক তিনি যে কোনো বিষয়ে যেমন অধ্যয়ন করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি বিজ্ঞান জগতের আধুনিকতম আবিষ্কার সম্বন্ধেও তাঁর জ্ঞান নিতান্ত কম ছিল না। পল্লবগ্রাহী পাণ্ডিত্য নয়—যে কোনো বিষয়ে যথার্থ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যই আশুতোষের প্রতিভাকে একটা স্বতন্ত্র মহিমা দিয়েছিল। দীনেশচন্দ্র লিখেছেন: "তাঁহার গ্রন্থাগারে সর্ববিষয়ে এত অধিক পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছিল যে, অধ্যয়নের তপস্যাসিদ্ধির সমস্ত উপকরণই তাহাতে সঞ্চিত ছিল। বাস্তবিকপক্ষে আশুতোষের গৃহের বিরাট গ্রন্থাগার তাঁহার জ্ঞানের বিশালতা ও ঐকান্তিক পাঠানুরক্তিরই প্রতীক স্বরূপ।"

পার্শী পণ্ডিত ডক্টর তারাপুরওয়ালা* আশুতোষের আহ্বানে বোম্বাই থেকে কলিকাতায় এসে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছিলেন। আশুতোষের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবার সুযোগ হয়েছিল তাঁর। তিনি লিখেছেন: "The thing that struck one most in Sir Asutosh was his vast intellect as well as his imagination. There were few subjects taught in this University about which he did not know more than an average professor while in some subject his knowledge was profound . He used to set papers, along

---

* ডক্টর আই. জে. এস. তারাপুরওয়ালা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন। ইঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে *Introduction to the Science Language* বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয়।

with others—for almost all the University examinations ; he would also correct or modify the papers prepared by others in such diverse subjects as Mathematics, Physics, Economics, English, Sanskrit, Bengalee, Pali, History, Anthropology, Philosophy etc. He would even adjudge thesis for the degree of Doctor of Science and Philosophy and of P. R. Studentship—the blue ribbon of the University."

অনুরূপ সাক্ষ্য আর একজন দিয়েছেন। তিনি বিশিষ্ট গাণিতিক, এ. সি. বসু (ইনি কিছুকাল কণ্ট্রোলার অব এগজামিনেশন ছিলেন) তিনি লিখেছেন : "প্রবেশিকা, ইণ্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী পরীক্ষার জন্য স্যর আশুতোষ যেসব প্রশ্নপত্র তৈরি করতেন তাহাই আদর্শ প্রশ্নপত্র। সময়ে সময়ে বহুবিধ কর্মের মধ্যেও তিনি P.R.S-এর থিসিস ও অন্যান্য থিসিস বিচার করবার মতো কঠিন ও দায়িত্বজনক কাজও স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতেন। কিন্তু কেবলমাত্র গণিতশাস্ত্র অথবা বিজ্ঞানচর্চাতেই তিনি আনন্দ পেতেন না; সংস্কৃত এবং অন্যান্য ভাষা, ইতিহাস, দর্শন, নৃ-তত্ত্ব, সাহিত্য, অর্থনীতি, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়েও তাঁর অনুরাগ ও অধিকার দেখে আমরা বিস্মিত হতাম। এর অনেকগুলি বিষয়েই তিনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যব্যপদেশে আমাকে মধ্যে মধ্যে স্যর আশুতোষের বাড়িতে যেতে হোত। একবার গিয়ে দেখি আইন সংক্রান্ত স্তূপাকার বইয়ের মধ্যে তিনি বসে আছেন এবং একটি রায় সম্পর্কে dictation দিচ্ছেন। যে মুহূর্তে সেই কাজটা শেষ হোয়ে গেল, অমনি তিনি আমার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে তন্ময় হয়ে গেলেন। অল্প সময়ের ব্যবধানে এই দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত ধরণের কাজ একমাত্র তাঁর পক্ষেই করা সম্ভব ছিল, অন্যের পক্ষে নয়। স্কুলের পরীক্ষা থেকে আরম্ভ করে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের পরীক্ষা পর্যন্ত সকল বিষয়ে তাঁর অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত, মনের স্বচ্ছতা, যুক্তির দৃঢ়তা এবং সকল বিষয় বুঝবার ক্ষমতা দেখে আমাদের কেবলই মনে হোত—আশুতোষের তুলনা আশুতোষ।"

নানা দুর্লভ উপাধিতে ভূষিত আশুতোষের সম্পূর্ণ নামটি লিখলে এই রকম দাঁড়ায়:

The Hon'ble Justice Sir Asutosh Mookerjee, Saraswati, Satravachaspati, Sambuddhagamchakravarti, Kt., C.S.I., M.A., D.L., D.Sc., Ph.D., F.R.A.S., F.R.S.E.

একটি মানুষের নামকে এতগুলি উপাধি ভূষিত করেছে এইটিই তো আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত অনন্যসাধারণ হোয়ে আছে। এই উপাধিগুলির মাধ্য রাজদত্ত হোল 'নাইট', ও 'সি. এস. আই'; বিশ্ববিদ্যালয়লব্ধ 'এম. এ, ডি. এল.'; বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত—'ডি.এসসি', 'পি এইচ ডি' (Honoris Causa); বিলাতের বিজ্ঞান সভা-প্রদত্ত—'এফ আর.এ এস'. এবং 'এফ আর. এস ই'; নবদ্বীপ ও ঢাকা সারস্বত পণ্ডিতসমাজ-প্রদত্ত—'সরস্বতী' ও 'শাস্ত্রবাচস্পতি' আব নিখিল ভারত বৌদ্ধসংঘ-প্রদত্ত—'সম্বুদ্ধাগমচক্রবর্তী'। পিতা গঙ্গাপ্রসাদের প্রতিভা যেমন ছিল বিচিত্রমুখী, পুত্র আশুতোষের প্রতিভাও তেমনি ছিল বহুমুখী; তাঁর প্রতিভার গতিপথ কোনো একটি ক্ষেত্রে আবদ্ধ ছিল না। এই যে সর্বতোমুখী মনস্বিতা—ইহাই তো আশুতোষকে একজন বিরাট প্রতিভাধর ব্যক্তি হিসাবে গড়ে তুলেছিল। বিলাত না গিয়েও তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা ও পাণ্ডিত্যের যশ সর্বদেশে ব্যাপ্ত ছিল। এই প্রতিভাই একদিন সারা ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতিভাবান্‌দের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাদপীঠে আকষণ করেছিল। তাঁর মধ্যে এই প্রতিভা ছিল বলেই না আশুতোষ যার মধ্যে কোনো অসাধারণ গুণ আবিষ্কার করতেন তাকে তাঁর কিছুই অদেয় থাকত না। তাঁর জীবনে এর বহু দৃষ্টান্ত আছে। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করব।

দীনেশচন্দ্র লিখেছেন: "হরিনাথ দে যখন বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন তখন তাঁহার বহু ভাষার উপর বিস্ময়কর অধিকার এবং অদ্ভুত পাণ্ডিত্য আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। এইরূপ গুণী ব্যক্তিকে পাইয়া আশুবাবুর আনন্দের অবধি রহিল না। সর্ববিষয়ে তিনি হরিনাথকে স্মরণ করিতেন; অত্যল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার পদোন্নতি করিয়া দিয়া তিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করিলেন। হরিনাথের সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিত, আশুবাবু তাহা

গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি শুধু দেখিতেন হরিনাথের প্রতিভা, তাঁহার ল্যাটিন, গ্রীক প্রভৃতি ভাষায় আশ্চর্য দখল। তাঁহার ল্যাটিনে লেখা কবিতা লইয়া তিনি গৌরব করিতেন,—ল্যাটিনের মত কঠিন বিদেশী প্রাচীন ভাষায় কবিতা লিখিয়া হরিনাথ য়ুরোপে যশঃ অর্জন করিয়াছিলেন। শকুন্তলার এমন সুন্দর ইংরাজি অনুবাদ করিয়াছিলেন, যাহা তাঁহার সহাধ্যায়ী ইংরাজ পণ্ডিতদেরও লেখা দুঃসাধ্য। এই গুণে আশুতোষ হরিনাথকে ভালবাসিতেন।”

আশুতোষের intellect বুঝতে হোলে তাঁর কনভোকেশন বক্তৃতা এবং মহীশূর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত অন্যান্য বক্তৃতাগুলি যত্নের সঙ্গে পাঠ করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানত স্নাতকদের উদ্দেশে প্রদত্ত উপাচার্যের বক্তৃতা নিতান্ত নীরস এবং মামুলি জিনিস—ইহাই এতকাল লোকের ধারণা ছিল। আশুতোষ সেই ধারণার পরিবর্তন সাধন করলেন। তাঁর কনভোকেশন বক্তৃতা একাধারে সাহিত্য এবং তথ্যের আকর। কেউ কেউ বলেছেন এই বক্তৃতাগুলি বক্তৃতামাত্র নয়—revelations ; সত্যই তাই। ভাষার উপর স্বচ্ছন্দ অধিকার, ভাবপ্রকাশের রীতি, মার্জিত শব্দ নির্বাচনের ক্ষমতা এবং সর্বোপরি সুমহৎ আইডিয়া—এইসব বিবিধ দুর্লভ গুণের সমাবেশে আশুতোষের কনভোকেশন বক্তৃতাগুলি একটি চিরস্থায়ী মূল্য অর্জন করেছে। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মনীষার প্রতিফলন থাকত এই বক্তৃতাগুলির মধ্যে। এর কিছু দৃষ্টান্ত আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এখানে এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রদত্ত দুইটি বক্তৃতার কিছু অংশের উদ্ধৃতি দিলাম। ভারতবর্ষ তথা সমগ্র এশিয়ার এই বিখ্যাত বিদ্বদ্‌সভার তিনি তিনবার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। ১৯০৭-১৯০৯, এই দুই বছরে দুইবার এবং ১৯২১ সালে তৃতীয়বারের জন্য তিনি সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ইতিপূর্বে এতবড় সম্মান আর কেউ লাভ করেন নি। এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নালে তাঁর ছাত্রজীবনের গণিত-সংক্রান্ত মৌলিক গবেষণামূলক কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রাচ্যবিদ্যার কেন্দ্রস্বরূপ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি তিনি গভীর অনুরাগ পোষণ করতেন এবং তাঁরই উদ্যোগে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে বহু পুঁথি সংগ্রহপূর্বক সোসাইটির গ্রন্থশালা সমৃদ্ধ করেছিলেন। সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেছেন : “সোসাইটির বহুমুখী গবেষণা কার্যে আশুতোষ

যেমন উৎসাহ দেখাতেন তেমনি গবেষকদিগের অনুশীলন কাজ যাতে অব্যাহতভাবে চলতে পারে সেদিকেও তিনি সর্বদা দৃষ্টি রাখতেন।" অনুরূপ সাক্ষ্য রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও দিয়েছেন।

১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে স্যর উইলিয়ম জোন্স যখন এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন তখন থেকে বাংলা তথা ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের বিকাশে, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধারে, এর প্রাচীন ইতিহাসের পুনর্বিন্যাস সাধনে এই বিদ্বদ্‌সভাটি পরোক্ষভাবে যে প্রেরণা জুগিয়ে এসেছে, আশুতোষ সম্যকরূপেই তার মূল্য বুঝতেন। পরবর্তীকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও এশিয়াটিক সোসাইটির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনে আশুতোষের প্রয়াস স্মর্তব্য। ১৯০৯ সালে সোসাইটির বার্ষিক সভায় প্রদত্ত তাঁর সভাপতির ভাষণের উপসংহারে আশুতোষ বলেছিলেন: "Let us not forget the eloquent words of our illustrious founder that the Society will flourish if naturalists, chemists, antiquarians, philolosophers and men of science will commit their observations to writing and send them to the Asiatic Society; it will languish if such communications shall be long intermitted, and it will die away if they shall entirely cease. Let us take note of this emphatic warning. Let us remember that arrested development forebodes decay. Let us therefore draw within our ranks all devoted investigators of Man and Nature in this continent, and with their cooperation, let us march on in the path of progress." আশুতোষ জানতেন অনুশীলনের ক্ষেত্র সুবিস্তৃত, গবেষণার শেষ নেই। তাই দেখতে পাই সোসাইটিতে প্রদত্ত ১৯১১ সালের বক্তৃতায় নবীনদের এইদিকে আহ্বান করে তিনি বলেছিলেন: "The objects of this Society is to extend the bounds of knowledge in various departments of intellectual activity and I hope that the younger members of our Society will feel convinced that the field of research they have just

entered is boundless, and that the toiler is likely to be rewarded in the future by as rich and varied a harvest as ever fell to the lot of our predecessors,"

এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার একশত বছর পরে জাতির জীবনে এই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব আশুতোষের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল বলেই না তিনি এই প্রতিষ্ঠানের মঞ্চ থেকে বহুবার এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করতেন—অনুশীলন এবং গবেষণা যেন কখনো বন্ধ না হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিবিধানে তিনি যেমন তাঁর সমগ্র প্রতিভা নিয়োগ করেছিলেন, তেমনি দেখা যায় যে সোসাইটির কর্মধারা যাতে অব্যাহতভাবে চলতে থাকে সেজন্যও তিনি যথেষ্ট চিন্তা করতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি যেমন সুদীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন, দেখা যায় যে, এশিয়ার এই সর্ববৃহৎ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গেও আশুতোষ দীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন। উইলিয়ম জোন্স-এর আদর্শের মধ্যে তিনি এইভাবেই একটা নূতন সজীবতা এনে দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিভা ও কর্মপ্রয়াস বিদগ্ধজনের কাছে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

গণিতের প্রতি আশুতোষের আশৈশব অনুরাগ ছিল। তিনি তরুণ বয়সেই গণিত সম্বন্ধে নূতন আবিষ্কার করে গ্রেসায়ার, কেলি প্রভৃতি বিশ্ব-বিশ্রুত পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর তরুণ বয়সের লেখা 'কণিক সেকসন' বহুদিন ফার্স্ট আর্টস্ পরীক্ষার পাঠ্য ছিল। তাঁর জীবনের প্রথম ভালোবাসার বিষয় ছিল গণিতের মতো একটি নীরস বিষয়। রমন-প্রমুখ বিজ্ঞানীদের অভিমত এই যে, আশুতোষ যদি তাঁর সমগ্রজীবন গণিতের চর্চায় অতিবাহিত করতেন, তাহোলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গণিতাচার্যগণের পাশে তিনি অনায়াসে স্থান লাভ করতে পারতেন। রমন তো দুঃখ করে বলেছিলেন: "Bengal in gaining a distinguished judge and a great Vice-Chancellor lost in him a still greater mathematician." এ অনুরাগীর উচ্ছ্বাস বা অত্যুক্তি নয়। গণিতশাস্ত্রে তাঁর প্রতিভা আজ কিম্বদন্তীতে পরিণত হয়েছে। তার এক জীবনীকার লিখেছেন যে, উচ্চতর গণিতের অধ্যয়ন এবং অনুশীলনেই আশুতোষের প্রতিভার সম্যক

স্ফুরণ দেখা যেত। তিনি আরো বলেছেন যে, এই একটিমাত্র বিষয়ে তিনি সেদিন যে সর্বভারতীয় খ্যাতি ও গৌরব অর্জন করেছিলেন তা ভারতের সীমা অতিক্রম করে য়ুরোপ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। তাঁর এই খ্যাতিকে আজ পর্যন্ত কোনো ভারতীয় গণিতজ্ঞই অতিক্রম করতে পারেন নি। এই ক্ষেত্রে তাঁর মৌলিক প্রতিভার যে সামান্য অবদান তিনি রেখে গিয়েছেন তাই তাঁকে তাঁর উত্তরপুরুষের নিকট চিরকালের জন্য একজন প্রধানতম গণিতাচার্য হিসাবে দুর্লভ স্থান প্রদান করবে। ছাত্রজীবনেই তিনি লণ্ডনের বিখ্যাত Mathematical Society-র অন্যতম সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই সম্মান আজ পর্যন্ত আর কোনো ভারতীয় গাণিতিক লাভ করতে পারেন নি। ১৮৮৬ সালে বিলাতের গণিত-সম্পর্কীয় একটি পত্রিকায় (*Quarterly Journal of Pure and Applied Mathematics*) Elliptic functions সম্পর্কে যে বিখ্যাত প্রবন্ধটি তিনি প্রেরণ করেছিলেন সেই প্রবন্ধটি সেখানকার বিশিষ্ট গাণিতিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অধ্যাপক আর্থার কেইলি লিখেছিলেন : "As regards this paper, it is remarkable how is the investigation of Asutosh, a real result has been obtained by the consideration of an imaginary point." তারপর যে বছর তিনি এম এ. পাশ করেন সেই বছরে *Differential Equation of a Trajectory* সম্পর্কে তিনি যে প্রবন্ধটি বিলাতের আর একটি পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন সেটি ইতালির বিখ্যাত গণিতাচার্য মেনার্দির (Prof. Mainardi) দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এই বিষয়টির সর্বপ্রথম সমাধান তিনিই করেন। কিন্তু অনেকের বিবেচনায় উক্ত সমাধান অত্যন্ত জটিল বলে প্রতীয়মান হয়। বিশ্ব-বিখ্যাত গণিতাচার্য ডক্টর এণ্ড্রু ফরসাইথ পর্যন্ত মেনার্দির ঐ সমাধানকে "hopeless and complicated" বলে মন্তব্য করেছিলেন এবং আশুতোষ-প্রদত্ত সমাধানকেই তিনি "elegant" বলে অভিহিত করেন।

গণিত-সম্পর্কীয় যেসব মৌলিক প্রবন্ধের জন্য আশুতোষ আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও সম্মান লাভ করেন তার মোটামুটি তালিকা এই : ১. On a Geometrical Theorem (ইহা 'মেসেঞ্জার অব ম্যাথেমেটিকস' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়) ; ২. Extensions of a Theorem of Salmon's

(উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়); ৩. Note on Elliptic Functions; ৪. Monge's Differential Equations to all Conics (ইহা এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়); ৫. Memoir on Plane Anolytical Geometry (সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়); ৬. On Poisson's Integral (উক্ত জার্নালে প্রকাশিত হয়); ৭. On the Differential Equation of all Parabolas (জার্নালে প্রকাশিত); ৮. Geometric Interpretation of Monge's Differential Equation to all Conics (জার্নালে প্রকাশিত। এই প্রবন্ধটি এডওয়ার্ডের বিখ্যাত *Differential Calculus* গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে); ৯. On a Curve of Aberrancy (জার্নাল); ১০. Application of Gauss's Theory of Curvature to the Evaluation of Double Integrals ইহা লণ্ডনের 'মেসেঞ্জার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়)। এ ছাড়া, বহু বছর ধরে আশুতোষ লণ্ডনের বিখ্যাত *Educational Times* পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। এই পত্রিকায় য়ুরোপের বিশিষ্ট গণিতাচার্যগণ গণিতসম্পর্কে জটিল ও দুরূহ সমস্যা লিখে পাঠাতেন; বছরের পর বছর কেটে যেত, ঐসব সমস্যার অধিকাংশগুলির সমাধান কেউ বড়ো একটা করতে পারতেন না। বহু গাণিতিকের নিকট উক্ত সমস্যাগুলি challenge-স্বরূপ ছিল। আশুতোষ উক্ত পত্রিকায় বহু সমস্যার সমাধান লিখে পাঠাতেন এবং ঐগুলি পাঠ করে ওদেশের গণিতবিশারদগণ রীতিমত বিস্ময় প্রকাশ করতেন। ১৯০৮ সালে আশুতোষের চেষ্টাতেই 'ক্যালকাটা ম্যাথিমেটিকাল সোসাইটি' স্থাপিত হয়। অধ্যাপক সিলভেস্টার গণিতে আশুতোষের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে বিমুগ্ধচিত্তে বলেছিলেন: "ফরাসী, ইতালি, জার্মানি ও ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ গণিতাচার্যগণের পার্শ্বেই আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্থান দাবী করতে পারেন।" তাঁর প্রতিভার এই দিকটি সম্পর্কে আর অধিক বলার প্রয়োজন নেই।*

বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর বরপুত্র আশুতোষ বিজ্ঞান-চর্চায় জীবন অতিবাহিত করার

---

* এই তথ্যগুলি গণিতাচার্য এ. সি. বসু লিখিত *The Mathematical Genius of Sir Asutosh* শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত। প্রবন্ধটি 'ক্যালকাটা রিভিয়্যু' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

সুযোগ পাননি। তাঁর প্রতিভার তুলনায় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর মৌলিক অবদানের পরিমাণও অল্প। তাঁর পরিশ্রম করার ক্ষমতা এবং পাণ্ডিত্যের তুলনায় তিনি উল্লেখযোগ্য কোনো স্থায়ী নিদর্শন রেখে যেতে পারেননি সত্য, কিন্তু নবীন বিজ্ঞানীদের প্রতিভা-স্ফুরণের পথ সুগম করে দেওয়ার মধ্যেই তো আশুতোষের প্রতিভা পরম চরিতার্থতা লাভ করেছে। আমার বিবেচনায় তাঁর জীবনের এইটাই শ্রেষ্ঠ ত্যাগ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিজ্ঞান কলেজকে কেন্দ্র করে তিনি ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চার যে ধারা প্রবর্তন করে গিয়েছেন, সেই অনন্যলব্ধ কীর্তির মধ্যেই তো তাঁর প্রতিভার ভাস্বর জ্যোতি চিরকালের মতো উদ্ভাসিত হয়ে থাকবে। সাম্প্রতিককালে যে ভারতবর্ষ রাণাডে, তিলক, আনন্দমোহন, রামানুজন, রাজেন্দ্রলাল, রাসবিহারী ঘোষ, রমেশচন্দ্র দত্ত ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ প্রতিভাধর ব্যক্তিদের জন্ম দিয়েছে—সেই ভারতবর্ষে দ্বিতীয় একজন আশুতোষ আর জন্মগ্রহণ করেনি। স্যর চন্দ্রশেখর রমন সত্যই বলেছেন: "It is really a matter of astonishment that it has been at all possible to bring together such a body of workers, to reconcile so many conflicting aims, ideals, and interests, to advance the cause of highest studies and researches in so many different and diverse departments. It was possible in Calcutta—and not anywhere else in India—mainly because there was here such a colossal brain—so great an intellectual giant at the head of the immense and expanding organisation."

কার্লাইলের *Heroes of Letters and Science* প্রবন্ধটি যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এই কথা স্বীকার করবেন যে, বাংলা তথা ভারতবর্ষের জ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে যেসব জ্ঞানতাপস তাঁদের স্ব স্ব প্রতিভা ও পরিশ্রমের ফলদ্বারা বিশ্ব-সভায় ভারতবর্ষের গৌরব বর্ধন করেছেন, তাঁদের তালিকার শীর্ষভাগে 'আশুতোষ মুখোপাধ্যায়' এই নামটি লেখা থাকবে। সত্য এবং জ্ঞানের মশাল হাতে নিয়ে তিনি ভারতবর্ষের জ্ঞানরাজ্যে একদিন আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই যে বহুমুখী প্রতিভা, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অনন্যসাধারণ কর্মশক্তি ও বিরাট

ব্যক্তির—এ সবই জ্ঞানের বেদীমূলে, সত্যের বেদীমূলে উৎসর্গিত হয়েছিল। ভবিষ্যৎবংশীয়দের শিক্ষা ও আদর্শের রাজপথ আশুতোষ স্বহস্তে নির্মাণ করে গিয়েছেন। আজ যখন আমরা এই অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষের মহত্ত্বের কথা আলোচনা করি তখন আমাদের মনে হয়, উচ্চ আদর্শ এবং উচ্চতর লক্ষ্যসাধনে অপরকে উদ্‌বোধিত ও অনুপ্রাণিত করার মধ্যেই আশুতোষের প্রতিভা সার্থক হয়েছে। এমার্সন বলেছেন: "The key to power of greatest men is this that their spirit diffuses itself." আশুতোষের মধ্যে আমরা সেই জিনিসই—এই "diffusion of spirit"—লক্ষ্য করি।

আশুতোষের বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য গরিমায় সমগ্র ভারতবর্ষ একদিন গর্বোৎফুল্ল হয়েছিল। বিদ্যার অমোঘ দাবী তিনি কখনো অস্বীকার করতে পারতেন না —অন্যসব দাবী তুচ্ছ হয়ে যেত এর কাছে। তাই তিনি পেরিক্লিস অথবা আগাস্টাসের মতো দেশ-বিদেশের পণ্ডিতকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভামণ্ডপে আহ্বান করেছিলেন। তাঁর মনোগত অভিপ্রায় ছিল যে ভারতের বিভিন্ন জাতির মিলন-কেন্দ্র মহামানবের মিলনতীর্থ করে বিশ্ববিদ্যালয়কে গঠন করে ভারতবর্ষকে একতাসূত্রে বদ্ধ করবেন। এই বিরাট কল্পনার কথা আমরা যখন স্মরণ করি তখন মনে হয় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আশুতোষের সমতুল্য প্রতিভা আর দ্বিতীয়টি এই দেশে জন্মগ্রহণ করেননি। স্যর মাইকেল স্যাডলার বলেছেন, "আশুতোষের মতো প্রতিভাশালী ব্যক্তি একটা সাম্রাজ্য শাসন করবার যোগ্য।" সাম্রাজ্য তিনি নিঃসন্দেহে স্থাপন করে গিয়েছেন এবং তা করেছেন কেবল আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে। ইহাই তাঁর প্রতিভার মহত্ত্ব।

আশুতোষ নিজেই বলেছেন, "সকল পদার্থেরই অনুভূতি চাই। সমস্ত বিষয়েই মগ্ন হওয়া চাই—প্রাণ অকৃপণভাবে ঢালিয়া দেওয়া চাই, অন্যথা সিদ্ধিলাভ সুদূর পরাহত।" এই অনুভূতি তাঁর ছিল। চিত্তের যে বেগ এবং আবেগ দ্বারা তাঁর সত্তা সর্বক্ষণের জন্য স্পন্দিত হোত, তাঁর সকল চিন্তা ও সকল কর্মৈষণা সেই বেগ ও আবেগে অনুরঞ্জিত ছিল। তাঁর লোকোত্তর প্রতিভার রহস্যটা তো এইখানেই। তাঁর হাতে আলাদিনের কোনো প্রদীপ ছিল না—ছিল শুধু অন্তরে অনুভূতি আর দুই মহাভুজে অফুরন্ত কর্মশক্তি।

"পরিণত জীবনে আশুতোষ মধ্যাহ্ন ভাস্করের ন্যায় প্রখর ও দুর্নিরীক্ষ। স্বীয় অদ্ভুত তেজের দ্বারা কর্মক্ষেত্রকে যজ্ঞক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন। সূর্যের মতো তাঁহার তীব্র দাহিকা-শক্তি সময়ে সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদলের অসহ্য হইয়াছে; কিন্তু মধ্যাহ্ন ভাস্কর যেরূপ অন্যত্র তেজ দেখাইয়াও অশ্বত্থের নব পত্র-পল্লবের মধ্যে সবুজ রং ছড়াইয়া তন্মধ্যে নবজাগরণের কলরব ও সাড়া আনয়ন করেন, আশুতোষও সেইরূপ স্বীয় প্রখরতা সত্ত্বেও দেশের তরুণদের মধ্যে জীবন-প্রভাতের শুভ প্রেরণা আনিয়াছেন।"

যেদেশে নির্ভীক ও নিরলস কর্মশক্তি সচরাচর দুর্লভ, সেদেশে আশুতোষের প্রতিভা তাঁর উত্তরপুরুষের কাছে নিঃসন্দেহে একটি মহৎ প্রেরণা। শতাব্দীর পটে সেই তাঁর প্রতিভা আজো তার অম্লান রশ্মি বিকীরণ করে চলেছে? বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে বহু জিনিসেরই তিনি সংকল্প করেছিলেন, কিন্তু তাঁর স্বল্পকালস্থায়ী জীবনে তাঁর বিরাট কল্পনাকে সম্পূর্ণ রূপ দেবার অবসর আশুতোষ পাননি। তথাপি এ কথা আজ মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করতে হবে যে, দেশের উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে "নবজাগরণের কলরব ও সাড়া" যতটুকু তিনি জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, বর্তমানে আমরা তারই সুমহৎ পরিণতি প্রত্যক্ষ করছি। এমনি নবজাগরণের কলরব ও সাড়া একদিন এই দেশে জাগিয়েছিলেন রামমোহন। প্রকৃতি তাঁকে কর্ম করবার যোগ্যশক্তি দিয়ে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। সেই শক্তি, সেই প্রতিভা বাংলা তথা ভারতবর্ষের চিত্তলোক কতখানি সমৃদ্ধ করে গিয়েছে, আশুতোষের উত্তরপুরুষ হিসাবে আমরা আজ যেন সেই ইতিহাস স্মরণ করে তাঁর প্রতি আমাদের অন্তরের অকপট শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

॥ তেরো ॥

১৯২৪, ২৫শে মে।

পাটনায় আশুতোষের আকস্মিক মৃত্যু হোল। আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত! বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন, আশুতোষের মৃত্যু যেন বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো। সত্যিই তাই। তাঁর মৃত্যুর ঠিক দু'দিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একজন কৃতী সন্তানকে বাঙালী হারিয়েছিল—তিনি স্যর আশুতোষ চৌধুরী। বিদ্যায়, বুদ্ধির দীপ্তিতে, চরিত্রবত্তায়—ইনিও সমকালীন বাঙালী সমাজে পরম শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিলেন। দুই আশুতোষের মধ্যেও গভীর প্রীতির সম্পর্ক ছিল এবং এঁরা দু'জনেই দু'জনের গুণমুগ্ধ ছিলেন।

ব্যাপ্তিতে এবং দীপ্তিতে আশুতোষ-চরিত্র যেমন অতুলনীয়, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ইহা তেমনি অসাধারণ। বঙ্কিমচন্দ্র যদি বাঙালীর ভাব-জীবনের স্রষ্টা হন, আশুতোষ নিশ্চয়ই আমাদের বুদ্ধিদীপ্ত জীবনের স্রষ্টা। তাঁর চরিত্র বিচার করতে গিয়ে কয়েকটি কথা স্বভাবতই আমাদের মনে জাগে। প্রথম কথা—কে বিচার করবে? মানুষের গুণাগুণের খাঁটি বিচার করতে গেলে তাতে অধিকার থাকা চাই—বিশেষ করে আশুতোষের মতো একজন মানুষ। দ্বিতীয় কথা, তাঁর নিজস্ব প্রকৃতি দ্বারাই তাঁর বাইরের কর্মজীবনের ভাল-মন্দের ওজন করতে হবে; তেমনি তাঁর অন্তর্জীবনের পরিচয় গ্রহণ করতে হবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত নির্মল চিত্ত নিয়ে। আমার মনে হয়েছে যাঁরা আশুতোষের বাইরের কাজ দেখেই কেবল তাঁর অন্তরের ধর্মাধর্মের বিচার করেছেন, তাঁরা তাঁর প্রতি সুবিচার করতে পারেন নি। আবার এ কথাও সত্য যে, যাঁরা তাঁর স্তাবকতা করতেন তাঁরাও এই মানুষটির সত্য পরিচয় কখনো লাভ করেন নি। আশুতোষ আসলে ছিলেন একজন কর্মীপুরুষ আর কর্মীপুরুষের বিচার কখনোই

তাঁর কৃত কর্ম দ্বারা সম্ভব নয়। মানুষের স্বরূপ না জানতে পারলে মানুষকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায় না। বিশেষ করে সেই মানুষ যিনি গাম্ভীর্যে সমুদ্রবৎ, ধৈর্যে হিমালয়সদৃশ আর ক্ষমায় পৃথিবীতুল্য।

এই প্রসঙ্গে মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল একটি সুন্দর বিশ্লেষণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন ঃ "যাঁহারা আশুতোষের চরিত্রের অন্তপুরে কখনো প্রবেশ করিবার অধিকার পান নাই, তাঁহারা তাঁহার জটিল প্রকৃতির এবং বিচিত্র কর্মের ভালো মন্দের সত্য বিচার করিতে পারিবেন না। বহুলোকে ক্ষুদ্র স্বার্থের সন্ধানে আশুতোষের ভজনা করিতেন। ইঁহারা আশুতোষকে সত্যভাবে জানিবার কখনো অবসর পান নাই। ...এই কারণে আশুতোষের অসাধারণ প্রতিভা ও শক্তি স্বীকার করিয়াও বাহিরের লোকে অনেক সময় তাঁহার চরিত্রের মর্যাদা দিতে পারে নাই।"

বাংলা দেশে বড়োলোক অনেক জন্মেছেন কিন্তু এমন করে সকলের মন জয় করতে এক বিদ্যাসাগর ভিন্ন আর কেউ পারেননি। যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের গভীর সমন্বয় বিদ্যাসাগরে সাধিত হয়নি, তা আশুতোষের ভিতর কনককেতকীকান্তিরূপে সমুজ্জ্বল হয়েছিল। দার্শনিকতায় কঠোর, ত্যাগে বিপুল, বিদ্যায় লব্ধকীর্তি, উপকারে মুক্তহস্ত, চরিত্রবলে মহীয়ান, কর্মে অতন্দ্রিত, তেজে অগ্নিগর্ভ—এই দৃঢ়বপু মানব যে যুগে বা যে দেশেই জন্মগ্রহণ করতেন, তাকেই শাপমুক্ত করতেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জ্ঞানের ধারাপ্রবাহ তিনি আকণ্ঠ পান করেছিলেন, কিন্তু 'সাহেব' সাজেননি—মনে প্রাণে ও আচারে-ব্যবহারে আশুতোষ খাঁটি বাঙালী ছিলেন—যেমন ছিলেন বিদ্যাসাগর ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বদেশীর স্রোত এদেশে আসবার অনেক আগে থেকেই তিনি 'স্বদেশী' ছিলেন। মহাকবি কীর্তিবাসের ভিটার উদ্বোধন বাসরে বা সাহিত্য সম্মেলনে বা কনভোকেশন বক্তৃতায় তিনি এই বাণীই প্রচার করে গিয়েছেন। দেশসেবা ও জনসেবা তিনি গোপনে করে গিয়েছেন। কাশীতে তাঁকে যখন খালি পায়ে লগ্নোত্তরীয়কায় হয়ে সকল মন্দির দর্শন করতে দেখা যেত তখন মনে হোত য়ুরোপীয় শিক্ষার প্রাখর্য ও অহংবাদ ভারতীয় বৈদিকতায় ও ত্যাগতন্ত্রে পরিশুদ্ধ হয়ে আশুতোষের মধ্যে যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। তিনি রক্ষণশীল ছিলেন, এজন্য তিনি গর্ববোধ করতেন। ধুতি-চাদরে তিনি রাজ-

দরবারে যেতেন, রুগ্ন ছাত্রের অবস্থা দেখবার জন্য ছাত্রাবাসেও যেতেন। স্যাডলার কমিশনের সঙ্গে সারা ভারতবর্ষ তিনি এইভাবেই ভ্রমণ করেছেন। ইহাই ছিল তাঁর রাজকীয় বেশ। আর্যত্ব এবং বাঙালীত্ব রক্ষা করা তাঁর জীবনের প্রধান্ ধর্ম ছিল। বিপিনচন্দ্র পাল মিথ্যা বলেননি যে আশুতোষেব মৃত্যুতে বাঙালীর জীবন যে কতখানি শূন্য হয়ে গিয়েছে, তা আমরা সহজে ধারণা করতে পারব না।

তেজস্বিতা, কর্মশক্তি প্রভৃতি সমুদয় বিচার করলে আশুতোষকে বর্তমান ভারতের একজন অদ্বিতীয় পুরুষ বলতেই হবে। রাজা রামমোহনের সঙ্গে যদি কারো তুলনা চলে তবে তিনি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। মস্তিষ্কের শক্তিতে, হৃদয়ের শক্তিতে, কর্মশক্তিতে এমন কি দৈহিক বলে তিনি রামমোহনের তুল্য ছিলেন। রাজার ধীশক্তির তুল্য ধীশক্তি, পাণ্ডিত্য ও মানসিক বলের তুল্য পাণ্ডিত্য ও মানসিক বল বাঙালীজাতি বিংশ শতাব্দীতে আবার একবার দেখেছিল। রামমোহন এদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যাকুল ছিলেন—তিনিই এদেশে শিক্ষা সম্বন্ধে নবযুগের অবতারণা করেছেন। আশুতোষ সেই শিক্ষার উৎকৃষ্টতম ফল। রামমোহন পুরুষসিংহ ছিলেন, আর আশুতোষ ছিলেন 'বেঙ্গল টাইগার'। অমিত তেজ, অমিত বল শুধুই যে তাঁর হৃদয়ে ছিল তা নয়, তাঁর দেহেও অমিত বল ছিল। সকল দিক দিয়ে সকলভাবে তিনি একজন অতি মানব ছিলেন—ছিলেন 'Giant' সদৃশ। সাধারণ লোকে যা পারতো তিনি তার দশগুণ পারতেন। অসামান্যতার সকল চিহ্ন যেন আশুতোষের ললাটে এঁকে দিয়ে বিধাতাপুরুষ তাঁকে এই বাংলাদেশে পাঠিয়েছিলেন। সকলেই জানেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রতিদিন যে দুরন্ত শ্রম তিনি করতেন (তখন ভাইস-চ্যান্সেলারের পদের সঙ্গে অর্থের স্বার্থ বিজড়িত ছিল না—এ ছিল নিতান্তই অবৈতনিক কাজ), সেও তাঁর বিশ্রামের সময়টুকুর কাজ। আদালত থেকে তিনি সোজা সিনেটে গিয়ে তিন-চার ঘণ্টা দুরন্ত শ্রম করতেন। তাতেও তাঁর শ্রান্তি বা বিরক্তি ছিল না। কর্মবিমুখ বাঙালীকে আশুতোষ যেন শ্রমের মর্যাদা নূতন করে শিখিয়ে গিয়েছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আশুতোষের প্রধান কীর্তি। তাঁরই জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এত গৌরব। বর্তমানে শিক্ষিত বাঙালী যুবক মাত্রেই আশুতোষের নিকট ঋণী—অন্নদাতা বড়ো, না, জ্ঞানদাতা বড়ো?—এই প্রশ্নটি আজ যেন তারা একবার শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তলিয়ে দেখে। বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান; তাঁর সমগ্র অস্তিত্ব যেন একে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হোত। তাই দেখা গেল যে, আশুতোষের মৃত্যুর সপ্তাহকাল মধ্যেই (৩১শে মে) সিণ্ডিকেটের একটি বিশেষ সভায় যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল তার এক স্থানে বলা হয়েছে: "The remarkable developments in the work of the Universitty during the last two decades were largely the product not only of his constructive genius but of the self-less, incessant and devoted toil, which he brought to his task as a member of our body." ইহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

তারপর ১৫ই জুন আশুতোষের স্মৃতিতে সিনেটে একটি সভার আয়োজন হয়। ছোটলাট লিটন দার্জিলিঙ থেকে এলেন এই সভায় চ্যান্সেলার হিসাবে সভাপতিত্ব করবার জন্য। সেদিন লিটন যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা ছিল শ্রদ্ধায় ও আন্তরিকতায় মর্মস্পর্শী। তিনি যখন দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "অবনত মস্তকে এবং ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আজ আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশের জন্য এখানে সমবেত হয়েছি," তখন উপস্থিত সকলেরই চোখ দুটি ক্ষণেকের জন্য অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল। সে দৃশ্য ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। বিরাট সিনেট হল নিস্তব্ধ। সিনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্য-বৃন্দ ব্যতীত শহরের গণ্যমান্য বহু ব্যক্তিই আশুতোষের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের জন্য আজ এখানে সমবেত হয়েছেন। শোকের এমন গম্ভীর ও মহিমা-মণ্ডিত মূর্তি সচরাচর দেখা যায় না। সমস্ত সভা গমগম করছে। সবাই উৎকর্ণ হয়ে শুনল যিনি আশুতোষের প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন সেই লিটনই আজ অকপটে স্বীকার করলেন:

"Sir Asutosh Mookerjee was the most striking and representative Bengali of his time. The post-graduate department of this University was the outstanding product

of Sir Asutosh's great career. In the eyes of his countrymen and in the eyes of the world, he represented the Universty so completely that for many years Sir Asutosh was in fact the University and the University Sir Asutosh'"

"আশু মুখুজ্যেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আর বিশ্ববিদ্যালয় মানেই আশু মুখুজ্যে"—লিটনের এই একটি মাত্র উক্তির মধ্যেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আশুতোষের প্রগাঢ় নিষ্ঠার ইতিহাস চিরকালের মতো অভিব্যক্ত হয়েছে। এই ঘটনার ঠিক ছ বছর আগে, ১৯১৮ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত এক কনভোকেসন সভায় তদানীন্তন চ্যান্সেলার লর্ড চেমসফোর্ড আরেকজন ভাইস-চ্যান্সেলারের (স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) মৃত্যুতে অনুরূপ সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন।

তখন ভাইস-চ্যান্সেলার ভূপেন্দ্রনাথ বসু। তিনিও এই সভায় যোগদানের জন্য দার্জিলিং থেকে এসেছিলেন; কিন্তু শেষ মুহূর্তে শারীরিক অসুস্থত.র দরুণ সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন নি। রোগ-শয্যা থেকে তিনি যে বাণী পাঠিয়েছিলেন, সেটি সভায় পাঠ করেন প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলার ডাক্তার নীল-রতন সরকার। ভূপেন বসু তাঁর বাণীতে একটি সুন্দর কথা বলেছিলেন: "মর্মর মূর্তি নয়, আশুতোষের আদর্শের অনুসরণের দ্বারাই আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন করতে পারি।" সেদিন সিনেটের এই মহতী সভায় অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন প্রধান বিচারপতি স্যাণ্ডার্সন (ইনিও একজন প্রাক্তন উপাচার্য), নীলরতন সরকার, ডক্টর আর্কুহার্ট, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ আরো অনেকেই। এঁরা প্রত্যেকেই আশুতোষের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। পরে 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছিলেন:

"আমার মনে হয়, বাঙালী জাতির মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত পুরুষ আশুতোষ ছাড়া আর দেখা যায় নাই। এই জাতির উত্থান আশুতোষের মত জনকয়েক নির্ভীক একাগ্রতাপরায়ণ, কৃতবিদ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে সাধক পুরুষের আবির্ভাবে দেখা যায় ও এই জাতির জীবনী-শক্তির ক্রমোন্নতির উজ্জ্বল উদাহরণ পাওয়া যায়। কোন বাঙালীকে আশুতোষের মত সাধু চেষ্টা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়কে যশোন্মুখী করিতে দেখা যায় নাই;

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধাতাপুরুষ ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইংরেজ বা বাঙালীর মধ্যে এমন একজনেরও নাম করিতে পারি না, যিনি আশুতোষের মত নিজ পুরুষকার দ্বারা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এতটা উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন।"

আশুতোষের মৃত্যুতে ব্যথাহত চিত্তে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

"The complex personality of Ashutosh Mukherjee had its various channels of expression. It is not in my power to deal in detail with his many gifts which found scope in so many different fields of achievement. My admiration was attracted to him where he rsvealed the freedom of mind needed for work of creation. He had not the dull patience and submissive efficiency that is content to keep oiled and working the clock-work of an organisation : he despised to try and win merit by diligently turning the official prayer-wheel through an eternity of perfect monotony. It had been possible for him to dream of the miracle of introducing a living heart behind the steel framework made in the doll factory of bureaucracy, though this could only be done through a revolution upsetting the respectability of rigid routine and incurring thereby the displeasure of the high priest of the Machine-idol.

"The creative spirit of life which has to assert itself against barren callousness must, in its struggle for victory, wreck things that claim only immediate value. We can afford to overlook such losses which are pitifully small compared to the great price of our object which is Freedom.

Ashutosh heroically fought against heavy odds for winning freedom for our education. We, who in our own ways have been working for the same cause, who deserve to be treated as outlaws by the upholders of law and order in the realm of the dead, had the honour of receiving from him the extended hand of comradeship, for which we shall ever remember him. In fact he removed for us the ban of official untouchability and opened a breach in the barricade of distrust, establishing a path of communication between his institution and our own field of work, but never asking us to surrender in the least our independence.

"Ashutosh Mukherjes touched the Calcutta University with the magic wand of his creative genius, in order to transform it into a living organism belonging to the life of the Bengali people. This was his gift of gifts to his country, but it is a gift of endeavour of *tapasya*, which will reach its fulfilment only if we know how to accept it."*

রবীন্দ্রনাথ যথার্থ বলেছেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলবার জন্য আশুতোষ জীবনব্যাপী যে পরিশ্রম করেছিলেন, তা তপস্যারই সমতুল্য ছিল। তাঁর উত্তরপুরুষের জন্য সেই অনন্যলব্ধ তপস্যার দানই তিনি রেখে গিয়েছেন। যেদিন আমরা সেই দানের মূল্য বুঝতে পারব সেদিন হয়ত আমরা বুঝতে পারব শিক্ষার ক্ষেত্রে এই একটি মানুষ কি অসাধ্য সাধনই না করে গিয়েছেন।

অনেকেই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আশুতোষের একটা তুলনা করতে চেয়েছেন। এটা একটু বিচার করে দেখা যেতে পারে। বিদ্যাসাগরের চরিত্র সর্বকালের

* *Visva-Bharati Quarterly* : July 1924

বাঙালীর আদর্শ চরিত্র। সেই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য জলন্ত তেজে আর জাতীয় মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখবার প্রয়োজনের ভিতর দিয়ে অভিব্যক্ত হোত। বীরসিংহের এই ব্রাহ্মণ চটি-পায়ে লাট-দরবারে যেতে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করতেন না। আশুতোষও তাই। পুত্র শ্যামাপ্রসাদ লিখেছেন: "একখানি অতি সাধারণ ধুতি এবং একটি খাটো কোট (চায়না কোট) পরিয়া, স্যাডলার কমিশনের সদস্যরূপে তিনি ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। এমন কি হাইকোর্টেও তিনি দিনের কাজ সমাধা করিয়া, কোর্টের পোষাক ছাড়িয়া ধুতি পরিতেন। একখানি ধুতি পরিয়া এবং বিশাল স্কন্ধের উপর অবহেলার সহিত একটি চাদর ঝুলাইয়া তিনি যখন হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতিদের জন্য নির্দিষ্ট সিঁড়ি ভাঙিয়া খুব জোরে জোরে অবতরণ করিতেন, তখন উহা একটা দেখিবার বিষয় হইত। আশুতোষ যদিও তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কাল উচ্চ সরকারী কাজ করিয়া গিয়াছিলেন, তথাপি তিনি বাঙালীর জাতীয় পরিচ্ছদকে সাহেবদের চক্ষে যতটা শ্রদ্ধেয় করিয়াছিলেন, ততটা আর কেহ পারেন নাই।"

দীনেশচন্দ্র লিখেছেন: "বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বাংলার ব্যাঘ্র আশুতোষের চরিত্রগত অনেক সাদৃশ্য আছে। বিদ্যাসাগর ছিলেন খাঁটি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত; তিনি পরিণত বয়সে ইংরাজের সংস্পর্শে আসিয়া ইংরাজী শিখিয়াও তাঁহার জীবনের অভ্যস্ত রীতি ছাড়েন নাই।...কিন্তু বিদ্যাসাগর শুধু দেশীয় রীতি রক্ষা করেন নাই, তাঁহার চরিত্রে ব্রাহ্মণ্য তেজ ও বর্তমান যুগের পাশ্চাত্য জাতিসুলভ প্রখর ব্যক্তিত্ব অভাবনীয়রূপে বিকাশ পাইয়াছিল। আশুতোষের শিক্ষাদীক্ষা সমস্তই নব্য তন্ত্রের, তিনি পাশ্চাত্য প্রভাবের একেবারে তোপের মুখে ছিলেন। তাঁহার পিতা, পিতৃব্যগণের প্রায় সকলেই ইংরাজীতে শিক্ষা পাইয়া পাশ্চাত্য প্রভাবের মুখোমুখী দাঁড়াইয়াছিলেন। আধুনিক শিক্ষার যত কিছু নব্য ভাব, তাঁহার বাড়িতে তাহা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।...পাশ্চাত্য প্রভাবের যে ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হইয়া আমাদের সমাজের আচার-বিচার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং একাকার করিয়া ফেলিয়াছিল, সেই প্রবল ঝঞ্ঝার ক্রিয়া আশুতোষের সমকালীন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা বেশি হইয়াছিল। এই প্রবল ঝঞ্ঝার মধ্যে তিনি কি করিয়া ইহার দুর্দমনীয় গতির মুখ ফিরাইয়া দিলেন? স্বীয়

বংশের তেজ ও প্রখর প্রতিভা আশুতোষকে দেশ ও সমাজের প্রীতি শিখাইয়াছিল।...তিনি যেমন খাঁটি পুরুষ ছিলেন; তাঁহার কথাও তেমনই খাঁটি ছিল।...কথায় ব্যবহারে এবং কর্মক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের মতনই সর্বত্র ও সর্বদা খাঁটি ছিলেন। এই অভিনয়ের যুগে তিনি অভিনয় করেন নাই।"

একটা ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আশুতোষের আশ্চর্য মিল দেখতে পাই: "যে তেজ ও স্বদেশের সমস্ত বিষয়ের প্রতি অনুরাগের বীজ বিদ্যাসাগর-চরিত্রে উপ্ত হইয়াছিল, আশুতোষের জীবনে তাহা সম্যক বিকাশ লাভ করিয়াছিল। স্বদেশবাসীর দ্বারা পরিচালিত উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানের সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠাতা বিদ্যাসাগরের সেই উদ্দেশ্য, অর্থাৎ শিক্ষাবিভাগ সম্পূর্ণরূপে বাঙালীর দ্বারা পরিচালনা, আশুতোষ বৃহত্তর ক্ষেত্রে সফল করিয়াছিলেন। একজন যে নির্ঝরের খাদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, অপর সেই খাদে প্রবল ধারা বহাইয়া দিয়া তাহা কূলে কূলে পূর্ণ করিয়াছিলেন।' সংস্কৃত কলেজের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিদ্যাসাগর সরকারী হস্তক্ষেপ পছন্দ করেন নি, আশুতোষও তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অটোনমি' বজায় রাখবার জন্য চিরকাল নির্ভীকভাবে সরকারী ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেছিলেন।

আর এক জায়গায় এই দুইটি চরিত্রের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। বিদ্যাসাগর ও আশুতোষ এই দু'জনের কাছেই বাংলাভাষা ঋণী। বিদ্যাসাগরের যুগে তখনকার তুলনায় বাংলাভাষার প্রসার-বৃদ্ধির মূলে তাঁর যে কত বড়ো কৃতিত্ব ছিল সে ইতিহাস সুবিদিত। তেমনি বিদ্যাসাগরের যুগের তুলনায় বর্তমান বাংলাভাষার প্রসার-বৃদ্ধির মূল আশুতোষের যে কতখানি কৃতিত্ব ছিল, তার কিছু আভাস আমরা পূর্বে দিয়েছি। অনেকেই জানেন ১৮৯১ সাল থেকেই তিনি চেষ্টা করেছিলেন কি উপায়ে প্রবেশিকা থেকে এম-এ ক্লাস পর্যন্ত সকল পরীক্ষাতেই বাংলা ভাষায় একটা পরীক্ষা গৃহীত হয়। তখন আশুতোষের উদ্যম ফলপ্রসূ হয়নি; কিন্তু তিনি ভগ্নোদ্যম হননি। প্রবেশিকা পরীক্ষা থেকে এম-এ পর্যন্ত বাংলাভাষা গৃহীত হবে এই ব্যবস্থা করে দিয়ে আশুতোষ যে কাজ করে গিয়েছেন, একমাত্র তার জন্যই তিনি অমরত্ব দাবী করতে পারেন।

সাগর-চরিত্রে ও আশুতোষ-চরিত্রে আরো একটি স্থানে মিল দেখি। সেটা তাঁদের উভয়ের মাতৃভক্তি। বিদ্যাসাগরের জীবনে ভগবতীদেবীর প্রভাব আজ

কিম্বদন্তীতে পরিণত হয়েছে। মাতৃভক্তিতে আশুতোষও কম ছিলেন না। তাঁর বিচারপতির পদগ্রহণের কাহিনী এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বিদ্যাসাগর, গুরুদাস ও আশুতোষ—এই তিনজন বরেণ্য বাঙালীসন্তান মাতৃভক্তির যে আদর্শ দেখিয়ে গিয়েছেন, আজকের দিনে প্রত্যেক বাঙালী তরুণের তা সর্বপ্রযত্নে অনুসরণ করা উচিত।

স্বীয় পিতৃদেব সম্বন্ধে শ্যামাপ্রসাদ লিখেছেন: "আশুতোষের চরিত্রে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি অতিশয় অনাড়ম্বরভাবে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতেন। তিনি কঠিন শয্যা পছন্দ করিতেন, তদপেক্ষাও একটি কঠিন উপাধানের উপর শির রক্ষা করিয়া বেশ আরামে ঘুমাইতেন। স্যাড্‌লার-কমিশনের সদস্যরূপে তাঁহাকে বিভিন্ন প্রদেশের বড়লোকদের বাড়িতে সম্মানিত অতিথি হইয়া থাকিতে হইত। তাহার জন্য বিলাসিতাপুর্ণ শয্যাসম্ভারের আয়োজন হইত,—তিনি তাহা ত্যাগ করিয়া মেঝের উপর সামান্য বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়িতেন, ইহাতে সেইসকল প্রধান ব্যক্তিরা আশ্চর্যান্বিত হইয়া যাইতেন। তিনি কখনও ধূমপান বা মাদক-দ্রব্য ব্যবহার করিতেন না, এমন কি পান পযন্ত খাইতেন না। সুচিরাগত এই পারিবারিক সংস্কার তিনি কখনও কাহারও পীড়াপীড়িতে ত্যাগ কবেন নাই। সামাজিক জীবনে তাঁহার আড়ম্বরেব লেশমাত্র ছিলনা। তিনি গৃহস্থের নিমন্ত্রণ সর্বদা রক্ষা করিতেন। নিমন্ত্রণকারী যত ক্ষুদ্র ব্যক্তি হউক না কেন, তিনি তাহার বাড়িতে উপস্থিত হইতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। তাঁহার মৃত্যু-রোগের প্রাক্কালে তিনি পাটনায় তাঁহার মোটর-চালকের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইয়াছিলেন। কিন্তু যখন কর্তব্যের অনুরোধে সত্য ও ন্যায়পরতার জন্য দরকার হইত, তখন দেশের সর্বপ্রধান ব্যক্তির ভ্রূকুটিতেও ভীত হইতেন না।

"অতি শৈশব হইতেই আশুতোষ খুব ভোরে উঠিতে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁহার সকল কার্যই নিয়মিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল এবং তিনি ঘড়ির কাঁটার মত ঠিকভাবে কায করিতেন। রাত্রি চারটার সময়ে তিনি ঘুম হইতে উঠিতেন এবং আর আধঘণ্টা পরেই কাজ করিতে বসিয়া যাইতেন। তাঁহার পরিশ্রম

করিবার শক্তি ছিল অদ্ভুত। প্রাতঃকালে তিনি হাইকোর্টের রায়, বিষয়ের বিবরণী, টীকা-টিপ্পনী এবং বহু পত্রের উত্তর কহিয়া লিখাইতেন। দুইজন টাইপিস্ট সর্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিত,—এই গুরুতর কার্যে তাহাদের অবকাশমাত্র থাকিত না। হাইকোর্ট হইতে তিনি প্রতিদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতেন এবং কোন কোন দিন অপর কোন প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হইয়া তৎপরিচালনা-সংক্রান্ত গুরুতর কার্যগুলি সমাধা করিতেন। বাড়ি ফিরিতে সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইয়া যাইত। সন্ধ্যার পরে আহারাদি করিয়া তিনি পুনরায় কাজ লইয়া বসিতেন এবং রাত্রি দশটা পর্যন্ত কাজ করিতেন। এই সময়টা তাঁহার অধ্যায়নের জন্য নিয়োজিত ছিল। মৃত্যুর মাত্র দুইদিন পূর্ব পর্যন্তও তিনি তাঁহার এই আজীবনের অভ্যাস নিয়মিতরূপে পালন করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি আলস্যকে দস্তরমত ঘৃণা করিতেন এবং লোকে কি করিয়া সময় নষ্ট করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে, তাহা বুঝিতেন না"*

এই বর্ণনার মধ্যে আমরা আশুতোষের জীবনের যে চিত্রটি পাই, এ যুগের কর্মবিমুখ, আলস্যপরায়ণ এবং উচ্ছৃঙ্খল বাঙালীসন্তানদের একবার ইহা স্মরণ করতে বলি। উনিশ শতকের প্রত্যেকটি বরণীয় বাঙালীর জীবন এই ধাঁচেই গঠিত ছিল। এঁরা সকলেই কর্মীপুরুষ ছিলেন, বাক্যবীর ছিলেন না। তাই তাঁরা তাঁদের উত্তরপুরুষের জন্য আদর্শের এমন বিপুল সম্পদ রেখে যেতে পেরেছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, সেই সম্পদের আমরা না নিলাম সন্ধান, না করলাম সদ্ব্যবহার। বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের, তার নৈতিক জীবনের অবক্ষয় তাই বুঝি আজ এত সুস্পষ্ট এবং শোচনীয়।

আশুতোষের গুণগ্রাহিতার অজস্র দৃষ্টান্ত আছে। তাঁর মতোন গুণীর আদর করতে এযুগে আর খুব কম ব্যক্তিই জানতেন। এর দুটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের কথা আগে বলি। স্যর জন মার্শাল রমাপ্রসাদের কর্মকুশলতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সরকারী বেতনে রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করতে চেষ্টা

* *Representative Indians :* Shyamaprasad Mookerjee

করেন, কিন্তু তদানীন্তন বঙ্গীয় সরকারের প্রতিবন্ধকতায় তাঁর এই চেষ্টা সফল হয়নি। তখন রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের অল্প বেতনের সরকারী শিক্ষকতায় পুনরায় ব্রতী হওয়া ব্যতীত তাঁর আর কোনো উপায় ছিল না। ঠিক এই সময়ে আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি' বিষয়ে এম. এ. বিভাগের প্রবর্তন করেন। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কিত নানা রচনার মধ্যে রমাপ্রসাদের অসাধারণ বিদ্যাবত্তার পরিচয় পেয়ে তিনি তাঁকেই এই বিভাগের লেকচারার নিযুক্ত করেন। একজন সাধারণ বি এ. পাশ স্কুল শিক্ষককে স্নাতকোত্তর বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত করার ব্যাপারে আশুতোষ যে উদারতা, সাহস ও গুণগ্রাহিতা দেখিয়েছিলেন তা সত্যই তুলনারহিত। "ইউনিভার্সিটির ছাপটাই কি বড়ো—একজন মানুষের প্রতিভা কিছু নয়?—" এই কথা সেদিন সিনেটের এক সভায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন আশুতোষ। তারপর অল্পদিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব বিভাগ প্রবর্তিত হোলে তিনি রমাপ্রসাদকে এই বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। ১৯২১ সাল পর্যন্ত তিনি যোগ্যতার সঙ্গে নব প্রতিষ্ঠিত নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষতা করেছিলেন।

মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের পাণ্ডিত্যের কথা আশুতোষের বিশেষভাবে জানা ছিল। ১৯০১ সালে আশুতোষের প্রযত্নে প্রবর্তিত পালি ভাষায় এম এ পরীক্ষা দিয়ে বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রথম শ্রেণীতে স্থান লাভ করেন। এর আগে কলিকাতা সতীশচন্দ্র ১৮৯৩ সালে সংস্কৃতে প্রথমশ্রেণীর এম. এ ডিগ্রী অর্জন করার পর প্রথমে কৃষ্ণনগর কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ লাভ করেন এবং পরে তিনি সংস্কৃত কলেজে যোগদান কয়েন। জ্ঞান-ভিক্ষু সতীশচন্দ্রের জ্ঞান-আহরণের কাহিনী সেদিন আশুতোষের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারেনি। সতীশচন্দ্রের পালির উত্তরপত্রের পরীক্ষক ছিলেন অধ্যাপক রীজ ডেভিডস্। তিনি এই উত্তরপত্র দেখে মুগ্ধ হন এবং এই অজ্ঞাত পরীক্ষা-র্থীর পালিভাষা জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন। ১৯০৭ সালে মধ্যযুগে ভারতে ন্যায়শাস্ত্রের ধারা সম্বন্ধে লিখে সতীশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ. ডি. উপাধি লাভ করেন। অপর একটি নিবন্ধ রচনা করে তিনি এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রীফীথ পুরস্কারও লাভ করেন। এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের

তদানীন্তন অধ্যক্ষের অবসর গ্রহণ আসন্ন হয়েছিল। এই পদে গভর্নমেণ্ট কোনো বিদেশী পণ্ডিতকে নিয়োগের সংকল্প করেন—তাঁদের বিচারে কোনো ভারতীয়ই এই পদগ্রহণের উপযুক্ত ছিলেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার আশুতোষ ইতিপূর্বেই তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অত্যুজ্বল রত্নটির সম্যক পরিচয় পেয়েছিলেন। তিনি বাংলার তদানীন্তন ছোটলাট স্যর এনড্রু ফ্রেজারের কাছে অনুরোধ জানিয়ে একখানি চিঠিতে লিখলেন: "Let no other person be appointed as the Principal of the Sanskrit College ignoring Pandit Satischandra Vidyabhusan."—অর্থাৎ, যেন সতীশচন্দ্রকে উপেক্ষা করে আর কাউকেও সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ না করা হয়। ছোটলাট শিক্ষাবিভাগের পরামর্শক্রমে আশুতোষকে জানালেন যে কোন কোনো বিষয়ে সতীশচন্দ্রের শিক্ষার অপূর্ণতা আছে। তার প্রত্যুত্তরে আশুতোষ জানালেন যে, বর্তমান অধ্যক্ষের অবসর গ্রহণের বিলম্ব আছে; এই সময়ের মধ্যে সতীশচন্দ্রকে আরো কয়েকটি বিষয়ে শিক্ষিত হোতে সাহায্য করা শিক্ষা বিভাগের উচিত কর্তব্য। আশুতোষের পরামর্শ উপেক্ষা করা বা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজ করার দৃঢ়তা শিক্ষা বিভাগের ছিল না। তাঁদের নির্দেশে সতীশচন্দ্রকে বৌদ্ধদর্শন ও পালিভাষা বিশেষরূপে অধ্যয়নার্থ সিংহলের কলম্বো বিদ্যোদয় কলেজে প্রেরণ করা হয়। অতঃপর তিনি কাশী এসে এখানকার পণ্ডিতদের কাছে বেদ ও দর্শন সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষাগ্রহণ করেন। এখানে অবস্থানকালে তিনি জৈন দর্শন আয়ত্ত করেন। কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করে তিনি জার্মান অধ্যাপক থিবোর কাছে জর্মান ভাষা ও য়ুরোপীয় দর্শন অধ্যয়ন করেন। শিক্ষাবিভাগের আর আপত্তি করার কিছু রইল না—১৯১০ সালে সতীশচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ লাভ করলে আশুতোষের বাসনা পরিতৃপ্ত করেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৯২০) তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আশুতোষ সতীশচন্দ্রকে আংশিক সময়ের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিভাষারও অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। সতীশচন্দ্রের মৃত্যুতে ব্যথিত হয়ে আশুতোষ বলেছিলেন: "অতবড়ো পণ্ডিত, বৌদ্ধশাস্ত্রে অমন বিশারদ, তবু বিদ্যাভূষণ মহাশয় যেন বিনয়ের অবতার ছিলেন। নানাগুণে ভূষিত, অথচ এমন সরল ও অনাড়ম্বর প্রকৃতির মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি।"

এমনি শ্রদ্ধা তিনি দেখিয়েছিলেন দেশবিখ্যাত আর একজন পণ্ডিতের প্রতি। তিনি মূলাজোড়ের পণ্ডিত শিবচন্দ্র সার্বভৌম। অত বড়ো বিক্রান্তমূর্তি আশুতোষকে তিনি যখন "আশু" বলে সম্বোধন করতেন, শুনেছি, অমনি "আজ্ঞে, পণ্ডিতমশাই" বলে আশুতোষ করজোড়ে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেন। "সার্বভৌম মহাশয় বাঙালীর গর্ব ও গৌরবের পাত্র ছিলেন," তাঁর মৃত্যুর পরে এই কথা তিনি বলেছিলেন।

আশুতোষের ছাত্রবাৎসল্য এক অসাধারণ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। ছাত্র সম্প্রদায়কে তিনি পুত্রের অধিক মমতা করতেন—তাঁর রসারোডের বাড়ির দেউড়ী এদের সকলের জন্য সর্বদাই অবারিত ছিল। বস্তুত বাংলাদেশে তাঁর চেয়ে ছাত্রবৎসল আর দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না, পরেও আর কেউ হন নি। ছাত্রসম্প্রদায় আশুতোষের অমন অনুরক্ত ছিল কেন? এর একটি মাত্রই উত্তর আছে—তাদের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভালবাসা আর তাদের উন্নতির জন্য তাঁর পরম আগ্রহ ও যত্ন। ছাত্রদের হৃদয় তিনি এই গুণেই আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি ছেলেদের ভালবাসতেন আরো একটি কারণে। দেশের তরুণদের উপর আশুতোষের বহু আশা ও আস্থা ছিল। একদিন এরা বড়ো হবে—তখন দেশের ও জাতির ভবিষ্যৎ যাতে এদের কেন্দ্র করে যুগোপযোগী হয়ে গঠিত হয়, সেই জন্য তিনি সর্বদাই ছাত্রদের উপদেশ দিয়ে বলতেন: "তোমরা পাশ্চাত্য জগতের যাহা কিছু ভাল, তৎপ্রতি শ্রদ্ধাশীল অবশ্যই হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া নিজেদের জাতীয়তা ত্যাগ করিও না। বছরের পর বছর তাঁর কনভোকেশন বক্তৃতায় ছাত্রদের উদ্দেশে যে আন্তরিক আবেদন থাকত—তা তাঁর পূর্বে বা পরে আর কোনো ভাইস-চ্যান্সেলারের বক্তৃতায় আমরা দেখতে পাই না। দেশ-বিদেশের কৃতবিদ্য ছাত্রদের অভাব-অভিযোগ শুনবার জন্য তিনি সর্বদা ব্যগ্র থাকতেন এবং প্রাণপণে তা দূর করতেন। কৃতী ছাত্র বা ছাত্রীর নাম তিনি চিরদিন স্মরণ রাখতেন। হাজার হাজার ছাত্র বছরে পরীক্ষা দিয়েছে। তাদের মধ্যে যারই কিছু বিশেষত্ব দেখেছেন, আশুতোষ তাদের মনে রেখেছেন। বাংলাদেশে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে একটি ছাত্রের জীবন কত অভাব-অনটনের ভিতর দিয়ে গড়ে ওঠে—এটা আশুতোষ যতখানি অনুভব করতেন, এমন আর কেউ নয়। সেইজন্য দৃঢ়মুষ্টি পরীক্ষকদের হস্তে দুই

বা দশ নম্বরের জন্য যদি কোনো ছাত্রের জীবন ব্যর্থ হওয়ার উপক্রম হোত, আশুতোষের করুণা ও বিবেচনা সেইক্ষেত্রে প্রসারিত হোত। এই ছাত্র-বাৎসল্যের তুলনা নেই। বাংলাদেশে শিক্ষার আলোক বিকীর্ণ হোক—এই ছিল তাঁর প্রাণগত চেষ্টা। আশুতোষের ছাত্র-বাৎসল্যের রহস্য ইহাই।

আশুতোষের মণীষাই যে কেবল বড়ো তা নয়, তাঁর হৃদয়টাও খুব উদার ও স্নেহপ্রবণ ছিল। পরিবার-পরিজনের প্রতি তাঁর অত্যন্ত আসক্তি ছিল। এই আসক্তি এই স্থিরধীর কর্মীকেও অতি অল্পতেই চঞ্চল করে তুলতো। স্বীয় পুত্রকন্যাদের অতি সামান্য অসুখে আশুতোষ অস্থির হয়ে উঠতেন। তাঁর মতন কর্মীর পক্ষে এটা একটু আশ্চর্যের কথা ছিল। যাঁরা বাইরের কর্মে দিনরাত তন্ময় হয়ে থাকেন তাঁরা সচরাচর নিজের পরিবার-পরিজনের প্রতি তেমন অনুরক্ত হন না। তাঁরা বাইরের গৌরব অর্জন করতে গিয়ে প্রায়ই আসন্ন পারিবারিক কর্তব্যকে স্বল্পবিস্তর অগ্রাহ্য করে চলেন। আশুতোষেব জীবনে এ জিনিস কখনো দেখা যায় নি। যেমন পরিবার-পরিজনের প্রতি; সেইরূপ বন্ধু-বান্ধবদিগের প্রতিও তাঁর অকৃত্রিম আসক্তি ছিল। শুনেছি, তাঁর আযৌবনের বন্ধু জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুকে পরিণত বয়সেও আশুতোষ একদিন না দেখলে অস্থির হোয়ে উঠতেন। এই অনুরাগ তাঁর জীবনে এমন একটা মিষ্টতা এনে দিয়েছিল যে, তাঁর নিকট যে কেউ যেত, তাকেই স্বল্পবিস্তর আকর্ষণ করত। বিপিনচন্দ্র পালও এর সাক্ষ্য দিয়েছেন।

ছাত্রবৎসল যেমন আশুতোষ তেমনি স্বজনবৎসল ছিলেন,—কিন্তু তাই বলে স্বজনপোষণপ্রিয় ছিলেন, এমন কথা কিছুতেই বলা চলে না। তাঁর এই স্বজন-বাৎসল্যের সঙ্গে মিশেছিল বন্ধুবাৎসল্য। আশুতোষের সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু হেমেন্দ্রনাথ সেন (ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ ব্যবহার-জীবি ছিলেন; স্বনামধন্য বৈকুণ্ঠনাথ সেন এঁরই অগ্রজ ছিলেন) লিখেছেন: "এমন অসাধারণ কর্মবীর এক মুহূর্ত তিনি কাজ না করে থাকতে পারতেন না, যাঁকে দেখলে প্রকৃতই 'বেঙ্গল টাইগার' মনে হোত, অন্তরে তাঁর এত কোমলতা এত বালকের ন্যায় সরলতা! এত স্নেহভরা ভালবাসা ছিল যে তাঁর সঙ্গে যারা বেশি না মিশেছে তারা ভিন্ন কেউ সে কথা জানে না।...দিবারাত্রি একত্রে বাস করে দেখেছি এত সাদাসিদে চালচলন, এত আড়ম্বরশূন্য মেজাজ; ব্যবহারে,

এমন সহৃদয়তা, এমন সরলতা, রাগ-বিরক্তিশূন্য এমন খোস মেজাজ, এতবড় অসাধারণ দিগ্‌গজ পণ্ডিতের পক্ষেই শোভা পায়। প্রতিদিন রাত্র চারটার সময়ে শয্যাত্যাগ করে উঠে বেড়ান তাঁর চিরকালের অভ্যাস। তারপর থেকেই কাজ, কেবল কাজ—কাজ ভিন্ন বাজে গল্প করে সময় কাটান আদৌ পছন্দ করতেন না। আমাকে একবার বলেছিলেন—দেখ তুমি ত কাশীতে বাড়ি করেছ, আমার জন্য জায়গা ঠিক করো; সেখানে একখানা বাড়ি করে শেষবাস কাশীতেই করতে হবে। এমন সহৃদয়তা ও এমন আন্তরিকতা বোধ হয় এক আশুতোষের পক্ষেই সম্ভবপর ছিল। এমন সিংহের ন্যায় তেজস্বী মহাপুরুষের এমন কোমল হৃদয়, এমন পারিবারিক কোমলতা ও অভিন্নহৃদয়তা কমই দেখতে পাওয়া যায়। সকল বিষয়ে কর্তব্যজ্ঞানটা অতি প্রবল ছিল; যার জন্যেই আশুতোষ এমন অসাধারণ কর্মবীর হয়েছিলেন। আমার অগ্রজের পঞ্চাশ বছর ওকালতি শেষ হওয়ার জন্য বহরমপুরের বার এসোসিয়েসন ও অধিবাসিগণ কাশিমবাজারের মহারাজার নেতৃত্বে তাঁর জুবিলী উৎসব করেন। কর্তব্যবোধে আশুতোষ সেখানে গিয়েছিলেন।”

তাঁর স্বাধীনচিত্ততার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন শিশিরকুমার মৈত্র। তিনি লিখেছেন: “আর একদিন বড় মজার ঘটনা ঘটিয়াছিল। আমরা স্যর আশুতোষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি। হঠাৎ একজন খবর দিল, ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইনসট্রাকশন্ মিঃ হর্নেল তাঁহার সহিত দেখা করবার জন্য আসিয়াছেন। স্যর আশুতোষ তখন খালি গায়ে ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সম্মুখে একটি গেঞ্জি ছিল। গেঞ্জিটা টানিয়া লইয়া একবার গায়ে দিবার চেষ্টা করিয়াই তিনি বলিলেন, ‘না, ইহা আর গায়ে দিব না। যেমন আছি, এমনিভাবেই দেখা করিব।’ এই বলিয়া তিনি একটু অগ্রসর হইয়া জোরে বলিলেন, ‘Come in, Hornell’. আর হর্নেল সাহেব সিঁড়ি দিয়ে উঠিয়া উঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন।”

রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখেছেন: “প্রথম সন্তান কমলাদেবীই আশুতোষের জীবনে বুঝি তড়িৎরূপিনী ছিলেন। এই কন্যার জন্মকাল হইতেই আশুতোষের আত্মজীবনের সর্ববিধ শ্রীবৃদ্ধির সূত্রপাত এবং ইঁহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আশুতোষের সর্ববিধ অভ্যুদয়।” আশুতোষের সমগ্র জীবনের

অস্তিত্ব যেন তাঁর পুত্রকন্যাদের ঘিরে আবর্তিত হোত। আশুতোষের তিনকন্যা ও চারিপুত্র। অত্যন্ত স্নেহশীল পিতা ছিলেন তিনি। তাঁর নিতান্ত আত্মীয়দের কাছে শুনেছি তিনি পুত্র-কন্যা অন্ত প্রাণ ছিলেন। পারিবারিক স্নেহে তাঁর সমস্ত হৃদয়খানি পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর পিতৃস্নেহের ষোল আনার মধ্যে দশ আনা পেয়েছিলেন প্রিয়তমা কন্যা কমলা। দীনেশচন্দ্র লিখেছেন: "তাঁহার কন্যা কমলা দেবী বিধবা হইলে আশুতোষ তাঁহাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ দিয়াছিলেন। তিনি সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না, তিনি বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে বিধবা-বিবাহ চালাইতে চেষ্টা করেন নাই, বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে কোন দিন কোন বক্তৃতা করেন নাই, কোন কিছু লেখেন নাই—সামাজিক কোন সমস্যা লইয়া কখনো ব্যস্ত হন নাই। স্বীয় গৃহে বিধবা-বিবাহ উপলক্ষে তিনি গোঁড়া ব্রাহ্মণদের সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। যিনি আদৌ সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না, তিনি কন্যার দ্বিতীয়বার বিবাহ দিলেন কেন? তিনি লক্ষ্মী-স্বরূপিনী কমলা দেবীকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন, এই লক্ষ্মীর বৈধব্য-বেশ তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। সেই অনুপমা, কোমলহৃদয়া বালিকা পার্থিব সমস্ত সুখে বঞ্চিতা হইয়া নির্জলা একাদশী ও ব্রহ্মচর্য পালন করিবেন, এই অবিচারের আঘাত আশুবাবু সহ্য করিতে পারিলেন না। জননী জগত্তারিণী দেবীর সম্মতি লইয়া তিনি কন্যার পুনরায় বিবাহ দিয়াছিলেন। এই বিবাহ উপলক্ষে তিনি গোঁড়া হিন্দু-সমাজের অতিশয় প্রতিকূলতা সহ্য করিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় গোঁড়া হিন্দু নেতা, বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই বিবাহে সম্মতি ছিল।"

ইহা ১৯০৮ সালের কথা। দুর্ভাগ্যবশত বছর না ঘুরতেই কমলা আবার বিধবা হোলেন। সমস্ত মুখোপাধ্যায় পরিবারে এই ঘটনায় গভীর দুঃখের ছায়াপাত হয়। তাঁর হৃদয় ভেঙে পড়লেও আত্মসংযমী পুরুষ আশুতোষ, সেই সময়ে বাইরে কোনো চিত্তক্ষোভের পরিচয় দেন নি। কন্যার দুর্ভাগ্যকে তিনি এইবার মেনে নিলেন। ১৯২৩ সালের জানুয়ারি মাসে কমলার মৃত্যু হয়—সঙ্গে সঙ্গে আশুতোষেরও জীবনের গৌরব-সূর্য যেন অস্তমিত হোল। এই ঘটনার পর তিনি আর অতি অল্পদিন ইহলোকে ছিলেন। স্বীয় মৃত্যুর কিছু পূর্বে আশুতোষ তাঁর প্রিয়তমা কন্যাষ স্মৃতি তাঁর প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে

গেঁথে রেখে গিয়েছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে চল্লিশ হাজার টাকা প্রদান করে 'কমলা লেকচার্স'-এর ব্যবস্থা করেন। ১৯২৫ সালে য়্যানি বেশান্ত প্রথম 'কমলা-লেকচারার' স্বরূপ বক্তৃতা প্রদান করেন। রবীন্দ্রনাথ এই বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হন ১৯৩৩ সালে। কবির বক্তৃতার বিষয় ছিল 'মানুষের ধর্ম'।

আশুতোষ বড়লোক ছিলেন। তাঁর এই বড়ত্বের প্রকৃতিটা অনেকেই ঠিক মত উপলব্ধি করতে পারতেন না। এই প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ একটি সুন্দর বিশ্লেষণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "লোকে একদিন তাঁকে অপব্যয়ের অপরাধ এবং অপবাদ দিয়েছে। কিন্তু এক গোছা ধানের শীষ গজাতে আকাশ কতখানি জলের এবং আলোর অপব্যয় করে; গোটা কতক বনের গাছ, মুষ্টিমেয় মানুষ আর জীবজন্তু—এরি জন্যে এত বড় পৃথিবী এই আকাশ এই সমুদ্র এই নদী পর্বত উপত্যকা বাতাস আলো গ্রহ চন্দ্র তারা একি দেখেও দেখি না কেউ। সৃষ্টির গোড়ার কথাই হোল সর্জন। যেমন বর্ষার মেঘ অপব্যয়ী, আকাশের তারা অপব্যয়ী. তেমনি এতটুকু জ্ঞান ফোটাতে বিরাট ভাবে অপব্যয়ী ছিলেন এই মহাপুরুষ বলতে পারি, ছোটর জন্যে তিনি নিজেকে ঢেলে দিতে কৃপণতা করেননি, কার্পণ্য কোনদিন আসেনি তাঁর মনের ত্রিসীমানাতে। সব দিকে কৃপণ ও সংকীর্ণ, কিন্তু বড়লোক, ছোটদের তুলনায় অনেক বড় এমন বড়লোক বডলোকের ছায়া ধরে আছে এবং যথেষ্ট থাকবেও। কিন্তু ছোটদের সঙ্গে পার্থক্য নিয়ে বড় হয়ে ওঠাতেই তো যথার্থ বড়লোকের পরিচয় নয়—আগাছা মাটিকে তুচ্ছ করছে বলেই বনস্পতি হতে পারে না যদিও অনেক উপরে সে বাতাসে শিকড় মেলিয়ে বড় হতে চাচ্ছে। আপনার চেয়ে যারা অনেক ছোট তাদের সবার কতখানি নিকট হয়ে উঠল মানুষটি এতেই বড়লোকের পরিচয় পাই।'*

ইংরেজিতে যাকে বলে 'Towering personality'—আশুতোষ ছিলেন তাই। চারদিকের পরিবেশের মধ্য থেকে বনস্পতির মতনই মাথা তুলে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন সত্য, কিন্তু বনস্পতির সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে না। আশেপাশের

---

* কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে আশুতোষের প্রথম বার্ষিকী স্মৃতি সভায় পঠিত।

দিকে কোনো লক্ষ্য থাকে না, তলদেশের সম্পর্কে কোনো চিন্তা নেই—ইহাই বনস্পতির স্বভাব এবং এই ধরণের সংকীর্ণ-চেতা আকাশ-প্রমাণ বড়লোক এদেশে অনেক এসেছেন ও গিয়েছেন। আশুতোষ ঠিক সেই শ্রেণীর বড়লোক ছিলেন না। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, কোনো কাজের মধ্যে তিনি ছোট-বড়োর পার্থক্য করতেন না।

কি গুণে আশুতোষ ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে বাঙালীর হৃদয়ে এমন একাধিপত্য লাভ করতে পেরেছিলেন ? আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে যখন তাঁর মৃত্যু হয়, তখনকার কথা যাঁদের স্মরণ আছে, তাঁরাই বলবেন যে সেদিন তাঁর মৃত্যুতে সমগ্র বাঙালী তথা ভারতবাসী যেন পরমাত্মীয় বিয়োগের অসহ্য বেদনা বোধ করেছিল। আশুতোষের মৃত্যুতে দেশের ক্ষতিটা কি রকম হয়েছিল সেদিন সেই কথা বলতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন: "মাথার উপর থেকে ছাত বা ছাতা যাই সরে যাক্ দুটোকেই আবার যোগাড় করে নেওয়া চলে, কিন্তু আকাশ সরে গেলে মাথার উপরে সাত থাক্ চাঁদোয়া খাটিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। আকাশের মত বৃহৎ এবং উদার সেই মহাপুরুষের অভাবে আমাদের শিক্ষার রাজত্বে কতখানি অন্ধকারের সৃষ্টি হল, কত ভয়ের লক্ষণ সমস্ত দেখা গেল, তা এই শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যারা আজ নাড়া-চাড়া করছেন তাঁরাই জানেন।"

অনেকের মনে (এঁদের অধিকাংশই আশুতোষের বিরোধী দলভুক্ত ছিলেন) এই রকম একটা ধারণা ছিল যে, আশুতোষ তোষামদপ্রিয় মানুষ ছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমরা দীনেশচন্দ্র সেনের অভিমতটা এখানে তুলে দিলাম। তাঁর ন্যায় আশুতোষের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য খুব কম ব্যক্তিই লাভ করেছিলেন—তাঁর সঙ্গে আশুতোষের দীর্ঘকালের (চব্বিশ বছর) পরিচয় ছিল। সুতরাং তাঁর অভিমতের একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। তিনি লিখেছেন: "লোকে বলে আশুবাবু তোষামুদীতে বশীভূত হইতেন। আমার ধারণা কিন্তু অন্যরূপ। তাঁহার গুণরাশি এত বেশি ও অনন্যসাধারণ ছিল যে, তিনি পরের প্রশংসার কোন তোয়াক্কা রাখিতেন না। তিনি প্রশংসা বা

হাততালি পাইবার জন্য কোন চেষ্টাই করেন নাই। কেহ তাঁহার কাছে তাঁহার গুণ-গরিমা বর্ণনা করিবার সাহসই পাইত না। বহু লোকই তাঁহার অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়াছেন, ইঁহাদের মধ্যে কয়েকজন তাঁহার বিশ্বস্ত ও প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন, অন্য সকলের সে সৌভাগ্য হয় নাই। এই দুর্ভাগার দল তাঁহার তোষামোদপ্রিয়তার কুৎসা প্রচার করিয়াছেন। তোষামোদপ্রিয়তা দূরের কথা, আশুবাবুর দোষ ধরিয়া, গালাগালি করিয়া বহুলোককে তাঁহার নিকট হইতে কাজ আদায় করিতে আমি দেখিয়াছি।"

আসল কথা, তাঁর বিরুদ্ধ-পক্ষ আশুতোষকে অনেকভাবে নির্যাতিত করেছেন। সর্বদেশে সর্বকালে ইহাই নিয়ম যে, যিনি জনসাধারণের হিতের জন্য সমস্ত স্বার্থ বিসর্জন করে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, নিজকে ভুলে, দেশের জন্য, দশের জন্য প্রাণ আহুতি দিতে যিনি বদ্ধপরিকর হন—তাঁর পুরস্কার নিন্দা, ঈর্ষা, বিদ্রূপ আর কণ্টক-মুকুট। এদেশে এর বড়ো দৃষ্টান্ত রামমোহন ও বিদ্যাসাগর। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের জীবনেও আমরা এই জিনিস প্রত্যক্ষ করেছি। আর প্রত্যক্ষ করলাম আশুতোষের জীবনে। দীনেশচন্দ্র সত্যই লিখেছেন: "আশুবাবুর বিরুদ্ধে অতি তীব্র প্রতিকূলতা হয়েছিল এবং নীলকণ্ঠের ন্যায় বিষপান করিয়াও তিনি কর্তব্যক্ষেত্রে শিথিল-প্রযত্ন হন নাই।"

তাঁর নানা দুর্লভগুণরাজির মধ্যে আশুতোষের তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা সর্বজনবিদিত। বস্তুত এই মহাপুরুষের চরিত্র গভীরভাবে আলোচনা করে দেখেছি যে তাঁর মতন নির্ভীক পুরুষ বাংলাদেশে বড়ো একটা জন্মগ্রহণ করেননি। তেজে তিনি সত্যই আদিত্যপ্রভ ছিলেন। তিনি কাউকে ভয় করতেন না, কিন্তু তাঁকে অনেকে ভয় করত। নির্ভীক কে হতে পারে? যে আপনার কাছে আপনি খাঁটি সেইতো নির্ভীক—আশুতোষ ছিলেন অকুতোভয় নির্ভীক। তাঁর নির্ভীকতার বহু দৃষ্টান্ত আছে তাঁর জীবনের নানা অধ্যায়ে। তিনি যা ভাবতেন তাই-ই করতেন—করতে তিনি পারতেন।

শিবনাথ শাস্ত্রীও অনুরূপ সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন: "মৃত্যুর পর আমাদিগকে চিত্রগুপ্ত যদি জিজ্ঞাসা করে কে কি দেখিয়া আসিলে?—আমি বলিব—একজন কর্মবীর দেখিয়া আসিয়াছি; অধীন জাতিতেও একজন স্বাধীন মানুষ দেখিয়া আসিয়াছি।" এই উক্তি তিনি আশুতোষ সম্পর্কেই করেছিলেন।

বস্তুত স্বাধীনতা ভাবটা তাঁর যেন মজ্জাগত ছিল। এমন স্বাধীন প্রকৃতির মানুষ রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরের পর বাংলায় আর খুব বেশি জন্মগ্রহণ করেন নি।

অনেকে বলে থাকেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে আশুতোষ একজন autocrat বা স্বেচ্ছাতন্ত্রী ছিলেন—তাঁর প্রভুত্বের উপর কারো নাকি কথা বলবার উপায় ছিল না, কিম্বা তাঁর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না—সকলকেই নির্বিকারে তাঁর কথা মেনে নিতে হোত। স্বাধীন মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তিরা সাধারণত একটু প্রভুত্বপ্রিয় হোয়ে থাকেন। আশুতোষ যে এর ব্যতিক্রম ছিলেন তা নয়। ইহা স্বাভাবিক। তবে antocrat তাঁকে বলা চলে না। এ বিষয়ে শ্যামাপ্রাসাদের অভিমত উদ্ধৃত করে দিলাম। তিনি লিখেছেন: "কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, আশুতোষ স্বেচ্ছাতন্ত্রী ছিলেন। তিনি যেরূপ অবস্থায় ছিলেন, তাঁহাকে অনেক সময় এমনভাবে কাজ করিতে হইত, যাহাতে লোকে বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে পারিতেন। কিন্তু যদি এ কথা কেহ বলেন যে, তিনি লোকের স্বাধীনতা পছন্দ করিতেন না, এবং আলোচনাকালে স্বাধীন মত ব্যক্ত করার পক্ষে বিরোধী হইতেন, তবে তাহা ঘোরতর অন্যায় হইবে। সমস্ত গুরুতর বিষয়ই খুব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইবার পর তাহা সভায় উপস্থিত করা হইত এবং সভার পূর্বে এই যে আলোচনা হইত, তাহাতে সকলেই যা'র যা'র মত কোন কুণ্ঠা না রাখিয়া, সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতেন। এই আলোচনাকালে আশুতোষ নিরপেক্ষভাবে, ধীরতার সহিত সকলের কথা শুনিতেন। কিন্তু এইভাবে একটা বিষয় সম্যক্‌রূপে অলোচিত ও সুচিন্তিত হইবার পর তাঁহার যে মত হইত, তাহা সুদৃঢ় হইত এবং তিনি তাহা সহজে নড়চড় করিতে চাহিতেন না।" প্রকৃত কথা এই যে, আশুতোষের মতের দৃঢ়তাকে অনেকে অনেক সময় অটোক্রেসী বলে ভুল করেছেন। সিনেট-সিণ্ডকেটের সভায় যাঁরা তাঁকে দেখেছেন অথবা তাঁর সঙ্গে একত্রে কাজ করছেন তাঁরাই এই সাক্ষ্য দেবেন। বাদ-প্রতিবাদ মুখর সভায় প্রচণ্ড বিরোধিতার মুখে একটি প্রস্তাবকে সফল করবার জন্য যে বিচার-বুদ্ধি, যে দৃঢ়তার প্রয়োজন তা আশুতোষের ষোল আনার উপরে আঠার আনা ছিল। তাঁর সুদীর্ঘ ভাইস-চ্যান্সেলারী

জীবনে এর অজস্র দৃষ্টান্ত আছে। আশুতোষের সমালোচকগণ যদি এই কথাটা বুঝতেন, তাহোলে তাঁরা কখনই তাঁকে স্বেচ্ছাতন্ত্রী আখ্যা দিতে পারতেন না। যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলেন তাঁরা জানেন আশুতোষ যা ভাবতেন বা যা করতেন তা ছিল তাঁর অভিজ্ঞতা-প্রসূত এবং বিচার-বুদ্ধি নির্ভর জিনিস—সেখানে প্রাধান্য আরোপের কোনো প্রশ্নই উঠে না।

আশুতোষের রাজনৈতিক কর্ম বা চিন্তা সম্পর্কে এ পর্যন্ত বিশেষ কিছু উল্লেখ করা হয়নি। সত্য বটে তাঁর কর্মের ক্ষেত্র ছিল স্বতন্ত্র, তথাপি তাঁর স্বল্পকাল স্থায়ী রাজনৈতিক জীবনে তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যেতে পেরেছেন। ১৮৯৯ সালে তখনকার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সদস্যরূপে তিনি নির্বাচিত হন এবং সেইসময়ে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে কুখ্যাত ম্যাকেঞ্জি বিলের বিরোধিতা করে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা মনে রাখবার মতো। এইসময়ে তিনি কিছুকালের জন্য কলিকাতা পৌরসভার অন্যতম কাউন্সিলর হিসাবেও মনোনীত হয়েছিলেন। ১৯০১ সালে তিনি আবার বেঙ্গল কাউন্সিলে নির্বাচিত হন এবং সেই সময়ে কাউন্সিলের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য তিনি দিল্লীর ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে অন্যতম সদস্যরূপে নির্বাচিত হন। এখানে ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ, গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রভৃতি খ্যাতিমান জননায়কদের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে যুবক আশুতোষ তাঁর পার্লামেণ্টারী রাজনৈতিক প্রতিভার পরিচয় দিয়ে সকলকে বিস্মিত করেছিলেন। লর্ড কার্জনের ইউনিভার্সিটিজ বিলের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে তিনি যে কয়টি বক্তৃতা করেছিলেন তা বোধ হয় অনেকেরই মনে আছে। তাঁরই আলোচনার ফলে এই বিলের কয়েকটি ধারা পরিবর্তিত হয়।

আশুতোষ গণতন্ত্রে কতদূর বিশ্বাসী ছিলেন তা অনুমান করা শক্ত। তাঁর অন্তরঙ্গস্থানীয় অনেকের মুখে শুনেছি যে, তিনি তথাকথিত গণতন্ত্রে গভীর আস্থাবান ছিলেন না। বলতেন: "প্রকৃত শিক্ষা ও সংস্কৃতি ব্যতিরেকে যে গণতন্ত্র অথবা দায়িত্ববোধ বিহীন যে গণতন্ত্র, তা আদৌ গণতন্ত্র নয়। এই যে

আমাদের দেশে unenlightened ও uninformed ডেমোক্রেসি, এটা কি ব্যুরোক্রেসির চেয়ে কম ক্ষতিকারক ?" এই প্রসঙ্গে ১৯২৪ সালের জানুয়ারি মাসে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিয়নে প্রদত্ত "বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ" শীর্ষক বক্তৃতাটি স্মর্তব্য। তাঁর বিখ্যাত বহু বক্তৃতার মধ্যে এটি একটি। সেদিন তিনি বলেছিলেন: "I yield to none in my fervent admiration of democracy and democratic institutions; at the same time I realise the weakness and dangers of democracy...Democracy must be transformed into an intellectual aristocracy." গণতন্ত্র সম্বন্ধে আশুতোষের এই সুচিন্তিত অভিমত আজো তার মূল্য হারায়নি। এইজন্যই তিনি শিক্ষাব্যবস্থাকে রাজনৈতিক কলুষতা থেকে মুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন। স্বাধীন ভারতবর্ষে শিক্ষা-সংস্কারের কথা যাঁরা আজ চিন্তা করছেন, তাঁরা যেন ইহা বিশেষভাবে মনে রাখেন।

যেদিক থেকেই আলোচনা করি না কেন আমাদের কল্পনা-দৃষ্টিতে আশুতোষ-চরিত্র একটি সজীব মনুষ্যত্বের বিগ্রহ হিসাবেই প্রতিভাত হয়। আশুতোষ সেই শ্রেণীর মানুষ যাঁর সম্পর্কে আমরা নিঃসংকোচে বলতে পারি "স জীবতি মনোযস্য মননেন হি জীবতি"। বাঙালীর সমাজজীবনমন্থনেই এমন একটি বিচিত্র শৌর্য-বীর্য-মহত্ত্ব বিভূষিত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছিল আমাদের কালে। নিঃসন্দেহে বাঙালীর এ জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্যের ফল। আমরা দেখলাম বিদ্যাসাগরের মতোই সেই অজেয় পুরুষ আর অক্ষয় মনুষ্যত্ব আশুতোষ-চরিত্রের প্রধান গৌরব। আমরা এও দেখলাম তিনি নিজের মধ্যে যেভাবে সত্যের তেজ, কর্তব্যের সাহস এবং স্বাধীনতা অনুভব করে কঠিন সংগ্রামে জয়ী হয়েছিলেন, সেই জয়ের উত্তরাধিকার তিনি রেখে গিয়েছেন তাঁর স্বজাতির জন্য। তিনি মানুষের সঙ্গে মানুষের, অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের সত্য সম্বন্ধের বাধা মোচন করে বাঙালীজীবনকে চিরকালের মতো ভাস্বর ও কর্মোদ্দীপ্ত করে গিয়েছেন। "I have lived, and have not lived in vain." এ কথা তিনিই বলতে পারতেন।

আশুতোষের প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রের প্রতি একবার সশ্রদ্ধ দৃষ্টিপাত করলেই মন আপনিই বলে ওঠে—"This was a man."—সত্যই এই একটি মানুষের মতো মানুষ। বাংলার উনিশ শতকের ইতিহাসের রাজপথে মহৎ-চরিত্রের কি বিরাট মিছিল। আশুতোষ সেই মিছিলেরই একজন। তাঁর জীবন ছিল একটি মহাযজ্ঞ—সে যজ্ঞশালায় তিনি প্রাচীর প্রাচীন ভাবের সঙ্গে প্রতীচির জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করেছিলেন। তাঁর সমকালবর্তী মনীষী বাঙালীর মণ্ডলে এই বিশেষত্বে তিনি একমাত্র স্যর গুরুদাসের সঙ্গে তুলনীয়। সংসারে মহৎ-চরিত্রের আবির্ভাব হয় কেন? এ অভ্যুদয় জাতীয় জীবনের প্রবল প্রকাশ—প্রবল উচ্ছ্বাস। বাঙালীজাতিকে আশুতোষ কতখানি উন্নত করে গিয়েছেন তা বুঝবার সময় বোধ হয় আজ এসেছে। রামমোহন বাংলা দেশকে জাগিয়ে দিয়ে গেছেন, তাই বাঙালী ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ববিষয়ে অগ্রণী হোতে পেরেছিল (দুঃখের বিষয়, বর্তমানে বাঙালী অনেক পরিমাণেই তার পূর্ব গৌরবভ্রষ্ট হয়েছে)। আশুতোষ বাংলা দেশকে আরো কিছু উন্নত করে গিয়েছেন। তিনি একাগ্রচিত্তে শুধু একটি বিষয়ই চিন্তা করে গিয়েছেন—ভারতের জ্ঞানোন্নতি। শুধু চিন্তা করা নয়। নিজ প্রতিভাবলে ও মনীষা প্রভাবে ভারতে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এক নূতন প্রাণশক্তির উদ্বোধন তিনি করেছিলেন।

সেই তাঁর সুমহতী কীর্তির মধ্যেই দুর্লভ অমরত্ব লাভ করেছেন বাংলা তথা ভারতের শিক্ষাগুরু আশুতোষ।

॥ পরিশিষ্ট ॥

লর্ড লিটনকে লেখা আশুতোষের পত্র

Senate House
Calcutta, 26th March 1924.

Dear Lord Lytton,

I am in receipt of your letter dated the 24th March, which reached me on Saturday evening after I had returned home from the Convocation. I shall in my reply speak without reserve and hesitation as you have made most unjust and unmerited imputations on my conduct.

Before I record my views on your offer to re-appoint me as Vice-Chancellor and the conditions that accompany it, I shall deal with your remarks on my attitude towards the proposed scheme of legislation. I cannot reproduce here the contents of the correspondence which has passed between you and me on this subject, but it seems clear that you could not have refreshed your memory by its perusal before you criticised my conduct. You could not possibly have forgotten that in the letter which I wrote to you on the 4th November, 1922, after I had received a copy of the University Bill from Mr. Mitter,* I expressed in unmistakable terms my disapproval of its contents and the principles underlying it. That Bill came upon me as an absolute surprise. Mr. Mitter, you might remember, asked for my personal opinion. In your letter dated the 8th November, 1922, you distinctly wrote to me that Mr. Mitter had told you that the Senate of the University had been consulted officially but that my personal opinion had not been invited. This, as I intimated to you later, was the exact opposite of truth. This was followed by protracted

---

* স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র ; ইনি তখন শিক্ষামন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ।

correspondence and interviews with you in the course of which I explained to you my views upon the draft Bill. At length on the 11th January, 1923, you gave me permission to consult the members of the Senate on the provisions of the Bill. At about the same time I received from you a copy of the Secondary Education Bill ; all information regarding its contents, though repeatedly asked for, had been kept back by the Government from the University. The Senate thus placed in possession of the two Bills, appointed a Committee to report on their provisions. Before the views of the University could be formulated and communicated to you, you adopted, in spite of my earnest protests and the remonstrance of the Senate, an absolutely indefensible course You forwarded the Bill or Bills to the Government of India with a view to obtain its sanction to introduce them into the Legislative Council. If you refer to the correspondence, you will find that I and my colleagues on the Senate made a desperate effort to convince you that as the Bills were open to grave objections, they should not be adopted as Government measures before full and searching enquiry. Our appeals and protests were totally disregarded. You now make a grievance that I have used every expedient to oppose your Government to arrest the progress of the measures. You complain that I have appealed to the Government of India and the Government of Assam. You will be surprised to hear that what I have done has been perfectly constitutional. In your letter dated the 11th January, 1923, you stated explicitly that I would be free to take what steps I please to discuss the Bill with the members of the Senate. In my reply dated the 14th January, 1923, I stated that in view of the importance of the questions raised, I had decided to give an opportunity to every member of the Senate to discuss the provisions of the Bills. The Senate, it may not be known to you,

includes His Excellency the Governor of Assam, the Member of the Council of the Governor-General in charge of the Department of Education, the Minister for Education in Assam and the Director of Public Instruction in Assam. The papers were forwarded as confidential documents to each of these gentlemen. If I had withheld the papers from them, they would have been entitled to make legitimate grievance against me. If the result has been that they have formed an unfavourable opinion of the measures devised by your Government, and have taken such steps as they consider necessary and proper, you may regret it, but surely that is not a ground for complaint against me. You also make a grievance that I have appealed to Sir Michael Sadler. Your Government, notwithstanding my advice and the advice of the Senate, has unceremoniously rejected the recommendations made by the Commission over whose deliberations Sir Michael Sadler presided. If I have intimated this fact to Sir Michael Sadler, a fact which has been a matter of public knowledge for many weeks past, I did it in the best interests of the University and of the country. Again, you do not hesitate to assert that I have inspired articles in the Press to discredit your Government. This is a libel and I challenge you to produce evidence in support of this unfounded allegation.

You complain that my criticisms have been destructive rather than constructive. Yes, the criticisms have been destructive of the provisions of the Bills which appeared to me and to my colleagues on the Senate to be most objectionable, framed, as we did not hesitate to record, from a political and not an educational standpoint. You seem to regret that our criticisms have not been constructive, but you have never cared to invite the University to frame a constructive scheme for the benefit of your Government. I have on more than one occasion, as you will no doubt

recollect, offered to draw up a Bill with the assistance of my colleague on the Senate and representatives of your Government, but I have received no response. You complain that I have hitherto given you no help. I maintain that I have constantly offered you my help and advice which, for reasons best known to you alone, you have not accepted. I have written to you letter after letter, even in the midst of terrible sorrows, commenting in detail on the provisions of the the Bills. You have never cared to reply to the criticisms thus expressed. On the other hand, although I found from your letter dated 11th January, 1923, that you were convinced that the proposed amendments were, as predicted by me, impossible of accomplishment in an amending Bill, I discovered much to my surprise a few days later that you were determined to push on the amending Bill and send it up to the Government of India for sanction. Again, the Report of the Committee on the two Bills (which we took great pains to prepare) minutely criticised their clauses and challenged the ideal that lay beneath them. You have never recorded your opinion on our views. You have not even given me the opportunity to discuss the report with you. On the other hand, I cannot overlook that your letter to me dated 15th February, 1923, made it quite clear that you did not realise the gravity of the issue and you did not hesitate to express your impatience at the space that our criticisms occupied. I notice that you charge me with having misrepresented your objects and motives. I most emphatically repudiate this unfounded charge. On the other hand, it would be interesting to know whether, when you stated to the Legislative Council that your 'anxiety to consult the authorities of the University and to obtain their support as far as possible, was responsible for the delay', you were already aware of the attitude taken up by the Government of India.

If you have the courage to publish to the world all the documents on the subject and the entire correspondence which has passed between us, I shall cheerfully accept the judgment of an impartial public.

I shall finally consider your offer to re-appoint me as Vice-Chancellor subject to a variety of conditions. There are expressions in your letter which imply that I am an applicant for the post and I am in expectation of re-appointment. Let me assure you that if you and your Minister are under such an impression, you are entirely mistaken. You ask me to give you a pledge that I shall exchange an attitude of opposition for one of whole-hearted assistance. You are apparently not acquainted with the traditions of the high office which I have held for ten years. I was first called upon to accept the office of Vice-Chancellor by that God-fearing soldier, the late Earl of Minto. He did not bind me with chains but on the other hand expressly enjoined me to work in concurrence with the Senate in such manner as might appear to my judgment to be in the truest interests of the University. We had in fact many open conflicts with the views of the Government in those days; you will however be interested to know that at the Convocation on the 12th March, 1910, Lord Minto referred to me in the following words: 'Now that my high office is drawing to a close I rejoice to feel that the administration of this great University will continue to benefit from your distinguished ability and your fearless courage.' During the time that Lord Hardinge was Chancellor of the University, we had many an acute difference with the Government, and as Vice-Chancellor I never hesitated to express my disapproval of Government measures when they appeared to me to be injurious to the interests of the University. Lord Hardinge had the generosity repeatedly to congratulate me on the bold stand we had from time to time made against the views

maintained by his Government. When two years ago, at the insistent request of Lord Chelmsford and Lord Ronaldshay, I accepted their invitation to hold the post of Vice-Chancellor, I stated distinctly that I would spare no efforts to devote myself to the service of the University and to promote to the best of my judgment and ability the truest interests of my *Alma Mater* which have been always dearest to me. From the conversation that I had with Lord Ronaldshay at that time, I discovered that no one apprecia-ted more keenly than he the need and value of a thoroughly independent Vice-Chancellor.

Let me assure you that this high tradition was not created by me. It was my privilege to work as a Member of the Syndicate with eight successsive Vice-Chancellors during a period of seventeen years, before I was called upon to accept that post, and most, if not all of them, were eminent men imbued with the traditions of the office from the time of their predecessors Many of the occupants, ever since the days of our first Vice-Chancellor, Sir James Colvile, Chief Justice of the Supreme Court, have been men who had taken oath to administer justice in the name of their Sovereign. To them it would have been a matter of astonishment to be told that as Vice-Chancellors, they were expected to adapt themselves to the views of the Government simply because it was the Government which had the appoinment in its gift. I have, I maintain, scrupulously adhered to the cherished traditions of my office and it has never entered into my mind during the last two years, that I was seriously expected to adapt my-self to the wishes of your Government. Surely, my attitude towards the policy adopted by your Government in the matter of University legislation has been quite familiar to you for some months past, and you have never before this ventured to convey a suggestion to me that my action as

Vice-Chancellor has been unworthy of my office. I quite realise that I have not in the remotest degree tried to please you or your Minister. But I claim that I have acted throughout in the best interests of the University, notwithstanding formidable difficulties and obstacles, and that I have uniformly tried to save your Government from the pursuit of a radically wrong course, though my advice had not been heeded I am not surprised that neither you nor your Minister can tolerate me. You assert that you want us to be men. You have one before you, who can speak and act fearlessly according to his convictions, and you are not able to stand the sight of him It may not be impossible for you to secure the services of a subservient Vice-Chancellor, prepared always to carry out the mandates of your Government, and to act as a spy on the Senate. He may enjoy the confidence of your Government but he will not certainly enjoy the confidence of the Senate and the public of Bengal. We shall watch with interest the performances of a Vice-Chancellor of this type, creating a new tradition for the office.

I send you without hesitation the only answer which an honourable man can send, an answer which you and your advisers expect and desire : I decline the insulting offer you have made to me.

Yours sincerely,
Asutosh Mookerjee

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

1. *Addresses* — Sir Asutosh Mookerjee
2. *Representative Indians* — Shyama Prasad Mookerjee
3. *Hundred years of the University of Calcutta*
4. *Selections from Educational Records*
5. *Report of the Hunter Commission*
6. *Report of the Raleigh Commission (Indian Universities Commission 1902)*
7. *Report of the Sadler Commission*
8. *A Nation in Making* — S. N. Banerjea
9. *Calcutta Weekly Notes*
10. *Minutes of the Calcutta University*
11. *Journal of the Asiatic Society*
12. *Asutosh Mookerjee* — P. C. Sinha
13. জাতীয় সাহিত্য — আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
14. আশুতোষ স্মৃতিকথা — দীনেশচন্দ্র সেন
15. আশুতোষের ছাত্রজীবন — অতুলচন্দ্র ঘটক